# বিংশ শতাব্দীর ত্রিপুরা

## প্রথম খন্ড - রাজন্য যুগ



দীনেশ চন্দ্র সাহা



রাইটার্স পাবলিকেশন
প্যালেস কম্পাউন্ড ইস্ট
আগরতলা, ত্রিপুরা

# বিংশ শতাব্দীর ত্রিপুরা

**Bingsha Shatabdir Tripura**

*by Dinesh Chandra Saha*

Published by : Writers Publication
Palace Compound East.
Agartala, Tripura
Phone (0381) 222 8590
Price : Rs. 100/- Only.



প্রথম রাইটার্স সংস্করণ ঃ আগরতলা বইমেলা - ২০০৭

প্রকাশক ঃ দীনেশ চন্দ্র সাহা

অক্ষর বিন্যাস ঃ প্লাজা গ্রাফিক্স, ওরিয়েন্ট চৌমুহনী,
আগরতলা, ত্রিপুরা। ২২০-৫৬২৫

মুদ্রন ঃ অনিল লিথোগ্রাফিং কোং,
১৩, শশীভূষন দে স্ট্রীট,
কোলকাতা - ১২

মূল্য ঃ ১০০ টাকা মাত্র

ISBN-81-902476-9-7

প্রাপ্তিস্থান

রাইটার্স পাবলিকেশন,
প্যালেস কম্পাউন্ড ইস্ট,
আগরতলা, ত্রিপুরা।

কলকাতায় প্রাপ্তিস্থান

মণীষা গ্রন্থালয়
৪/৩ বি বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,
কলকাতা-৭৩

# উৎসর্গ

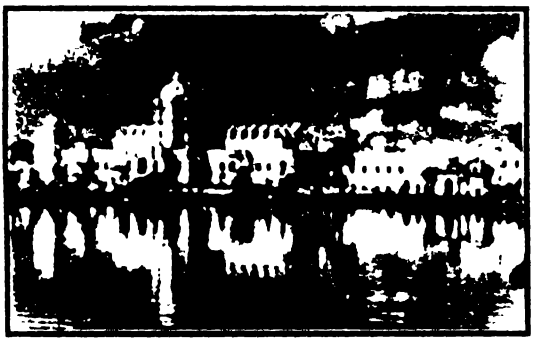
যে সব পাঠকেরা ত্রিপুরাকে
নানা দিক থেকে জানতে আগ্রহী
অথচ সময়ের অভাবে গভীর অধ্যয়নের
সুযোগ পান না - তাদের উদ্দেশ্যে শতাধিক
গবেষক-লেখক ও বিশেষজ্ঞের প্রকাশিত গ্রন্থের
সারকথা সংগ্রহ করে সহজ ভাষায়
একটি মাত্র গ্রন্থে সাজিয়ে
উৎসর্গ করলাম।

দীনেশ চন্দ্র সাহা
গ্রন্থকার









# বিংশ শতাব্দীর ত্রিপুরা

প্রথম খন্ড - রাজন্য যুগ





## এই লেখকের অন্যান্য বই

১. বিংশ শতাব্দীর ত্রিপুরা - ২য় খন্ড - প্রজাতান্ত্রিক যুগ।

২. ত্রিপুরায় গণ আন্দোলনের বিচিত্র ধারা।

৩. নবজাগরণের ছয় মহানায়ক ।

৪. নবজাগরণের অগ্রদূত রাজা রামমোহন রায় ।

৫. নবযুগের সমাজ বিপ্লবী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

৬. নবজাগরণের কবি ও কথা শিল্পী মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্র।

৭. নবজাগরণের দুই সাধক শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ।

৮. কিশোর গল্প গুচ্ছ ।

৯. পাঠকেব খোঁজে পঁচিশ বছর ।

১০. তিলোত্তমা আগরতলা ।

১১. ত্রিপুরায় নগরায়নের নবযুগ ।

১২. নতুন পথে টি টি এ এডিসি ।

১৩. ত্রিপুরায় জনমুখী প্রশাসন ও সামাজিক রূপান্তর ।

১৪. শরৎ সাহিত্যে নারীর মূল্য ।

১৫. ত্রিপুরায় পঞ্চায়েত রাজ ।

# ভূমিকা

বিংশ শতাব্দীর ত্রিপুরা নানা দিক থেকে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের নানা রকম ঢেউ প্রত্যক্ষ করেছে। রাজনৈতিক - অর্থনৈতিক-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে এসেছে অভূতপূর্ব পরিবর্তন। ক্ষয়িষ্ণু রাজন্যযুগের অবসানে এসেছে প্রজাতন্ত্রের যুগ। উপজাতি জীবনে এসেছে জাতীয়তাবোধ। ছিন্নমূল উদ্বাস্তুরা গড়ে তুলেছে আধুনিক সমাজের সুদৃঢ় ভিত্তি।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষপর্বে রুশ বিপ্লব এবং দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর জাতীয় মুক্তি বিপ্লব সারা বিশ্বের সমস্ত পরাধীন জাতিগুলোকে সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্ত করেছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিপ্লবের প্রভাবে শত শত বছর ধরে পিছিয়ে পড়া মানব গোষ্ঠীগুলো নতুন আলোর সন্ধান পেয়েছে।

নতুন প্রজন্মের যুবক যুবতীরা এই পরিবর্তনের ধারা বুঝতে চায়। বই মেলায় দেখেছি তারা দলে দলে খুঁজে বেড়ায় ত্রিপুরা ও আধুনিক বিশ্বকে নানা দিক থেকে বিচার বিশ্লেষণ করে দেখার মত বই।

কিন্তু অনেক প্রয়োজনীয় বই এখন দুস্প্রাপ্য। অধিকাংশ লেখকের বই প্রথম সংস্করণে অল্প সংখ্যক ছাপা হয়। অনেক গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের সুযোগ ঘটেনা। ফলে অনেক গ্রন্থ দুস্প্রাপ্য হয়ে যায়।

সাধারণ পাঠকদের এই অভাব দূর করার জন্যে শতাধিক গ্রন্থ নানাভাবে সংগ্রহ করে বিভিন্ন লেখক ও গবেষকের দৃষ্টিভঙ্গী ও সিদ্ধান্তের সার কথা একটি মাত্র গ্রন্থে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে বর্তমান গ্রন্থটি রচনা করতে উদ্যোগী হয়েছি।

প্রত্যেক লেখকেরই একটা নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী ও দার্শনিক বিশ্বাস থাকে। বিভিন্ন গ্রন্থ পাঠের পর লেখকের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী কোন কোন ক্ষেত্রে যুক্ত হয়েছে। তবে কোন তথ্যই ভিত্তিহীন নয়।

বিংশ শতাব্দীর ত্রিপুরাকে বুঝতে হলে পৃথিবী ও মানব সমাজের ক্রম বিকাশের ধারার সঙ্গে কিছু পরিচয় থাকা আবশ্যক। জাতি -উপজাতির সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্রম বিবর্তন ও সমন্বয় প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিংশ শতাব্দীর বহু বিজ্ঞানী, নৃতাত্ত্বিক, ভাষা তাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক গবেষকরা কঠোর পরিশ্রম করে, গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে আবিষ্কৃত তথ্যের বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। এসব বিষয়ে সাধারণ পাঠকদের অবহিত ও সচেতন করার উদ্দেশ্যে এ গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলোর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে ত্রিপুরার ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে যাতে, রাজন্য ইতিহাসের প্রাচীনত্ব সম্পর্কে সমালোচকদের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে পাঠকরা পরিচিত হতে

পারেন এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রাজন্য শাসনের মূল্যায়ন করতে পারেন ।

তৃতীয় অধ্যায়ে প্রাচীন রাজ্যটির প্রজাদের অবস্থা পর্যালোচনা করা হয়েছে ।

চতুর্থ অধ্যায়ে রাজন্য যুগে রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ও গণ আন্দেলনের বিভিন্ন ধারা সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে ।

পঞ্চম অধ্যায়ে দেশীয় রাজাদের সংগঠন, ভারতের ৬৮৪টি দেশীয় রাজ্যের সঙ্গে ত্রিপুরার ভারতভুক্তি ও দেশ বিভাগের পরিণতি সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে ।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে রাজ্যের প্রত্নতাত্ত্বিক ও ধর্মীয় ঐতিহ্য, রাজন্যযুগের প্রশাসনিক বিবর্তন ও সংস্কার, সাহিত্য ও নাট্য চর্চা, জনগণনা ও পুরসভা ইত্যাদি বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে ।

সপ্তম অধ্যায়ে প্রজাতান্ত্রিক ভারতের মূল স্রোতে ত্রিপুরার মিশে যাওয়ার তাৎপর্য আলোচিত হয়েছে ।

আশা করা যায় আমার এ গ্রন্থখানি সাধারণ পাঠকের সমাদর লাভ করবে । বিশেষতঃ অনুসন্ধিৎসু ছাত্র-ছাত্রীরা এ গ্রন্থ পাঠ করে উপকৃত হবে। প্রথম সংস্করণের ত্রুটি বিচ্যুতি সম্পর্কে মতামত জানা গেলে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে ।

আমার গ্রন্থ প্রকাশে যারা বিশেষ ভাবে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন তাদের মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্যরা হলেন বন্ধুবর গবেষক রমাপ্রসাদ দত্ত, কবি ও লেখক নিধু ভূষণ হাজরা, ভাষাবিদ্ কুমুদ কুন্ডু চৌধুরী, গবেষক কুমুদ রঞ্জন সাহা, প্রবন্ধকার নির্মল দাস, শ্যামল চৌধুরী, অমল দাসগুপ্ত, প্রণতি মোদক সাহা, শ্রীমতী শীলা সাহা এবং আরো অনেকে । তাদের সকলের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ।

সবশেষে গ্রন্থটির পূর্ণাঙ্গরূপ দেবার জন্য যারা নানা ভাবে সাহায্য করেছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যরা হলেন সর্বশ্রী রাখাল মজুমদার, অভিজিত সাহা, অর্জ্জুন দাশগুপ্ত এবং গৌতম মহলানবিশ তাদের প্রতিও রইল শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

ইতি<br>
দীনেশ চন্দ্র সাহা<br>
গ্রন্থকার

# সূচীপত্র

## প্রথম খন্ড রাজন্য যুগ

*প্রথম অধ্যায়*



*দ্বিতীয় অধ্যায়*



*তৃতীয় অধ্যায়*

*চতুর্থ অধ্যায়*



*পঞ্চম অধ্যায়*



*ষষ্ঠ অধ্যায়*



*সপ্তম অধ্যায়*

## প্রথম অধ্যায়

# প্রাসঙ্গিক কথা

মানব সভ্যতার ইতিহাসে বিংশ শতাব্দী অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি শতাব্দী হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। দুটি বিশ্বযুদ্ধ সভ্যতার ইতিহাসে এক অভূত পূর্ব ঘটনা। মানব সভ্যতার ইতিহাসে অজস্র যুদ্ধের কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়েছে। অজানা যুদ্ধের সংখ্যাও সীমাহীন। তবু ও কোন কালেই সারা বিশ্বজুড়ে সব মানুষকে জড়িয়ে ভয়াবহ যুদ্ধের ঘটনা এর আগে আর ঘটেনি। তাছাড়া মারণাস্ত্রের এমন বিচিত্র ভান্ডারের কথাও ইতিহাসে কেউ কখনো কল্পনা করতে পারেনি।

দুটি বিশ্বযুদ্ধ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জগতে এনেছে অভাবনীয় বিপ্লব। বিজ্ঞানের প্রতিটি আবিষ্কারের মধ্যেই ধ্বংসের ক্ষমতা যেমন আছে, তেমনি সৃষ্টির ক্ষমতা ও রয়েছে। মানুষ এখন অসীম ক্ষমতার অধিকারী হয়েছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষ ভাগে রুশ বিপ্লব গোটা পৃথিবীর মানব সমাজের মূল ভিতটাকেই কাঁপিয়ে দিয়েছে। মানুষের সমস্ত বিশ্বাস ও মূল্যবোধে সৃষ্টি করেছে অকল্পনীয় সমাজ বিবর্তনের এক নবীন ধারা, যা শোষিত পদানত ও নিপীড়িত মানবগোষ্ঠী গুলোর মধ্যে জাগিয়ে দিয়েছে গভীর আত্মবিশ্বাস - মানবিক অধিকার বোধ - অসীম সাহস এবং বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদী চিন্তাধারা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে এশিয়া ইউরোপ ও আমেরিকা এই তিনটি মহাদেশের ষোলটি দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটে গেছে। শতাধিক পরাধীন দেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে। পৃথিবীর সব মানুষ আজ মুক্ত জীবনের স্বাদ পেয়েছে। বিংশ শতাব্দী চিহ্নিত হয়েছে মানব সমাজের মুক্তির শতাব্দী রূপে।

পরাধীন জাতিগুলো সুদীর্ঘ কাল ধরে ঐতিহাসিক বিকাশের বিভিন্ন স্তরে আটকে আছে। অসম বিকাশ এবং সামাজিক ও অর্থ নৈতিক বঞ্চনার ফলে দুর্বল ,অসহায় ও জটিল পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছে সদ্য স্বাধীন দেশগুলো।

এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী দেশ গুলো নতুন উপনিবেশবাদী কৌশলে ঋণের জালে বন্দী করতে উদ্যত হয়েছে সদ্য স্বাধীন দেশগুলোকে। বাধা পেল সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া থেকে। শুরু হল ঠান্ডাযুদ্ধ ও নানা ষড়যন্ত্র। সৃষ্টি হল সামরিক জোট। মারণাস্ত্রের প্রতিযোগিতা।

দুনিয়ার সমস্ত জাতিগোষ্ঠীগুলোকে স্বাধীনতা রক্ষা ও স্বনির্ভর অর্থনীতি গড়ে

তোলার কাজে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া। তৈরী হলো জোট নিরপেক্ষ শক্তি। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীরা ডিভাইড এন্ড রুল নীতি প্রয়োগ করে সমাজতান্ত্রিক শিবিরে ফাটল সৃষ্টি করতে সফল হল। আভ্যন্তরীন এবং আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রে পতন ঘটল সোভিয়েত ইউনিয়নসহ পুর্ব-ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার। দুর্বল হলো জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন। বিপর্যস্ত হল প্রগতির পথ।

বিংশ শতাব্দী প্রত্যক্ষ করল মানব সভ্যতার এক বলিষ্ঠ নবীন ধারার উত্থান এবং বিপর্যয়। কিন্তু এক দশকের মধ্যেই নবীন প্রজন্মের মানুষেরা উপলব্ধি করছে , এই বিপর্যয় সামরিক পতন মাত্র। সারা বিশ্বের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নতুন এক বিপ্লবের বিশ্ব জোড়া ঝড়েব সংকেত বহন করে আনছে। শোষন ভিত্তিক সমাজব্যবস্থার ধ্বংসস্তুপের উপর বিশ্ববাসী গড়ে তুলবে এক নতুন সভ্যতা। বিংশ শতাব্দীর ইতিহাস সে বার্তাই ঘোষণা করছে।

বিংশ শতাব্দী পৃথিবীর রাজনৈতিক মানচিত্রটা একেবারে বদলে দিয়েছে। সব দেশেরই আকাশে উড়ছে স্বাধীন পতাকা। গণতন্ত্র ও মানবিক মূল্যবোধের চলছে পরীক্ষা নিরীক্ষা। শত শত বছরের বঞ্চিত মানুষেরা দলবদ্ধ হচ্ছে। জন্ম নিচ্ছে নতুন নতুন জাতি এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতির। ভাঙ্গাগড়ার ভেতর দিয়ে মানচিত্র হয়তো আরও পাল্টাবে। কিন্তু বিশ্বজোড়া শোষনের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার দিন আর ফিরে আসবেনা। এটাই হল ইতিহাসের মৌলিক শিক্ষা।

ভারত স্বাধীনতা অর্জন করেছে দেশ বিভাগের মধ্য দিয়ে। ধর্মীয় বিদ্বেষ থেকে পাকিস্তানের সৃষ্টি। আবার ভাষা ও সংস্কৃতির স্বাধীনতার দাবী থেকে পাকিস্তান ভেঙ্গে বাংলাদেশ সৃষ্টি হয়েছে। ধর্মান্ধতার স্থান নিচ্ছে মানবিকতা। এটাই মানব সভ্যতারও দাবী।

স্বাধীন অখন্ড ভারতবর্ষের দাবী যদি পূরণ করা হতো, তাহলে সারা বিশ্বে ভারতবর্ষ অন্যতম একটি শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভূত হতে পারতো এবং বহু জটিল সমস্যা এড়িয়ে উন্নয়নের এক বলিষ্ঠ ধারা সৃষ্টি করতে পারতো। আধুনিক শিক্ষার মাধ্যমে সাম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত বিদ্বেষ থেকে এই উপমাহাদেশ মুক্ত হতে পারতো। তাহলে মৌলবাদ ও বিচ্ছিন্নতাবাদ পরাস্ত হতো।

ভারত একটি প্রাচীন সভ্যতার দেশ। মানব সমাজে বহু সভ্যতার জন্ম হয়েছে আবার বহু সভ্যতা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু ভারতীয় সভ্যতা বার বার বিদেশী আক্রমণের ধ্বংসস্তুপ থেকে নতুন শক্তিতে জেগে উঠেছে। আক্রমণকারীকেও ভারত আত্মস্থ করে নিয়েছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন মানব গোষ্ঠী ভারতে স্থায়ী বসতি স্থাপন করে নানা সংঘাত ও

সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে জন্ম দিয়েছে ভারতীয় সংস্কৃতি, যার মূল কথা বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে। মানুষ অমৃতের সন্তান। সব মানুষই সমান।

কিন্তু প্রাচীন যুগের উদার আদর্শ স্থির থাকেনি। বিদেশী আক্রমণে বিধ্বস্ত ভারতীয় সংস্কৃতি বার বার রূপান্তরিত হয়েছে। তবুও মহাভারতের যুগ থেকে শান্তি ও মৈত্রীর আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়নি ভারত।

ভারতের বুকে জন্ম. নিয়েছে হিন্দু-বৌদ্ধ-জৈন-শিখ প্রভৃতি ধর্ম। খ্রীষ্টান এবং ইসলাম ধর্ম বিদেশ থেকে এসেছে। ধর্মীয় বিরোধ ভারতীয় সমাজ কাঠামোকে অনেকটাই বদলে দিয়েছে।

মধ্যযুগে প্রায় আট শত বছর ধরে মুসলিম শাসনে হিন্দু সমাজের উদার মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী অনেকটাই সংকোচিত হয়েছে। আচ্ছন্ন হয়েছে নানা কুসংস্কার ও কঠোর শাস্ত্রীয় শাসনে। জন্মসূত্রে জাতিভেদ প্রথা এই সময়েরই সৃষ্টি। এর আগে ছিল বৃত্তিগত বর্ণভেদ প্রথা।

মোগল সম্রাট আকবরের বিশ্বস্ত বন্ধু, মন্ত্রী ও সেনাপতি আবুল ফজল আইন-ই-আকবরী গ্রন্থ লিখে স্মরণীয় হয়ে আছেন। কিছুটা অতিরঞ্জিত হলেও ঐ সময়ের সমাজ ও রাষ্ট্রের একমাত্র প্রামাণ্য দলিল হল এই গ্রন্থ খানি। সম্রাটকে সুপরামর্শ দিতেন বলেই সন্দেহ বশতঃ যুবরাজ সেলিম ষড়যন্ত্র করে আবুল ফজলকে হত্যা করেছিলেন। আকবর এর জন্য খুবই মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করেছিলেন।

আইন-ই-আকবরীতে লেখা হয়েছে আকবরের পূর্ববর্তী কোন বাদশা ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলে ভাবেন নি। আরব এবং পারস্যের সেনানায়কদের উপর শাসন ও রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব দিয়ে বিলাসীতায় জীবন কাটাতেই তারা অভ্যস্ত হয়েছিলেন।

আকবরই প্রথম মুসলিম সম্রাট যিনি ভারতের মাটিতে জন্মেছিলেন এবং ভারতকে স্বদেশ ভূমির মর্যাদা দিয়ে সমগ্র ভারতের অধীশ্বর হয়েছিলেন। বিদেশী মুসলমান রাজকর্মচারীদের ক্রমে ক্রমে বিদায় দিয়ে ভারতীয় মুসলমানদের উচ্চ পদে বসিয়েছিলেন। আকবর বুঝেছিলেন ভারতীয় হিন্দু রাজাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন না করে ভারত বর্ষ শাসন করা যাবে না। বহু যুদ্ধে জয়লাভ করার পর সন্ধির সর্ত হিসেবে উপযুক্ত নজরানা এবং একটি রাজকন্যা অথবা রাজার বোন কে সম্রাটের সঙ্গে বিয়ে দেবার জন্য বাধ্য করেন। বহু রাজপুত রাজা সম্রাটের এই শর্ত মেনে নিয়ে সন্ধি করেন। শুধু চিতোরের রানা এই শর্তে রাজী না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত রাজ্য হারান।

আইন-ই-আকবরীতে আরও বলা হয়েছে। ভারতে অসংখ্য হিন্দু রাজা ও জমিদাররা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চলে বিভক্ত থাকায় মুসলমানদের রাজ্যজয়ে বড় কোন বাধা সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু যেখানে রাজা ও জমিদাররা ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন

সেখানেই মোগল সৈন্য পরাজিত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত ভারত জয় করতে মোগল দের প্রধান শক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছিল দুই লক্ষ অশ্বারোহী রাজপুত বাহিনী। বহু বিশ্বস্ত হিন্দু রাজাকে আকবর সেনাপতি, মন্ত্রী ও অন্যান্য উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ফলে মুসলমান আমীর ও মৌলবীরা বার বার ষড়যন্ত্র করে সম্রাটকে বিপদে ফেলার চেষ্টা করেছিল।

পরবর্তী সময়ে ইংরেজ বণিকদের ক্ষেত্রেও দেখা গেল ভারতীয় সেনারাই ইংরেজদের হাতে তুলে দিয়েছে ভারতের শাসন ভার। পলাশীর যুদ্ধে সিরাজের পরাজয়কে বাঙ্গালীরা ভারতের স্বাধীনতা হারাবার সূত্রপাত বলে ভাবতে পারেনি। কারণ সিরাজওদ্দৌল্লা বাঙ্গালী ছিলেন না। মুসলমান নবাবরা কেউ বাঙ্গালী ছিলেন না। তাদের ভাষা ছিল ফারসী, বাঙ্গালী দরদী হিসেবেও কোন জনপ্রিয়তা ছিল না। মীরজাফর- উর্মিচাঁদ -জগৎশেঠরাও বাঙ্গালী নয়। তাদের বিশ্বাস ঘাতকতায় মাত্র নয় ঘন্টার যুদ্ধে পলাশীর প্রান্তরে নবাবের পরাজয় ঘটেছিল। ইংরেজরা এসেছিল এদেশে ব্যবসা করতে। তারাও দীর্ঘদিন শাসন ক্ষমতা নিজেদের হাতে তুলে নিয়ে সাহস পায়নি। তাই বাংলায় চলেছিল দ্বৈতশাসন-নবাবের শাসন এবং ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসন। ভারতীয় সেনা সংগ্রহে সাহায্য করেছিল জগৎ শ্রেঠ, উমি চাঁদেরা।

দুইশত বছরের ইংরেজ শাসনে মধ্যযুগের খোলস ছেড়ে ভারত আধুনিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির আলোকে উদ্ভাসিত হল। হিন্দুদের চোখে মুসলমান এবং খ্রীষ্টান উভয় শাসক দলই বিদেশী। কিন্তু ইংরেজ শাসনে হিন্দুদের জন্যে নানা সুযোগ সুবিধা পাওয়ার দরজা খুলে গেল। ইংরেজী শিক্ষিত যুবকেরা নানা কাজে নিযুক্ত হল। অন্যদিকে মুসলমানদের শাসন ক্ষমতা কেড়ে নেবার ফলে মুসলমানদের মধ্যে দেখা গেল ইংরেজ-বিদ্বেষ। তাই তারা ইংরেজি শিক্ষা এবং ইংরেজের চাকরী বয়কট করে নিজেরাই পিছিয়ে পড়ল।

কার্ল মার্কস বলেছেন ভারতে ব্রিটিশ শাসন শাপে বর হয়ে দেখা দিয়েছিল। ঔপনিবেশিক শাসনে একদিকে যেমন জনগনের দুঃখ দুর্দশা বেড়েছে। অন্যদিকে তেমনি আধুনিক বিজ্ঞান-দর্শন-অর্থনীতি- সাহিত্য ও সংস্কৃতির শিক্ষা জাতীয় চেতনার বিকাশ ঘটিয়েছে। এর আগে ভারতবাসী কোনদিন একটি দেশ ও একটি সংস্কৃতির দাবীতে ঐক্যবদ্ধ হবার চেতনা ও শিক্ষা পায়নি। নব জাগ্রত চেতনায় অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতকে উপলব্ধি করার সুযোগ পেয়েছে ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত ভারত বাসী। শুরু হয়েছে জনগণের ইতিহাস রচনার অধ্যায়। রাজা - নবাব-বাদশা নয় জনগণের জন্য জনগণের শাসন কায়েম করার লক্ষ্যে স্বাধীনতার দাবীতে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে ভারতবাসী।

প্রাচীন ও মধ্যযুগে বিদেশী আক্রমণকারীরা যে নিষ্ঠুর নরহত্যা, লুণ্ঠন ও ধ্বংস যজ্ঞ চালিয়েছে, ইতিহাসের পাতায় তার যে সামান্য বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে - তা পাঠ করলেই সাধারণ মানুষের মানবিক চেতনা বিভ্রান্ত ও বিপর্যস্ত হয়ে যায়। এই বিভ্রান্তি

থেকেই জন্ম নেয় সাম্প্রদায়িকতা।

আইন-ই-আকবরীতে আবুল ফজল লিখেছেন - তুর্কী ও পাঠান সুলতানরা হিন্দুদের ঘৃণা করতেন। হিন্দু মন্দির ও মূর্তি ধ্বংস করা তারা ধর্মীয় কর্তব্য বলে মনে করতেন। তারা জোর করে হিন্দুদের ইসলাম ধর্মে দীক্ষা দিতেন। বাবর এবং হুমায়ুনও স্বেচ্ছাচারী ছিলেন। এদেশীয় রীতিনীতিকে কোন মর্যাদা দিতেন না। আকবর এজন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন। হিন্দু- বৌদ্ধ- জৈন- খ্রীষ্টান সন্ন্যাসীদের সঙ্গে আকবর নিয়মিত ধর্মালোচনা করতেন।

আকবরই প্রথম ঘোষণা করেন যে, ইসলাম ধর্ম বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ধর্ম এবং অন্য সব ধর্ম নিকৃষ্ট এরূপ প্রচার মারাত্মক ভুল। বহু ধর্মীয় গ্রন্থ সংগ্রহ করে মুসলমান আমীর ও মৌলবীদের বুঝাবার চেষ্টা করেন যে সব ধর্মই মানুষের মঙ্গল চায়। সব ধর্মের মধ্যেই শিক্ষণীয় বিষয় আছে।

আকবরের উদারতা ধর্মান্ধ মৌলবীদের বশে আনতে পারেনি । কিন্তু পরবর্তী কালে মুসলমান ফকির ও সুফী সাধকেরা উদার মানবিক ভাব ধারায় হিন্দু মুসলমানের মিলন ও বন্ধুত্বের পথ খুলে দিয়েছিলেন। হিন্দু ভক্ত সাধকেরাও একই কাজ করেছেন।

ইতিহাসের নিষ্ঠুর আক্রমণকারী ও খলনায়কেরা মুছে গেছে। সেদিনের ঐতিহাসিক পরিস্থিতিও আর নেই। গ্রীক -শক-হুন-কুষান-মঙ্গোল ও অন্যান্য বহু আক্রমণকারী মানব গোষ্ঠী ভারতীয় সমাজে মিশে গেছে। তাদের আর আলাদা করে চেনার উপায় নেই।

ইসলাম ধর্মের একদল প্রচারক অসি হাতে বিশ্ব জয় করতে বেরিয়েছিল। আকস্মিক আক্রমণে অর্দ্ধেক এশিয়া এবং অর্দ্ধেক ইউরোপ ইসলাম সাম্রাজ্যের অর্ন্তভূক্ত করেছিল। আফ্রিকা মহাদেশে ও ইসলামের সাম্রাজ্য প্রসারিত হয়েছিল । ধর্মের নামে এতবড় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা ইতিহাসে আর কখনো ঘটেনি। কিন্তু এতবড় সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকার নিয়ে পয়গম্বরেরর পরিবারে শুরু হয় কলহ। ভেঙ্গে যায় ইসলামের শান্তি ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শ। মুসলমানরা ভাগ হয়ে গেল শিয়া ও সুন্নি দুই সম্প্রদায়ে।

ইসলামের গণতন্ত্রের আদর্শও টিকলনা। ধর্মগুরু হিসেবে খলিফার প্রভাব শেষ হয়ে গেল। দেশে দেশে মুসলমান শাসন কর্তারা স্বাধীন বাদশা বনে গেলেন। লুন্ঠিত সম্পদে বিলাসিতার বন্যা দেখা গেল বাদশাদের অন্দর মহলে। আইন-ই-আকবরী তে আবুল ফজল লিখেছেন সম্রাট আকবরের বিশাল হারেমে পাঁচহাজার বেগম ও সেবিকা ছিল। বাইরে খোঁজারা পাহারা দিত। আরেকটা ঘাঁটিতে রাজপুত সেনারা পাহারা দিত।

প্রতিদিন সন্ধ্যায় সোনার প্রদীপে ঘৃতের আলো জ্বেলে ষোড়শী সুন্দরীরা সম্রাটের চারদিকে নৃত্য গীতসহ আরতি করত । নানা রকমের মূর্তিতে বাতিদান তৈরী হত । সেকালে এক একটি বাতিদানের মূল্য ছিল দশহাজার টাকা। হাতির দাঁতের সমান কর্পূরের

বাতি জ্বালানো হতো। ৪০ গজ উঁচু মশালে জ্বলতো আকাশ প্রদীপ।

বাদশা শিকারে বা ভ্রমণে গেলে দশ হাজার লোক দাঁড়াতে পারে এমন তাঁবু খাটানো হতো। চারদিকে ৬৪ টি সুসজ্জিত কক্ষে বেগম ও পরিচারিকারা সর্বদা তৈরী থাকতো বাদশাকে সেবা করার জন্যে। সন্ধ্যায় বহুমূল্য মুক্তার ঝালরে তৈরী সভাগৃহে বাদশা বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ করতেন।

খাদ্য ও তাঁবু নির্মাণের জিনিষ পত্র বহনের জন্য একশ হাতি, ৫০০ উট, ৪০০ গরুর গাড়ি, এক হাজার কুলি নিযুক্ত থাকতো। এছাড়া অন্যান্য রক্ষণা বেক্ষণের জন্য এক হাজার কর্মী ছাড়াও কয়েক হাজার প্রহরী থাকতো। বাদশার ঘোড়ার পোষাক তৈরী হতো সোনা রূপা-হীরা-মুক্তা ও রেশমের ঝালর দিয়ে। বাদশার নিজস্ব রক্ষী বাহিনীতে সর্বদা বার হাজার বাছাই করা ঘোড়া এবং বিশেষ জাতের প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হাতি মজুত থাকতো।

যুদ্ধের সময় দেশের সব রাজা ও জমিদার বাদশার নির্দেশ মত সশস্ত্র সৈন্য ও অর্থ দিতে বাধ্য থাকতো। সারা ভারতে এরকম সৈন্যদের সংখ্যা ছিল ৪০ লক্ষ।

মুসলমান বাদশাদের শক্তি ও বিলাসিতার সামান্য বিবরণ উল্লেখ করা হল যাতে ত্রিপুরার মহাসমর বিজয়ী রাজাদের শক্তি ও ক্ষমতা সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যায়।

অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন ভারতে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিতনা হলে ভারতবর্ষ টুকরো টুকরো হয়ে অনেকগুলো ইসলামী রাষ্ট্রে দেশটা ভাগ হয়ে যেত এবং নবাবী শাসন দীর্ঘস্থায়ী হতো।

ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বাণিজ্য করতে এসে, সুযোগ পেয়ে শাসন দন্ড হাতে তুলে নিয়েছে। আমেরিকায় ব্রিটিশরা তেরটি উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। ইংরেজ ও ফরাসী নাগরিকরা বিদ্রোহ করে ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্ত হয়ে তেরটি আমেরিকান উপনিবেশ যুক্ত করে বিশ্বের প্রথম সাধারনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিল। ব্রিটিশ গনতন্ত্রের মাথায় এখনো রয়েছে রাজতন্ত্র।

ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ইংরেজরাও যদি ভারতবর্ষে স্থায়ী বসতি স্থাপন করে ব্রিটিশ শাসন মুক্ত একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতো তাহলে ভারতবর্ষেই প্রথম শিল্প বিপ্লব ঘটতো এবং বিশ্বের একটি শ্রেষ্ঠ শক্তি হিসেবে ভারতবর্ষ মাথা তুলে দাঁড়াতে পারতো এবং ভারতের মানচিত্রটাও হতো সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। ভারতে এমনটা ঘটেনি কারণ ইষ্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর শেয়ার হোল্ডাররা ছিলেন ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য এবং ব্রিটেনের সবচেয়ে বিত্তশালী ও প্রভাবশালী অভিজাত শ্রেণীর লোকজন। সে যুগে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে শুধুমাত্র অভিজাত জমিদার ও বণিক শ্রেণীর লোকেরাই সদস্য নির্বাচিত হতে পারতো। কৃষক, শ্রমিক, মহিলাদের কোন ভোটাধিকার ছিল না।

ব্রিটেন এবং ইউরোপের আধুনিক সভ্যতা জন্ম নিয়েছে বহু রক্তাক্ত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা এবং বিজ্ঞান চর্চার মাধ্যমে।

সমুদ্র তীরবর্তী দেশগুলো নৌশক্তিতে বলিয়ান হয়ে সমুদ্র যাত্রা শুরু করেছিল, নতুন দেশ আবিষ্কার করে উপনিবেশ স্থাপন করে স্থায়ী বাজার দখল করার উদ্দেশ্যে। ক্ষুদ্র দেশ স্পেন প্রথমে সাহসী অভিযান শুরু করে। রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকেতায় স্পেনীয়রা গেল পশ্চিমে আর পর্তুগীজরা গেল পূর্বদিকে। তাদের পিছু নিল ব্রিটেন এবং ফ্রান্স। আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া এবং ভারতে বিশাল উপনিবেশ স্থাপন করে ইংরেজরাই প্রথম সেরা সাম্রাজ্যের অধিকারী হল। অন্যরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চলে সীমাবদ্ধ রইল। পরবর্তী সময়ে বাজার ভাগাভাগির জন্যে দুটি বিশ্বযুদ্ধ ঘটে গেল। পরিণতিতে উপনিবেশবাদ ধ্বংস হল।

১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করলেন। এর আগে সভ্য দুনিয়ার মানুষ আমেরিকার কথা জানতনা। প্রাচীন যুগে সবকয়টি মহাদেশ একসঙ্গে অখন্ড স্থল ভূমি রূপে ছিল। বারবার প্রচন্ড ভূমিকম্পে এবং পৃথিবীর অভ্যন্তরে জটিল পরিবর্তনের ফলে পৃথিবীর মানচিত্রটা বদলে গেল। প্রথমে অস্ট্রেলিয়া, পরে আমেরিকা আলাদা হয়ে গেল। মহাসমুদ্র মহাদেশগুলোকে বিচ্ছিন্ন করে দিল। এরপর আফ্রিকাও সরে গেল। এশিয়া এবং ইউরোপ এখনো যুক্ত রয়েছে। ভারত মহাসাগরটা একসময় ছিল স্থলভূমি। প্রচন্ড ভূমিকম্পে একসময় স্থলভাগ তলিয়ে গিয়ে সৃষ্টি হল মহা সমুদ্র। অন্যদিকে ভেসে উঠলো হিমালয় পর্বতমালা ও তার সমতল ভূমি।

একসময় ত্রিপুরা ও পূর্ব বাংলা সহ উত্তর পূর্বাঞ্চল ছিল সমুদ্রের তলায়। পাহাড়ের পাললিক শিলায় সে ইতিহাস হয়েছে। মাটির বুকে চিহ্নিত ইতিহাস বিশেষজ্ঞরা নির্ভুল ভাবে আবিষ্কার করতে পারেন।

সাম্প্রতিক কালে ত্রিপুরাসহ উত্তর পূর্বাঞ্চলের সব কয়টি রাজ্যে জাতি উপজাতি সমস্যা নিয়ে যে সব প্রশ্ন দেখা দিয়েছে আদিবাসীদের অধিকার ও বিদেশী বিতাড়নের দাবী উঠেছে, এমনকি কয়েকটি রাজ্যে এক উপজাতিরাই অন্য উপজাতি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র আক্রমণ চালাচ্ছে। এসব জটিল প্রশ্নের জবাব পেতে হলে ইতিহাসের শিক্ষা একান্ত প্রয়োজন। পৃথিবী ও মানব সমাজের ইতিহাস খুব সংক্ষেপে আলোচনা করলেই প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলোর বিচার বিশ্লেষণ সহজ হবে এবং মানবিক উদার দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে উঠবে। এখন আমরা সেদিকেই আলোচনা এগিয়ে নেব।

# পৃথিবীর জন্ম ও বিবর্তন

বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানীরা নানা ভাবে প্রমাণ করেছেন যে আমাদের এই পৃথিবীটা চিরকাল ছিলনা। ভবিষ্যতে কোন এক সময়ে হয়তো এই পৃথিবী থাকবে না।



বহু প্রাচীন কাল থেকেই মানুষের মনে পৃথিবী, প্রকৃতি ও মানুষ সম্পর্কে নানা প্রশ্ন জেগেছে। দার্শনিকরা এবং বিভিন্ন ধর্মের প্রচারকরা নানা ধরনের কল্পিত ধারনা প্রচার করেছেন। কিন্তু মানুষের অনুসন্ধিৎসু মন তাতে সন্তুষ্ট থাকেনি। সঠিক উত্তর খুঁজে পাবার জন্যে নানা ভাবে চেষ্টা চালিয়েছে। যুক্তি ও প্রমাণের সাহায্যে খুঁজে বের করেছে সঠিক উত্তর।

একসময় ধারণা ছিল পৃথিবীটা সমতল এবং চিরকাল ধরেই পৃথিবীটা আছে। বিজ্ঞানীরা নানা দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রমাণ করলেন, পৃথিবীটা সমতল নয় গোল। সমুদ্রপথে যাত্রাকালে জাহাজের মাস্তুলটা অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার ঘটনা দেখে অনেকে স্বীকার করলেন পৃথিবীটা গোল বটে। বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানীরা মহাকাশে উপগ্রহ পাঠিয়ে স্বচক্ষে দেখা গোলাকার নীল বর্ণের পৃথিবীটার অজস্র ছবি তুলে এনে সব সংশয় দূর করলেন।

১৭৫৫ সালে জার্মানীর একজন দার্শনিক হুমানুয়েল কান্ট প্রথম বলেন, যে, সূর্য, গ্রহ, উপগ্রহ, ধুমকেতু এবং উল্কা পিন্ড সবকিছুরর জন্ম হয়েছে এক বিশাল আকারের নীহারিকা থেকে।

দীর্ঘকাল ধরে পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার পর দুজন আমেরিকান বিজ্ঞানী ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে বললেন কয়েকশ কোটি বছর আগে একটি নক্ষত্র সূর্যের পাশ দিয়ে ছুটে যাবার সময় সূর্যের দেহ থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসেছিল কিছু অংশ। সূর্যের আকর্ষণে সূর্যের চারদিকে ঘুরতে থাকা গ্যাসীয় পিন্ডগুলো ক্রমশ ঠান্ডা হয়ে সৃষ্টি হল গ্রহ ও উপগ্রহ গুলো।

দুজন ইংরেজ বিজ্ঞানী সামান্য সংশোধনসহ দ্বিতীয় মতটি সমর্থন করলেন। সোভিয়েত রাশিয়ার একজন বিজ্ঞানী তৃতীয় একটি মত প্রকাশ করে বললেন, সূর্য মহাকাশে ছুটতে ছুটতে একটি নীহারিকা ভেদ করে বেরিয়ে যাবার সময় নীহারিকার একটি অংশ বেরিয়ে এসে টুকরো টুকরো হয়ে সূর্যের চার পাশে ঘুরতে থাকে। এরাই হল সূর্যের নয়টি গ্রহ এবং গ্রহগুলোর পঞ্চাশটি উপগ্রহ।

সূর্য অথবা নীহারিকা থেকে গ্রহ উপগ্রহ গুলোর জন্ম হয়েছে এবিষয়ে বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানীরা একমত। মহাকাশ অভিযানের ফলে বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কার ঘটছে। নির্ভুল উত্তর শীঘ্রই পাওয়া যাবে।

সূর্যকে কেন্দ্র করে সৌর জগতের গ্রহগুলো এবং গ্রহকে কেন্দ্র করে উপগ্রহ গুলো ঘুরছে এ বিষয়ে কারো মনে এখন আর কোন সংশয় নেই। অথচ সুদীর্ঘ কাল ধরে মানুষ বিশ্বাস করতো, পৃথিবীটা স্থির আছে সূর্য এবং চন্দ্র পৃথিবীর চারপাশে ঘুরছে। খালি চোখে সূর্য ও চন্দ্রের পরিক্রমা দেখে ধর্মীয় পুরোহিতরা যে মত প্রচার করেছিলেন, বিজ্ঞানীদের মত মেনে নিলে তাদের মতটা মিথ্যা প্রমাণিত হবে। এই ভয়ে বহু বিজ্ঞানীকে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হয়েছে। সত্যকে স্বীকার করে নেবার সাহস ধর্মীয় নেতাদের ছিলনা।

আমাদের এই পৃথিবীটার সঠিক বয়স কত, এ বিষয়ে এখনো কিছু মতভেদ আছে। মানুষ পাথরের বুকে অতীতের চিহ্ন বিশ্লেষণ করে অতীত ইতিহাসের নিখুঁত বিবরণ আবিষ্কার করার বিদ্যা অর্জন করেছে । কিন্তু পৃথিবীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করা সম্ভব নয়। আগ্নেয়গিরির উৎক্ষিপ্ত পাথর বিশ্লেষণ করে এ যাবত হিসেবে নিকেশ হয়েছে। এখন মানুষ অন্যান্য গ্রহে অভিযান চালিয়ে অভ্যন্তর ভাগের পাথর সংগ্রহ করে এনেছে। একবিংশ শতাব্দীর মধ্যেই পৃথিবীর সঠিক বয়স নির্ণয় করা সম্ভব হবে।

অধিকাংশ বিজ্ঞানীদের বর্তমান মত হল ৪৬০ কোটি বছর আগে পৃথিবীর জন্ম হয়েছিল। প্রায় ২০০ কোটি বছর পৃথিবীটা ছিল একটা গ্যাসীয় জলন্ত পিন্ড। ক্রমশ ঠান্ডা হতে হতে তরল ভূপৃষ্ঠের উপর দুধের সরের মত ভূত্বক সৃষ্টি হয়েছে।

বায়ু মন্ডলে বিভিন্ন গ্যাস ও জলীয় বাষ্পের মেঘ জমে তৈরী হয়েছে আকাশ। অবিরাম বৃষ্টিপাত, ঝড়, ঝঞ্ঝা এবং ঘন ঘন ভূমিকম্পের ফলে পৃথিবীর পৃষ্ঠ দেশটা হয়েছে এবরো থেবরো। প্রতি একলক্ষ বছরে পৃথিবীর মানচিত্রটা বদলে যাচ্ছে। কোথাও পাহাড় তলিয়ে গিয়ে সৃষ্টি হচ্ছে সমুদ্র আবার কোথাও সমুদ্রের বুক থেকে ভেসে উঠছে পাহাড় পর্বত সহ সমতল ভুমি।

এভাবে কোটি কোটি বছরের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সমুদ্রের জলে দেখা দিয়েছে শেওলা। আরও কোটি কোটি বছর পর শেওলা থেকে অতিক্ষুদ্র এককোষি প্রাণী। কোটি কোটি বছর ধরে এককোষি প্রাণীদের রাজত্ব চলেছে। তারপর এক সময় বিভিন্ন ভাগে মিশ্রিত হয়ে নানা প্রজাতির জলজ প্রাণী ও কীট পতঙ্গ সৃষ্টি হল।

আবহাওয়া পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সবকিছু বদলে যেতে থাকলো। কীট পতঙ্গ ও জলজ ঘাস আবহাওয়ার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়ে টিকে থাকতে পেরেছে। কিন্তু অন্যান্য প্রাণী ও উদ্ভিদ বিভিন্ন পরিবেশে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। আবার নতুন প্রজন্মের প্রাণী ও উদ্ভিদ সৃষ্টি হচ্ছে। একসময় বহুকোটি বছর ধরে বিশাল আকারের ডাইনোসরেরা রাজত্ব করেছে। সে পরিবেশে মানুষের আর্বিভাব সম্ভব ছিল না। পরিবেশের পরিবর্তনে ডাইনোসরেরা ধ্বংস হয়ে গেছে। নতুন করে জন্ম নিয়েছে নতুন প্রজাতির প্রাণী। এ ভাবেই একসময় ছিল শুধু জলজ প্রাণী। স্থলভাগে কিছুই ছিল না। ক্রমে জলজ ঘাস

থেকে সৃষ্টি হল নানা রকমের গাছ লতা ও ঝোপ ঝাড়। ক্রমশ এল বাঘ - সিংহ - বানর জাতীয় বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণী। সব শেষে পৃথিবীতে এসেছে মানুষ।

পৃথিবীর অভ্যন্তরে এখনো চলছে পরিবর্তনের ধারা। তবে আগের মত অস্থিরভাবে নয়। উষ্ণযুগ-তুষার যুগ-ভয়াবহ ভূমিকম্প-আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ এসব ঘটনা একসময় খুব ঘন ঘন এবং ভয়াবহ রূপে দেখা দিত সারাপৃথিবী জুড়ে। কিন্তু এখন এসব ঘটনা ঘটে বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে।

সমুদ্রের তলায় এখনো রয়েছে অসংখ্য সজীব আগ্নেয়গিরি। ভবিষ্যতেও কখনো সমুদ্রের বুকে ভেসে উঠতে পারে বিশাল স্থল ভূমি। অন্য দিকে তলিয়ে যেতে পারে বহু পরিচিত দেশ।

বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানীরা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণগুলো আবিষ্কার করেছেন। প্রতিকারের নানা উপায়ও উদ্ভাবন করেছেন। কিন্তু মানুষ এখনো প্রাকৃতিক শক্তির সামনে অনেকটা অসহায়। বহু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এখনো কার্যকর ভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব হয়নি। আশা করা যায় আগামী দিনে মানুষ বহু অসাধ্য সাধন করবে।

প্রাকৃতিক নিয়মে পৃথিবীর মৃত্যু ঘটতে কোটি কোটি বছর সময় লাগবে। অথচ মানুষ এখনই এমন শক্তি আবিষ্কার করেছে যা প্রয়োগ করলে পৃথিবীর প্রাণী ও উদ্ভিদ জগৎ সম্পূর্ণ ধবংস হয়ে যাবে। এই ধ্বংসের ক্ষমতা এখন বেশ কয়েকটি দেশের হাতে জমা আছে বলেই তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু করা সম্ভব হচ্ছে না। কারণ, এরকম যুদ্ধে জয়লাভের জন্য পৃথিবীতে কেউ বেঁচে থাকবে না।

আজ পর্যন্ত পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা দ্বিতীয় কোন পৃথিবী আবিষ্কার করতে পারেনি যেখানে প্রাণী ও উদ্ভিদ জন্মাতে পারে। বিংশ শতাব্দীর মহাকাশ অভিযান বিজ্ঞানীদের বহু স্বপ্ন ও ধারণা বদলে দিয়েছে। এতকাল আশা করা হয়েছিল সৌর জগতের নয়টি গ্রহের কয়েকটিতে মানুষের মত প্রাণীদের দেখা পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু এসব ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়েছে।

সৌর জগতের সব চেয়ে ছোট এবং সূর্য থেকে সবচেয়ে কাছের গ্রহ হল বুধ। এই গ্রহে এত বেশী উত্তাপ যে, এখানে প্রাণ সৃষ্টির কোন সম্ভাবনা নেই। বুধের কোন উপগ্রহ নেই। শুক্র গ্রহটি সম্পর্কে এখনো যথেষ্ট তথ্য পাওয়া যায়নি। এই গ্রহেরও কোন উপগ্রহ নেই। সূর্য থেকে দূরত্ব অনুযায়ী পৃথিবী রয়েছে তৃতীয় স্থানে। আয়তনে পৃথিবীটা হল সূর্যের দশ ভাগের এক ভাগ। পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ হল চাঁদ। চতুর্থ স্থানে রয়েছে মঙ্গল গ্রহটি এখানে প্রাণ ধারনের উপযোগী পরিবেশ আছে মনে করা হতো। পৃথিবীর বিশেষ পরিবেশের জন্য মহাকাশে পৃথিবীকে নীল বর্ণের দেখায়। কিন্তু মঙ্গলের লালবর্ণ

দেখে বিজ্ঞানীরা ভাবছেন মঙ্গল গ্রহের পাথর গুলোতে মরিচা পড়ে লাল বর্ণ ধারণ করেছে। হয়তো মঙ্গল গ্রহের মাটির তলায় জলের সন্ধান পাওয়া যাবে। তাহলে মঙ্গল গ্রহকে পৃথিবীর মানুষ, মনুষ্য বাসের উপযোগী করে তুলতে পারবে।

সৌর জগতের বৃহত্তম গ্রহ বৃহস্পতি। এই গ্রহের ষোলটি উপগ্রহ আছে। এখানে তাপমাত্রা ১২৬° সেন্টিগ্রেড। এখানেও প্রাণের অস্তিত্ব নেই। সৌর জগতের দ্বিতীয় বৃহত্তম গ্রহটি হল শনি। এখানে আবহাওয়া ঠান্ডা। ১৭ টি উপগ্রহ আছে শনির। মহাকাশ বিজ্ঞানীরা বলছেন আরও ৫ টি উপগ্রহ শনির চারদিকে ঘুরছে। গ্যালিলিও এই গ্রহটি আবিষ্কার করেছিলেন। এখানেও প্রাণীর সন্ধান পাওয়া যায়নি।

সপ্তম - অষ্টম ও নবম গ্রহগুলো হল ইউরেনাস, নেপচুন ও প্লুটো। ইউরেনাস পৃথিবীর চেয়ে অনেক বড়। প্লুটো হল শীতলতম গ্রহ। ইউরেনাসের পাঁচটি এবং প্লুটোর একটি উপগ্রহ আছে। নেপচুনের আছে তিনটি উপগ্রহ। এদের কোনটিতেই প্রাণের অস্তিত্ব নেই।

**আমাদের বাসযোগ্য একটাই পৃথিবী আছে। এই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রাণী হল মানুষ। মানুষের হাতেই আছে পৃথিবী ও মানব জাতির ভাগ্য। এটাকে রক্ষা করা ও সমৃদ্ধ করে তোলা প্রত্যেক মানুষেরই কর্তব্য। সব মানুষেরই জন্ম ভূমি হল এই একটি মাত্র পৃথিবী।**

## আধুনিক পৃথিবীর চেহারা

বিংশ শতাব্দীর পৃথিবীতে পাঁচটি মহাদেশে একশ বিরানব্বইটি স্বাধীন দেশ রয়েছে। সবচেয়ে বড় মহাদেশ এশিয়ায় আছে ৪৮ টি স্বাধীন দেশ। দ্বিতীয় বৃহত্তম মহাদেশ আফ্রিকায় রয়েছে ৪৩ টি স্বাধীন দেশ এবং চতুর্থ মহাদেশ দক্ষিণ আমেরিকায় আছে ১২ টি দেশ। ক্ষুদ্রতম মহাদেশটি হল অস্ট্রেলিয়া। একটি দেশকে ১৪ টি আঞ্চলিক দেশে বিভক্ত করা হয়েছে। উপকূল ভাগেই নগর ভিত্তিক দেশ গড়ে উঠেছে। ইউরোপ মহাদেশে রয়েছে ৪২ টি স্বাধীন রাষ্ট্র। মোট ১৯২ টি স্বাধীন রাষ্ট্র এখন রাষ্ট্রসংঘের সদস্য দেশ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে পৃথিবীর স্বাধীন রাষ্ট্রগুলোর উন্নয়ন, শান্তি রক্ষা ও মানব সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ মূলক ব্যবস্থা গ্রহনের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর মেরুতে এন্টারাকটিকা নামে একটি মহাদেশ আবিষ্কৃত হয়েছে। ১৯২১ সালে প্রথম এখানে মানুষের পদার্পণ ঘটেছে। বিশাল মহাদেশটি সারা বছর বরফে ঢাকা থাকে। ছয়মাস দিন ও ছয় মাস রাত্রি হয়। পেঙ্গুইন নামে একপ্রকার প্রাণী ছাড়া অন্য কোন প্রাণীর অস্তিত্ব নেই এখানে। প্রচন্ড ঠান্ডার জন্য খাদ্য উৎপাদন বা মানুষের বসবাস সম্ভব নয়। বিভিন্ন দেশ এখানে গবেষণাগার তৈরী করছে। ভবিষ্যতে

কিভাবে এই মহাদেশটিকে কাজে লাগান যাবে তা জানার জন্যে চেষ্টা চলছে।

পৃথিবীর তিন ভাগ জল এবং একভাগ স্থল। জলভাগে রয়েছে অসংখ্য নদী-সাগর -উপসাগর-হ্রদ ও মহাসাগর। কতকগুলো সাগর মিলে এক একটি মহাসাগর তৈরী হয়েছে। নদীরা মিলেছে সাগরে। বহু নদী কিছুকাল পর পর গতিপথ বদলায়, আবার কিছু নদী লুপ্ত হয়ে নতুন নদী তৈরী হয়।

পৃথিবীর তিনটি প্রধান মহাসাগর হল (১) প্রশান্ত মহাসাগর, (২) আটলান্টিক মহাসাগর, (৩) ভারত মহাসাগব। প্রত্যেক মহাসাগরের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে চারটি করে প্রধান সাগর। দক্ষিন চীন সাগর -পূর্বচীন সাগর - বেরিং সাগর এবং ওখোষ্ট সাগর মিলেছে প্রশান্ত মহাসাগরে। তেমনি ভূমধ্যসাগর - ক্যারিবিয়ান সাগর - মেক্সিকো উপসাগর ও নরওয়ে সাগর মিলেছে, আটলান্টিক মহাসাগরে। আর ভারত মহাসাগরে মিলেছে আরব সাগর- বঙ্গোপসার- আন্দামান সাগর এবং লোহিত সাগর। এছাড়াও রয়েছে বহু ছোট ছোট সাগর ও উপসাগর, নদী ও হ্রদ।

স্থলভাগের বিশাল বিশাল অঞ্চলে রয়েছে মরুভূমি এবং গভীর অরণ্য। আফ্রিকার সাহারা মরুভূমি হল গ্রেট সেন্ডি ও গ্রেট ভিক্টোরিয়া। আমেরিকার বড় মরুভূমিটির নাম হল সোনারন মরুভূমি, এশিয়ার চীনে গোবি ও টাকিয়া মাকন দুটি বড় মরুভূমি, ভারতে গ্রেট ইন্ডিয়ান মরুভূমি ছাড়াও চারটি মহাদেশেই আরও ছোট এবং মাঝারী অনেক মরুভুমি রয়েছে। ইউরোপে কোন মরুভূমি নেই। সব মহাদেশেই গভীর ঘন অরণ্য আছে। সবচেয়ে বড়টি আছে আফ্রিকায়। সব মহাদেশেই বরফে ঢাকা ছোট বড় অঞ্চল ও পাহাড় পর্বত রয়েছে।

সারা পৃথিবীতে বর্তমানে দশ লক্ষ প্রজাতির প্রাণী এবং তিন লক্ষ প্রজাতির উদ্ভিদ রয়েছে। বহু প্রজাতির প্রাণী ও উদ্ভিদ আবহাওয়া বদলের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে না পেরে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে আবার নতুন প্রজাতির প্রাণী ও উদ্ভিদের আবির্ভাব ঘটছে। প্রাণীরা আত্ম রক্ষার জন্য একস্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে পারে। কিন্তু গাছ গাছড়া তা পারে না। সূর্যের আলো পৃথিবীর সব জায়গায় একই ভাবে পড়ে না। তাই দেশে দেশে আবহাওয়ার পার্থক্য ঘটে। জমি, জল, বাতাস মিলেই তৈরী হয় পরিবেশ। তাই নদী উপত্যকাগুলিই হয়েছে মনুষ্য বসতির শ্রেষ্ঠ স্থান।

## মানুষের আবির্ভাব ও ক্রমবিকাশের ধারা

পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন, প্রায় ১২০ কোটি বছর আগে সমুদ্রের বুকে প্রথম এককোষি প্রাণীদের জন্ম হয়েছিল। কোটি কোটি বছর ধরে নানা পরিবর্তন ও

বিপর্যয়ের জটিল ধারায় এক সময় এককোষি প্রাণীরা জোট বাঁধতে থাকে। নানা রকমের জোট থেকে জন্ম নিতে থাকে নানা প্রজাতির জলজ- প্রাণী ও কীট-পতঙ্গ। বহু কোটি বছর ধরে চলে তাদের রাজত্ব। সমস্ত স্থলভাগে তখনো প্রাণী বা উদ্ভিদের চিহ্ন মাত্রও ছিল না।

আরও বহু কোটি বছর পর দেখা দিল এক প্রজাতির মাছ। যাদের কোন চিহ্ন আজকের পৃথিবীতে নেই। বহু পরিবর্তনের পর দেখা দিল এক ধরনের জলজ ঘাস। সারা পৃথিবী জুড়ে চল্‌ছে তখন দ্রুত পরিবর্তনের ধারা। কখনো বরফের যুগ আবার কখনো ভয়ানক উষ্ণতার যুগ। প্লাবনের ধারায় জলজ ঘাসেরা উঠে এলো স্থল ভূমিতে, দেখা দিল নানা প্রজাতির উদ্ভিদ। জলচর প্রাণীদের মধ্যে সরীসৃপেরা এল, সৃষ্টি হল উভচর প্রাণী। স্থলভাগে দেখা দিল নানা প্রজাতির পশু পাখী ও বড় বড় নানা প্রজাতির গাছ গাছড়া। তারপর হিংস্র ও নিরামিষাশী দুই ধরনের বিশাল আকৃতির ডাইনোসরদের ডাকে পৃথিবীর আকাশ বাতাস কেঁপেছে বহু কোটি বছর। শেষ পর্যন্ত এরাও লুপ্ত হয়ে গেল। তারপরেও লক্ষ লক্ষ বছর ধরে বহু পরিবর্তন ঘটেছে পৃথিবীর বুকে। নানা প্রজাতির বাঘ- ভালুক- সিংহ ও বানর দের আবির্ভাব ঘটল পৃথিবীতে।এরপর একসময় লেজহীন এক প্রজাতির বানর থেকে উদ্ভব ঘটল গেরিলা - ওরাং ওটাং- শিম্পাঞ্জী ও বন্য মানুষদের। প্রায় পাঁচ লক্ষ বছর বন্য পশুর জীবন কাটিয়ে এক সময় মানুষেরা পশুর জগত থেকে আলাদা হয়ে এল। এটা সম্ভব হয়েছে মানুষের মস্তিষ্ক, হাত ও পা উন্নত হয়ে উঠার ফলে।

পৃথিবীতে একমাত্র মানুষেরই হাত আছে। মানুষই শুধু দুই পায়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে। মানুষই কেবল বুদ্ধিবলে হাতের সাহায্যে হাতিয়ার বানাতে শিখেছে।

মানুষের ক্রম বিকাশে বন্য, বর্বর ও সভ্য তিনটি স্তরের ইতিহাস আমরা জানতে পেরেছি। বন্য জীবনটাই ছিল সুদীর্ঘ কাল ধরে। বর্বর জীবনেরও অনেকগুলো স্তর অতিক্রম করতে হয়েছে।

বন্য জীবনে মানুষ ছিল খুবই অসহায়। শিকার করার মত তীক্ষ্ন ধার নখ ও দাঁত মানুষের কখনোই ছিলনা। হিংস্র পশুর সামনে পড়লে পালিয়ে আত্মরক্ষা করতো। মৃত পশুর মাংস পেলে খেত। গাছে গাছে ঘুরে ঘুরে ফল- লতা- পাতা খেত। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে মানুষ ছিল সর্বভূক প্রাণী। যে কোন পশু, পাখী ও মাছ খেত। অসংখ্য প্রজাতি থেকে উপযুক্ত ফলমূল, লতা, পাতা খাদ্য হিসেবে নির্বাচন করতে হাজার হাজার বছর সময় লেগেছে।

একসময় গাছের ডাল ভেঙ্গে ছুড়ে মারা এবং আক্রমণ ও আত্মরক্ষার জন্য লাঠি হিসেবে গাছের ডাল ব্যবহার করা, পাথরের টুকরো ছুড়ে মারা, এসব কাজ করতে

করতে সোজা হয়ে দাঁড়াতে - হাঁটতে এবং দৌড়াতে শিখেছে মানুষ। ঠিক তখন থেকেই মানুষ অন্য পশুদের থেকে আলাদা হয়ে গেল। পাথরের টুকরো দিয়ে দলবদ্ধ ভাবে আক্রমণ ও শিকার করতে গিয়ে দলবদ্ধ জীবন যাত্রার সূত্রপাত হল। পাথর ভাঙ্গতে গিয়ে ধারালো অংশ পরখ করে অস্ত্র তৈরী করতে শুরু করেছিল। পৃথিবীর সব দিকে যখন কারো সঙ্গে কারো পরিচয় বা যোগাযোগ ছিল না তখনই সব অঞ্চলের মানুষেরা একই রকম ভাবে পাথর ভেঙ্গে অস্ত্র তৈরী করেছে। প্রয়োজনের দিক থেকে বিচার করলে সব অঞ্চলের মানুষকেই একই রকম অস্ত্র তৈরী করতে হয়েছে। পাথর ভাঙ্গার জন্য পাথরের হাতুরী, মাংস কাটার জন্য পাথরের ছুরি ও কুঠার, শিকারের জন্য বর্শা সব দেশের মানুষেরাই তৈরী করেছে, আকারে ও দক্ষতায় পার্থক্য ছিল। কিন্তু একই রকম প্রয়োজনের অনুভূতি লক্ষ্য করার মত। প্রথমে ছিল ভোঁতা পাথরের অস্ত্র। এ যুগটাকে বলা হয় **পুরাতন পাথরের যুগ**। এটাও ছিল দীর্ঘস্থায়ী। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন মানুষেরা সারা পৃথিবী জুড়ে একই ধরনের অস্ত্র ও যন্ত্রপাতি নির্মাণ প্রচেষ্টাকে ডারউইন খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে বর্ণনা করেছেন।

ক্রমে ক্রমে মানুষ মসৃণ পাথরের অস্ত্র তৈরী করতে শিখেছে। প্রয়োজন মত নতুন নতুন পাথরের অস্ত্র এবং ব্যবহারের নানা পদ্ধতি মানুষ আবিষ্কার করেছে। এটাকে বলে **নতুন পাথরের যুগ**। এ যুগের শেষ দিকে মানুষ শিকার করার জন্য তীর ধনুক আবিষ্কার করেছে। বনের দাবানল থেকে আগুন সংগ্রহ করে পাহাড়ের গুহার মুখে সারাক্ষণ আগুন জ্বালিয়ে বন্য হিংস্র পশুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার উপায় আবিষ্কার করেছে। দাবানলের আগুনে পুড়ে যাওয়া পশুর মাংস খেয়ে আগুনে পুড়িয়ে মাংস খাওয়া শিখেছে। রাতের অন্ধকারে গুহার সামনে আগুনের চারদিকে জড়ো হয়ে পশুদের অনুকরণে এবং শিকারের কৌশল দেখিয়ে নাচ গানের আসর বসিয়েছে। এ যুগে মানুষ হয়ে উঠেছে দক্ষ শিকারী। কিন্তু মানুষ তখনো ছিল বর্বর অবস্থায়। যাযাবর জীবন সর্বত্র প্রচলিত ছিল। পোষাক আসাক বাড়ীঘর তৈরী করার বিদ্যা কারো জানা ছিল না।

**মাত্র দশ হাজার বছর আগে মানুষ কৃষি আবিষ্কার করেছে**। সন্তান জন্ম দেওয়া এবং পালন করার জন্যে মেয়েরা গুহায় থাকতে বাধ্য হতো। পুরুষেরা দূর দূরান্তে শিকার করতে যেত। মেয়েরা লক্ষ্য করেছিল যে ফলের বীজ থেকে নতুন গাছ জন্মায়। এসব গাছ থেকে আবার ফুল ও ফল ধরে। মেয়েরা মানুষের জন্ম রহস্য ভাবতে ভাবতে একসময় স্থির করল, পুরুষের লিঙ্গের মত পাথরের লিঙ্গ তৈরী করে মাটি খুঁড়ে বীজ বপন করলে ফসল ও ফল পাওয়া যাবে। এভাবেই পাথরের লিঙ্গ তৈরী করে মেয়েরা কৃষি কাজ শুরু করল। **মানব সমাজে ঘটে গেল এক বিপ্লব**।

লিঙ্গ থেকে ক্রমশ তৈরী হল লাঙ্গল। এটাই সূত্রপাত করল মানব সভ্যতার।

তৈরী হতে থাকল কৃষির উপযোগী নানা ধরনের পাথরের যন্ত্রপাতি। পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে যাযাবরের জীবন যাপনের পরিবর্তে শুরু হল স্থায়ী বসতি স্থাপন। জঙ্গল সাফ করে আগুনে পুড়িয়ে তৈরী হতে থাকল কৃষি জমি। তৈরী হল সভ্য সমাজের ভিত্তি। যাযাবর জীবনে সভ্যতার জন্ম হতে পারেনা। বিংশ শতাব্দীর শেষ লগ্নেও পৃথিবীর বহু দেশে কিছু কিছু যাযাবর শ্রেণীর মানুষদের দেখা যায়। তারা আজও সভ্য সমাজে স্থান করে নিতে পারেনি। আধুনিক সভ্য মানুষেরা আধুনিক শিক্ষা ও অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের মাধ্যমে যাযাবর জীবনের অবসান ঘটাতে সচেষ্ট হয়েছে। হয়তো একশ বছর পর এই পৃথিবীর কোন দেশেই আর যাযাবর মানুষদের দেখা যাবেনা।

কৃষি ও শিকার পাশাপাশি চলেছে দীর্ঘকাল। দলবদ্ধভাবে শিকার করতে গিয়ে মানুষ পশুর বাচ্চাদের ধরে এনে পোষ মানাতে চেষ্টা করেছে। কুকুর - ভেড়া - ছাগল - গরু - মোষ খুব সহজেই পোষ মেনেছে। কুকুরের তীব্র ঘ্রান শক্তি শিকার ধরার কাজে খুব সহায়ক হয়েছে। কুকুরের প্রভুভক্তি পৃথিবীর সর্বত্র স্বীকৃতি পেয়েছে। শুরু হয়েছে পশু শিকারেব সঙ্গে পশু পালন।

শিকার ও কৃষি কাজে পশুর ব্যবহার মানুষের সমাজে আরেকটি বড় আবিষ্কার। বহুকাল মানুষকে জুড়ে দিয়ে লাঙ্গলের চাষ চলতো বহু দেশে। পশুর ব্যবহার শুরু হওয়ায় মানুষ এর থেকে মুক্তি পেল। পশুপালনের ফলে ঘরে বসেই খাদ্য হিসেবে পশুর মাংস পাওয়া গেল।

সভ্যতার প্রথম অবস্থায় মাটি ও পাথরের বাসন পত্র তৈরী ও ব্যবহার শুরু হয়। পাথর ঘষে মসৃণ করতে গিয়ে পাথর ঘষে ঘষে আগুন তৈরী করতে শিখেছে মানুষ। আগে আগুনের ব্যবহার শিখেছিল কিন্তু আগুন তৈরী করতে জানতনা।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এখনো বহু উপজাতি গোষ্ঠীর মানুষ আছে যারা এখনো বাসনপত্র বা প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি তৈরী করতে জানেনা। সভ্যতার আদিম স্তরে আটকে আছে বলে এদের বলা হয় আদিবাসী। এর জন্যে উপজাতিরা মোটেই দায়ী নয়। প্রধানত দায়ী হল তাদের সমাজ ব্যবস্থা এবং তাদের ভাগ্য নিয়ন্তা সর্দার- রাজা ও মহারাজারা।

বিগত পাঁচ হাজার বছরে সভ্যতার কয়েকটা স্তর মানুষ অতিক্রম করে এসেছে। ১) তাম্রযুগ ২) ব্রোঞ্জ যুগ ৩) লৌহ যুগ।

কৃষি সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে প্রধানত সমতল নদী উপত্যকায়। কৃষিপণ্য পরিবহনের জন্যে পশুর ব্যবহাব, নৌ-যান আবিষ্কার, চাকাযুক্ত পশুর দ্বারা টানা গাড়ী আবিস্কার নানা কাজে মানুষের দক্ষতা অনুযায়ী কর্ম বিভাগ, ক্রমে ক্রমে নানা জটিল সমস্যার সৃষ্টি করেছে। বিভিন্ন গোষ্ঠীর শত্রুতামূলক আক্রমণ ও সম্পদ লুন্ঠন ইত্যাদি সমস্যা থেকে মুক্ত হবার জন্য সমাজপতি সর্দার - রাজা - মহারাজা সৃষ্টি করা হয়েছে,

সবদেশের সব সমাজেই।

পাহাড়ে এবং সমতলে কৃষিযোগ্য জমি তৈরী করার জন্য জঙ্গল কেটে আগুন ধরিয়ে জমি তৈরী করা হয়েছে সব দেশে। কারণ পাহাড় ও সমতল সর্বত্রই ছিল ঘন বন-জঙ্গল। সমতল জমিতে বারবার চাষ করার ফলে জঙ্গল জন্মাতে পারেনি। পাহাড়ে কয়েকবার চাষ করার পর জমির উর্বরতা কমে যায় বলে নতুন পাহাড়ে নতুন ভাবে জঙ্গল কেটে চাষের ব্যবস্থা করতে হয়। এই ব্যবস্থাকে ত্রিপুরা ও উত্তর পূর্বাঞ্চলে বলা হয় জুম চাষ। পৃথিবীর বহুদেশে উপজাতিরা এভাবে চাষ করে। এরা স্থায়ী ভাবে কোথাও বসতি গড়ে তুলতে পারে না। যাযাবরের মত এক পাহাড় থেকে অন্য পাহড়ে ঘুরে বেড়াতে হয়। ফলে আধুনিক কৃষি সভ্যতার ধারা থেকে এরা বিচ্ছিন্ন হয়ে থেকেছে। জুম চাষ, পশু শিকার ও পশুপালন এবং ফলমূল সংগ্রহ করে তাদের জীবন যাত্রা নির্বাহ করতে হয়েছে। তাদের সমাজে স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি হয়নি।

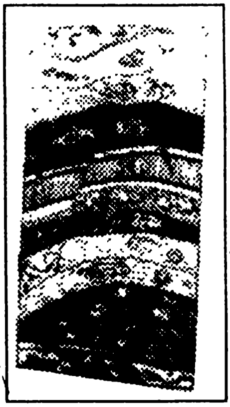
বিংশ শতাব্দীর মুক্তি আন্দোলন রাজতন্ত্র ও সর্দার তন্ত্রের অবসান ঘটিয়াছে। গণতান্ত্রিক পরিবেশে আধুনিক শিক্ষা ও সভ্যতার সব সুযোগ সুবিধা সকলের জন্য সহজলভ্য হবার ফলে উপজাতি সমাজেও বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে। বহুমুখী পেশায় শিক্ষিত হয়ে দ্রুত বিকশিত হয়ে উঠছে উপজাতি সমাজ - সংস্কৃতি ও অর্থনীতি। বিংশ শতাব্দী এই ঘটনার সূত্রপাত ঘটিয়ে মানব সভ্যতার ইতিহাসে বিশেষ ভাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। পাঁচ হাজার বছর আগে বন্যা প্লাবিত পলিমাটির স্তরে মানুষ প্রথম তামার সঙ্গে পরিচিত হয়। আগুনে গলিয়ে তামার অস্ত্র, যন্ত্রপাতি ও বাসনপত্র তৈরী করতে শিখেছে। অবশ্য এর জন্য কয়েকশ বছর চেষ্টা করতে হয়েছে। এর পরেই আবিষ্কার করেছে টিন এবং সীসা। তামার সঙ্গে সীসা অথবা টিন মিশিয়ে তৈরী হল ব্রোঞ্জ। আরও দীর্ঘকাল পরে সোনা - রূপা - লৌহা আবিষ্কার করে মানুষ একের পর এক বিপ্লব ঘটিয়েছে সমাজে। পলিমাটির তৈরী ইঁট দিয়ে ঘর বানাতে শিখেছে। পরে আগুনে পুড়ে আরও শক্ত ইটের ঘর বাড়ী বানিয়েছে। পাথরের ঘর বাড়ী ও তৈরী হয়েছে। শুরু হয়েছে ব্যবসা বানিজ্য। হিসাব রাখার জন্যে আবিষ্কার করেছে লিখিত ভাষার লিপি। লিখিত ভাষা আবিষ্কার করার পর বন্য জীবন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়েছে মানুষ। শুরু হয়েছে অবিরাম সৃষ্টির কাজ। পৃথিবী ও প্রকৃতির রহস্য সন্ধানের প্রচেষ্টা থেকে শুরু হয়েছে শিক্ষা ও বিজ্ঞান।

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে উপজাতি গোষ্ঠীগুলো বিভিন্ন স্তরে আটকে আছে। অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসীরা বন্য জীবনের মধ্য স্তরে তীর ধনুক আবিষ্কার করে উন্নত শিকারী হয়ে উঠেছিল। এর পর আর উন্নতি ঘটাতে পারেনি।

আমেরিকার রেড ইন্ডিয়ানরা মাটির বাসনপত্র তৈরী করতে শিখেছিল। তারপর আর উন্নতি হয়নি। আন্দামান ও আফ্রিকার কিছু আদিবাসীও বন্য স্তরে আটকে ছিল।

পশু শিকার, পশুপালন ও পাহাড়ের গুহায় বসবাসের জীবনটাকে বলা হয় বর্বর জীবন। ঐ স্তরে বহু গুহায় পশুর এবং শিকারের বহু ছবি পাথরের গায়ে খোদাই করে আঁকা হয়েছে। এসব আবিষ্কারেরর দ্বারা বুঝা যায় বর্বর যুগেও মানুষের চিন্তাধারায় সৌন্দর্যপ্রীতি দেখা দিয়েছিল।

মানব সমাজের ক্রম বিকাশের বিভিন্ন স্তরকে এক একটি সিঁড়ির সঙ্গে তুলনা করলে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন স্তরের সিঁড়িতে আদিবাসী বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষকে এখনো প্রত্যক্ষ করা যায়।



বিংশ শতাব্দী সব স্তরের মানব গোষ্ঠীর মুক্তির পথ খুলে য়েছে। একবিংশ শতাব্দীর শেষে পৃথিবীর কোন দেশেই আদিবাসী সমাজকে খুঁজে পাওয়া যাবেনা। জাতিগঠন প্রক্রিয়ায় আধুনিক সভ্যতার উত্তরণের সংগ্রামে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক সংঘাতের বিভিন্ন রূপ প্রকাশ পাচ্ছে। ত্রিপুরা সহ উত্তর পূর্বাঞ্চলেও আমরা সংঘাতের নানা রূপ দেখতে পাচ্ছি। ইতিহাসের গতিপথে সমন্বয়ের ধারায় এরূপ সংঘাত খুবই সাময়িক ঘটনা।

নব সংক্রান্ত বিদ্যাকে বলে নৃতত্ত্ব। এই বিদ্যায় বিশেষজ্ঞরা বিংশ শতাব্দীর নানা খনন কার্যের ফলে প্রাপ্ত নরমুন্ড ও নরকংকাল পরীক্ষা করে মানব সমাজের অতীত ইতিহাস তৈরী করেছেন। চীন, ভারত, অষ্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা ও ইউরোপের নানা খনিতে কয়েক লক্ষ বছর আগেকার নরমুন্ড ও কংকাল আবিষ্কৃত হয়েছে। এছাড়া পৃথিবীর সর্বত্র পাহাড়ের পাললিক শিলার প্রতিটি স্তরে রয়েছে কোটি কোটি বছরের কীট-পতঙ্গ-প্রাণী ও উদ্ভিদের ফসিল। এগুলি থেকে পাওয়া গেছে বহু কোটি বছরের নির্ভুল ঐতিহাসিক উপাদান।

অন্যদিকে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা সংগ্রহ করেছেন প্রাচীন ও নতুন প্রস্তর যুগের নানা রকম পাথরের বর্শা-ছুরি-বাটাল-কুঠার-হাতুরী ও বাসন পত্র। তাম্রযুগ, ব্রোঞ্জযুগ ও লৌহযুগের নানা অস্ত্র, শস্ত্র ও কৃষিযন্ত্রপাতি এবং বাসন-পত্র। এছাড়াও আবিষ্কৃত হয়েছে বিভিন্ন মূর্তি ও গুহা-চিত্র। এসবের বিবরণ নৃতত্ত্বের সঙ্গে মিলিয়ে মানুষের আবির্ভাব ও ক্রম বিকাশের ধারা জানা গেছে।

দুইশ বছর আগেও মানুষের আবির্ভাব সম্পর্কে ধর্মীয় গুরু ও পুরোহিতরা নানা ধরনের কল্পিত কাহিনী প্রচার করেছেন।

১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী বিজ্ঞানী লামার্ক প্রথম প্রচার করেন যে প্রাণী জগতে ক্রমবিবর্তনের মূলে রয়েছে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ব্যবহার এবং পরিবেশের প্রভাব। ক্রমাগত

ব্যবহারের ফলে বিশেষ অঙ্গটি বদলে গিয়ে নতুন বৈশিষ্ট্য লাভ করে । এই মতবাদ বিজ্ঞানী মহলে ভীষন আলোড়ন সৃষ্টি করে।

এর পরেই ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ বিজ্ঞানী চার্লস ডারউইন বিবর্তনবাদের মতবাদটি প্রচার করেন। দীর্ঘ আটাশ বছর ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে নদী ও সমুদ্রতীরে, পাহাড়ে, হ্রদে ও মরুভূমিতে ঘরে ঘুরে কঠোর পরিশ্রম করে অসংখ্য কীট পতঙ্গ প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবন চক্র পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করে প্রাণী ও উদ্ভিদের বিবর্তনের ইতিহাস আবিষ্কার করেছেন ডারউইন।

সারা বিশ্বজুড়ে বিজ্ঞানী মহলে বহু বির্তক ও বিশ্লেষনের পর কিছু সংশোধন ও সংযোজনের মাধমে ডার উইনের বিবর্তনবাদ স্বীকৃতি লাভ করেছে। প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতে হাজার হাজার বছর ধরে ক্রম বিবর্তনের ফলে নতুন বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন প্রাণী ও উদ্ভিদের আবির্ভাব ঘটে । এটাই বিবর্ত্তনবাদের মূল কথা। বিভিন্ন গবেষণায় বিভিন্ন যুগের মানুষের মধ্যে মানসিক ও শারীরিক গঠনের পরিবর্তন ধরা পড়েছে।

এ পর্যন্ত মানুষ ৯২ টি মৌলিক পদার্থ আবিষ্কার করেছে। পৃথিবীর যাবতীয় জিনিষ; প্রাণী ও উদ্ভিদ মৌলিক পদার্থগুলোর বিভিন্ন মিশ্রণের ফলে সৃষ্টি হয়। কোন কিছুই অলৌকিক নয়। জীবদেহের সূক্ষ্মতম অংশ হল জীবকোষ। অণুবীক্ষন যন্ত্রের সাহায্যে স্বচক্ষে তা দেখা যায়। প্রতিটি প্রাণী ও মানুষের দেহ অসংখ্য জীবকোষ দিয়ে তৈরী।




ছয় কোটি বছর আগে পৃথিবীর প্রাণীদের রক্ত ছিল ঠান্ডা। প্রচন্ড ঠান্ডায় জমে গিয়ে এরা মারা পড়ত । বিশাল আকারের ডাইনোসরেরাও এভাবে বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

তারপর এল গরম রক্তের প্রাণীরা। শীত ও গরম উভয় রকম আবহাওয়ায় এরা টিকে থাকতে পারে। এরা ডিম পাড়ার বদলে সরাসরি বাচ্চার জন্ম দেয়। এর আগে সব প্রাণীরা ডিম পাড়তো। **শুরু হল স্তন্যপায়ীদের যুগ**। বাঘ-সিংহ-হাতি-গরু-মহিষ-ছাগল-ভেড়া-কুকুর-বানর প্রভৃতি প্রাণীরা জন্ম নিল এ যুগে । মানুষেরও আবির্ভাব ঘটেছে এই যুগে। এই সময় মানুষের মুখ এবং গেরিলা-ওরাং-ওটাং শিম্পাঞ্জী ও গিবনের মুখ একরকম ছিল। মানুষ যতই সভ্য হয়েছে ততই দেহের-মুখ-মস্তিষ্ক-হাত ও পায়ের গঠন বদলে গেছে।

মস্তিষ্কের নির্দেশেই হাত ও পায়ের কাজ চলে। হাতের সঙ্গে ভাষারও সম্পর্ক রয়েছে। শব্দের সাহায্যে মনের ভাব প্রকাশ করতে হয়। মনের চিন্তা থেকেই অর্থ বোধক শব্দ তৈরী হয়। হাতের সাহায্যে অঙ্গভঙ্গীর দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করা যায়। চিন্তা ছাড়া ভাষা তৈরী হতে পারেনা। হাতিয়ার এবং ভাষা মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। প্রত্যেক

সমাজের আলাদা আলাদা ভাষা। সমাজ ছাড়া ভাষা সৃষ্টি হতে পারেনা। কোন মানব শিশু ভাষা নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে না। সমাজের কাছ থেকেই শিশুর ভাষা শিক্ষা শুরু হয়। শব্দের যে অর্থ শিশুকে শেখান হয় শিশু তাই শিখে। মুখের ভাষাকে সাংকেতিক চিহ্নের সাহায্যে লিখিত ভাষায় প্রকাশ করে মানুষের হাত। মস্তিষ্ক, হাত ও ভষা এই তিনটিই হল সভ্যতার মূল ভিত্তি।

মানুষ ছাড়া অন্য সব প্রাণীরা প্রকৃতি থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে। কিন্তু মানুষ প্রকৃতির নিয়মগুলো আয়ত্ত করে নিয়ে নিজেদের প্রয়োজন মত খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপাদন করে। মানুষের এই সৃষ্টির ক্ষমতাই মানুষকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীবে পরিণত করেছে। মানুষের সমাজ ও সভ্যতা পৃথিবীর চেহারাটা সম্পূর্ণ পাল্টে দিচ্ছে।

এত কাল ধরে ইউরোপের পন্ডিতেরা বিশ্বাস করতেন প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সভ্যতা থেকে মানব সভ্যতার শুরু হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর অসংখ্য আবিষ্কারের দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে প্রাচীন সভ্যতার জন্ম হয়েছিল ভারত-চীন-মিশর ও মেসোপটেমিয়ায়। গ্রীক সভ্যতার সূত্রপাত হয়েছে অনেক পরে।

মিশরেব নীল নদীর তীরে এবং ইরানের পশ্চিম অঞ্চলে প্রাচীন সভ্যতার আদিম স্তর থেকে পব পর বিভিন্ন স্তরের ধারাবাহিক ইতিহাসের নিদর্শণ গুলো আবিষ্কৃত হয়েছে। নীল নদীর প্রবল বন্যায় বার বার ধ্বংস হয়েছে একেকটি স্তর। আবার নতুন করে গড়ে উঠেছে নতুন সভ্যতার স্তর। সব শেষে পিরামিডেব উন্নত সভ্যতার স্তর পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে। তিন হাজার বছর আগে কয়েকটি বর্বর উপজাতি গোষ্ঠীর আক্রমণে ধ্বংস হয়েছিল মিশরের সভ্যতা। বর্তমান মিশরের সঙ্গে প্রাচীন সভ্যতার কোন যোগসূত্র নেই।

ভারত ও চীনের সভ্যতার প্রামাণ্য নিদর্শনগুলোও আবিষ্কৃত হয়েছে বিংশ শতাব্দীতে। চীনের ইতিহাস অনেকটাই স্পষ্ট হয়েছে। কিন্তু সিন্ধু সভ্যতার লিপিগুলোর পা ঠোদ্ধার না হওয়ায় এখনো পর্যন্ত সঠিক ইতহিাস বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়নি। খুব শীঘ্রই তা সম্ভব হবে আশা করা যায়।

আমেরিকান ভাষা বিজ্ঞানী মর্গান ১৫০ টি ভাষা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে প্রাচীন কালের গোষ্ঠী জীবনের জ্ঞাতি সম্পর্কের শব্দ গুলোর মধ্যে অনেক মিল আছে। আমেরিকান আদিবাসী সমাজে প্রচলিত বহু শব্দের সঙ্গে দক্ষিন ভারতের তেলেগুভাষার বহু শব্দের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। আদিম সমাজে সব পুরুষই বাবা এবং সব মেয়েরাই ছিল মা। দাদা-দিদি-কাকা-কাকি-মামা-জ্যেঠা-মাসী-মামী পিসী ইত্যাদি শব্দ ছিল না। জ্ঞাতি সম্পর্কও সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেছে। বদলে গেছে সমাজের রীতি নীতিও।

প্রাচীন সমাজ ছিল মাতৃপ্রধান। উৎপাদন পদ্ধতি এবং জীবন ধারণ পদ্ধতি বদলের

সঙ্গে সঙ্গে পুরুষ প্রধান সমাজের শুরু হয়েছে। বর্শা আবিষ্কারের পর থেকে পশু শিকারে পুরুষের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পশুপালন ও শিশুপালন মেয়েদের প্রধান কাজ হয়ে উঠেছে।

স্থায়ী বসতি গড়ে উঠার পর সম্পত্তির উত্তরা ধিকার প্রশ্নের সমাধানের জন্য বিবাহ প্রথা চালু হয়েছে । তাছাড়া পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীরই যৌন মিলনের একটা নির্দিষ্ট ঋতু আছে। কিন্তু মানুষের বেলায় সব ঋতুতেই একজন যৌনসঙ্গী জরুরী হয়েছে। ফলে পরিবার প্রথার উদ্ভব ঘটেছে।

ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলে খাসিয়াদের মধ্যে এখনো মাতৃপ্রধান সমাজের অস্তিত্ব রয়েছে। আমেরিকান আদিবাসী সমাজেও মাতৃ প্রাধান্য রয়েছে। আধুনিক সভ্যতার প্রভাবে সবই বদলে যাচ্ছে ।

## মহাজাতি - উপজাতি ও জাতিগঠন প্রক্রিয়া

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত ইউরোপ ও আমেরিকার বিশেষজ্ঞরা মানুষের শরীরের বর্ণ অনুযায়ী মানব জাতিকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করেন। শ্বেতবর্ণ, পীতবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ। এই তিনরকম বর্ণের মানুষদের গুণাবলী ও মেধাশক্তি পৃথক বলে প্রচার করেন।

এই মতবাদের প্রভাবে ইউরোপ ও আমেরিকার সভ্য সমাজে বর্ণবৈষম্য বাদের জন্ম হয়। শ্বেত বর্ণের লোকেরা সর্বশ্রেষ্ঠ গুণের অধিকারী বলে দাবী করা হয়। পীতবর্ণের লোকেরা মধ্যম শ্রেণীর বলে ঘোষণা করা হয়। এই মত অনুযায়ী আদিম মানব গোষ্ঠী গুলোর বিকাশের আর কোন সম্ভাবনা নেই বলে প্রচার করা হয়।

রুশ বিপ্লবের পর সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা বর্ণবৈষম্যবাদকে সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক ধারণা বলে ঘোষণা করেন। প্রামাণ্য তথ্য দিয়ে তারা ঘোষণা করেন যে, যে কোন বর্ণের মানুষই আধুনিক শিক্ষা ও বিজ্ঞান চর্চার দ্বারা উন্নত সভ্যতার অধিকারী হতে পারে।

রুশ বিপ্লবের সময় দেশের ১৪৫ টি ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে ৪০ টি গোষ্ঠীর লিখিত ভাষা ছিল না। দশ বছরের মধ্যে লেনিনের নির্দেশে প্রত্যেকটি গোষ্ঠীর লিখিত ভাষার লিপি নির্ধারণ করে মাতৃ ভাষায় শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। পরবর্তী বিশ বছরের মধ্যে এই সব পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠী থেকে ডাক্তার- ইঞ্জিনিয়ার - অধ্যাপক- গবেষক- গায়ক - শিল্পী- লেখক সৃষ্টি হতে থাকে।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে পৃথিবীর সব দেশ স্বাধীন হবার পর প্রতিটি জাতির মধ্য থেকে বিশ্ব বিখ্যাত রাজনীতিবিদ, বিজ্ঞানী ও গবেষকদের আবির্ভাব ঘটেছে। তাদের

অনেকেই বর্তমানে ইউরোপ ও আমেরিকার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের কৃষ্ণবর্ণ ও পীতবর্ণের বিজ্ঞানী ও গবেষকরা সরে এলে ইউরোপ ও আমেরিকার অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়বে। তাই ঐসব দেশে বিদেশী বিতাড়নের দাবী কঠোর হাতে দমন করা হয়। ব্রিটেন এবং আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলে বর্তমানে এশিয়া ও আফ্রিকার বিদেশীরাই সংখ্যা গরিষ্ঠ হয়ে গেছে। অনেকেই দেশের নাগরিকত্ব লাভ করেছে। বিদেশী বিতাড়ণের ফ্যাসিষ্ট দাবীকে কঠোর ভাবে দমন করা হচ্ছে ।

দুই জার্মান দেশ এক হবার পর ফ্যাসিষ্টরা পূর্ব জার্মানীর লোকদের বিদেশী আখ্যা দিয়ে দাঙ্গা বাঁধিয়েছিল। সেখানেও কঠোরভাবে ফ্যাসিষ্ট গোষ্ঠীগুলোকে দমন করা হয়েছে।

বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে সারা বিশ্ব ব্যাপী আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটিয়েছে সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা। রাষ্ট্রসংঘের মাধ্যমে বহু সম্মেলন ও সেমিনার করে সব দেশের বিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞদের মধ্যে বিতর্কের আয়োজন করা হয়েছে। **তার ফলে মস্কোতে অনুষ্ঠিত ১৯৬৪ সালের আগষ্ট মাসে ইউনেস্কোর উদ্যোগে আয়োজিত বিজ্ঞানীদের বিশ্ব সম্মেলন থেকে ঘোষণা করা হয়।**

১) পৃথিবীর সব মানুষই হোমোসেপিয়ান নামক একটি মাত্র প্রজাতি থেকে উদ্ভূত হয়েছে।

২) ভৌগোলিক এবং পরিবেশগত পার্থক্যের জন্যই বিভিন্ন অঞ্চলে জনগোষ্ঠীর মধ্যে বর্ণগত পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে।

৩) শুদ্ধ বংশগতির মানব গোষ্ঠীর ধারণা অলীক কল্পনা মাত্র। যাযাবর বন্য জীবনে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে মানুষের মধ্যে অবাধ মিশ্রণ ঘটেছে।

৪) সারা বিশ্বে আঞ্চলিক পরিবেশের পার্থক্যের জন্য লক্ষ লক্ষ বছরের নানা বিবর্তনের ফলে তিনটি মহাজাতির উদ্ভব ঘটেছিল। পরবর্তী সময়ে কৃষি সভ্যতার আবির্ভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে স্থায়ী বসতি গড়ে উঠতে থাকে ।

৫) ঐতিহাসিক যুগে স্থায়ী সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠার পর সম্পত্তির উত্তরাধিকার প্রশ্নে বিবাহ প্রথা, পরিবার ও বংশ ধারা সৃষ্টি হয়েছে।

৬) সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভৌগোলিক ও সামাজিক প্রতিবন্ধকতা ভেঙ্গে সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে বিবাহ প্রথা প্রসারিত হয়। বংশগত গুণের দ্বারা সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য প্রভাবিত হয়না। ব্যক্তিগত গুণ অর্জিত হয় শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার বিনিময়ে।

৭) বর্তমান কালের যে কোন মানুষই উপযুক্ত শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক বিকাশের মাধ্যমে উন্নত মানসিকতার অধিকারী হয়ে উঠে ।

**পরবর্তী সময়ে ১৯৬৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইউনেস্কোর উদ্যোগে প্যারিসে অনুষ্ঠিত বিশ্ব সম্মেলন থেকে ঘোষণা করা হয়।**

১) বর্ণ ও জাতি বৈষম্যবাদ মানব প্রগতির পথে মস্তবড় প্রতিবন্ধক । এই দৃষ্টিভঙ্গী

জাতিতে জাতিতে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে এবং বৈরী মনোভাবের জন্ম দেয়।

২) মানব ইতিহাসে বর্ণ ও জাতি বৈষম্যবাদের উদ্ভব ঘটেছে আমেরিকান রেড ইন্ডিয়ান ও আফ্রিকান নিগ্রোদের ক্রীতদাস হিসেবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে একটা যুক্তি হিসেবে। ইহুদী জাতির প্রতি বিদ্বেষ ও এই তত্ত্ব প্রচারের অন্যতম একটি কারণ।

৩) বিংশ শতাব্দীর পৃথিবীতে আদিম ও অনুন্নত জাতি গুলো স্বাধীনতা লাভ করে সমান অধিকারের ভিত্তিতে রাষ্ট্র সংঘের সদস্যপদ লাভ করেছে। আইনত বর্ণবৈষম্যবাদ নিষিদ্ধ হলেও কার্যত নানা ভাবে এই মানসিকতা টিকে আছে।

৪) আধুনিক স্বাধীন রাষ্ট্রগুলোতে নতুন করে জাতি সমস্যা সৃষ্টির পেছনে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণ রয়েছে। তাছাড়া জাতি সংক্রান্ত কুসংস্কার এবং অবৈজ্ঞানিক ধারণা থেকে ও এই সমস্যার উদ্ভব ঘটছে।

৫) ঐতিহাসিক কারণে যে সব মানব গোষ্ঠী শিক্ষা সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের নিম্নস্তরে আবদ্ধ রয়েছে, তাদের সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের জন্য দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা খুবই জরুরী।

৬) সমান অধিকারের নীতিই জাতি বৈষম্য দূর করার শ্রেষ্ঠ উপায়।

৭) রাষ্ট্র সংঘের উদ্যোগে আয়োজিত সম্মেলনগুলোতে গৃহীত নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গী মানবিক অধিকারের মর্যাদা পেলেও জাতি বৈষম্যবাদ বহুদেশে এখনো নির্মূল হয়নি। এর জন্য উপযুক্ত শিক্ষা ও সরকারী প্রচার ব্যবস্থা জোরদার করা দরকার।

জাতিসমস্যা নিয়ে সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা চালিয়েছিলেন। কারণ সোভিয়েত দেশ ছিল বহু জাতির দেশ। আদিম যুগের মানবগোষ্ঠীরা যেমন ছিল, তেমনি প্রাচীণ ও মধ্যযুগের মানব গোষ্ঠীরাও বিশাল সোভিয়েত দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিল। অন্য দিকে ইউরোপের আধুনিক জাতিগোষ্ঠীর মানুষেরা ছিল ইউরোপীয় অঞ্চলে। জারের আমলে এই সমস্যা বহু বিদ্রোহের কারণ হয়ে উঠেছিল।

বিংশ শতাব্দীর আবিষ্কৃত বহু নিদর্শন সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের গবেষণাকে অনেকটা সহজ করে দিয়েছিল। ইউরোপ এবং আমেরিকায়ও শুরু হয়েছিল নিরপেক্ষ গবেষণা এবং প্রকৃত সত্য আবিষ্কারের চেষ্টা।

**সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের গবেষণালব্ধ যে সব সিদ্ধান্ত বিশ্বের সব বিজ্ঞানীদের স্বীকৃতি পেয়েছে সেগুলো আলোচনা করলেই জাতি সমস্যা সম্পর্কে একটা নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে উঠতে পারে। সেগুলি হল ঃ-**

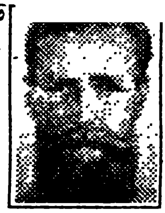
**১) পৃথিবীরর আদিমতম বন্য মানুষেরা ছিল বানর ও আধুনিক মানুষের মধ্যবর্তী নরাকার প্রাণী। এরাই ছিল সব মানুষের পূর্ব পুরুষ। বিশ্বের বিস্তৃত উষ্ণমন্ডলে এদের আর্বিভাব ঘটেছিল।**

২) বহু লক্ষ বছর ধরে যাযাবর মানুষেরা পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে অবাধে বিচরণ করেছে। বিভিন্ন অঞ্চলে দীর্ঘকাল অবস্থানের সময় প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাবে পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে।

৩) যাযাবর জীবনে অবিরাম মিশ্রণ প্রক্রিয়া চলেছে। পৃথিবীর সব মানুষের রক্তে মিশ্রনের প্রমাণ পাওয়া গেছে । আমেরিকায় রেড ইন্ডিয়ান - নিগ্রো এবং ইউরোপীয়ান রক্তের মিশ্রণ এখনো ঘটে চলেছেঋ। এশিয়াবাসীদের রক্তেরও মিশ্রণ ঘটছে। ফলে কয়েব শতাব্দী পরে নতুন এক আমেরিকান জাতির আবির্ভাব ঘটবে। সব দেশেই এই মিশ্রণ প্রক্রিয়া চলছে।



৪) সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের মতে প্রায় এক লক্ষ বছর আগে বর্বর যুগের যাযাবর মানুষেরা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে দুটি দলে বিভক্ত হয়ে যায়। একটি দল হিমালয় অতিক্রম করে চীন, তিব্বত, বার্মা থেকে আমেরিকা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। রেড্ইন্ডিয়ানরা এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত। নৃতাত্ত্বিক ভাষায় এদের বলা হয় **মঙ্গোলয়েড মহাজাতি** । দ্বিতীয় দলটি আবার দুভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। একটি অংশ আফ্রিকার উত্তর ভাগ দিয়ে ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। নৃতাত্ত্বিক ভাষায় এদের বলা হয় **ইউরোপিয়েড মহাজাতি**। অন্য অংশটি ভারত - পূর্ব আফ্রিকা - মধ্য এশিয়া ও অষ্ট্রেলিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে । সেযুগে স্থলপথে সব কয়টি মহাদেশে যাতায়াত করা যেতো। শেষের দলটি দুটি বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। পূর্ব আফ্রিকার নিরক্ষীয় অঞ্চলে বসবাসের পঞ্চাশ হাজার বছরের মধ্যে আলাদা বৈশিষ্ট্য দেখা দিয়েছে। এদের বলা হয় **নিগ্রোয়েড** এবং অন্য অংশটি ভারত - শ্রীলংকা - অষ্ট্রেলিয়া ও আন্দামানে আলাদা বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে এদের বলা হয় অষ্ট্রালয়েড। উভয় অংশকে নৃতাত্ত্বিক ভাষায় বলা হয় নিগ্রোয়েড অষ্ট্রালয়েড মহাজাতি ।





হাজার হাজার বছর ধরে বিভিন্ন অঞ্চলে মিশ্রণ প্রক্রিয়ার ফলে নতুন নতুন জাতির উদ্ভব ঘটেছে। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে, উত্তর আফ্রিকায়, দক্ষিণ ভারতে এবং সিংহলে নিগ্রোয়েড ও ইউরোপিয়েড মহাজাতির মিশ্রণের বহু প্রমাণ আবিষ্কৃত হয়েছে।

ত্রিশ হাজার বছর ধরে নানা বিবর্তনের ফলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপজাতি গোষ্ঠী গুলোর উদ্ভব ঘটেছে। বেরিং প্রণালীর জমাট বরফের উপর দিয়ে মঙ্গোলয়েড গোষ্ঠীর উপজাতিরা আমেরিকায় পদার্পণ করেছিল। বরফ গলে যাবার পর আমেরিকা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আমেরিকার একদিকে প্রশান্ত মহাসাগর অন্যদিকে আটলান্টিক মহাসাগর। পরবর্তী

কালে পানামা খাল মহাদেশটিকে উত্তর ও দক্ষিন দুটি মহাদেশে ভাগ করে দেয়।

জাতি এবং জাতিগত পার্থক্য অপরিবর্তণীয় কোন বৈশিষ্ট্য নয়। প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশের প্রভাবে জাতিগত বৈশিষ্ট্য বদলে যায়।

মানব শরীরের বর্ণ চোখ - নাক - মুখমন্ডল - চুল - মাথা ও দেহের আকার সুদীর্ঘকালের আঞ্চলিক প্রভাবের দ্বারা বদলে যায়। একই জাতির মধ্যেও পরিবর্তন ঘটে মিশ্রণ প্রক্রিয়ায়।

মিশ্রণ প্রক্রিয়ার ফলেই আধুনিক রাষ্ট্রীয় জাতিগুলোর উদ্ভব ঘটেছে। সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে যোগাযোগ ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের ফলে মিশ্রণ প্রক্রিয়া দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে।



এক লক্ষ বছর ধরে বিশাল পৃথিবীর বুকে চারটি বৃহৎ অঞ্চল জুড়ে আঞ্চলিক পরিবেশের পার্থক্যের ফলে চারটি মূল ধারায় মানুষ বিভক্ত হয়ে গেছে।

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১) | বিষুব ধারা | = | নিগ্রো - পিগমী - বুশম্যান ইত্যাদি। |
| ২) | দক্ষিণী ধারা | = | পালিনেশীয় - মালয়ী ও অষ্ট্রালয়েড |
| ৩) | পশ্চিমী ধারা | = | ইউরোপিয়েড ভুক্ত ১৬ টি জাতি। |
| ৪) | পূর্ব ধারা | = | মঙ্গোলয়েড গোষ্ঠীর ১৬ টি জাতি। |

কৃষি সভ্যতার যুগে সমতল বাসী ও পাহাড়ী দুইভাগে বিকাশ ঘটেছে। পাহাড়বাসীরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপজাতিতে ভাগ হয়ে গেছে।

বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন, সারা পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫৩ ভাগ হল ইউরোপিয়েড গোষ্ঠীর মানুষ, শতকরা ৩৭ ভাগ হল মঙ্গোলয়েড গোষ্ঠী ভুক্ত মানুষ শতকরা ১০ ভাগ হল নিগ্রোয়েড গোষ্ঠীর মানুষ।

শিল্প বিপ্লবের পর উপনিবেশ স্থাপনের উদ্দেশ্যে ইউরোপিয়েড গোষ্ঠীর লোকেরা বিশ্বের সব কয়টি দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। ফলে নতুন মিশ্র রক্তের মানব গোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটেছে সর্বত্র।

পুরাতন প্রস্তর যুগের যাযাবর মানুষেরা পাঁচ লক্ষ বছরে যে উন্নতি ঘটিয়েছে সেই তুলনায় আধুনিক সভ্য মানুষেরা প্রতিদিন তার বহুগুন বেশী উন্নতি ঘটাচ্ছে। অকল্পনীয় ক্ষমতার অধিকারী হয়েছে আধুনিক মানুষ। ধর্ম-বর্ণ ও জাতির পার্থক্য মুছে দিয়ে এক পৃথিবীর মানব সমাজ গড়ার লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছে আধুনিক সভ্যতা।

ভাষাগত সংকীর্ণতাও দূর হয়ে যাচ্ছে। একই ভাষা ভাষী জনগোষ্ঠী নৃত্তাত্ত্বিক দিক দিয়ে একই জাতির অন্তর্ভুক্ত নয়। আমেরিকায় পৃথিবীর সব জাতির মানুষেরা ইংরেজী ভাষায় কথা বলে। ইউরোপে বা অন্যত্র বহুজাতিক নগর জীবনে বিভিন্ন জাতির মানুষেবা নগরের ভাষায় কথা বলে জাতির ভাষায় নয়। সংস্কৃতিও জাতি ভিত্তিক নয়। জাতি সম্পর্কে নতুন মূল্যায়ন শুরু হয়েছে।

ত্রিপুরায় আধুনিক যুগেব সূত্রপাতের সময থেকে ত্রিপুরী ভাষাকে লিখিত ভাযার রূপ দিয়ে শিক্ষা বিস্তাবের প্রচেষ্টা শুরু হলে রাজ্যের সমস্ত উপজাতীরা রাজার আদেশে একই ভাষায় শিক্ষা গ্রহণে অভ্যস্ত হতে পারতো, তাহলে ত্রিপুরী ভাষাই হতো ত্রিপুরা রাজ্যের ভাষা। ককবরক নামটি হয়তো সৃষ্টি হতোনা। ককবরক ভাষার বর্ণমালা নিয়ে যে বিরোধ দেখা দিয়েছে তাও সৃষ্টি হতো না। একশ বছর আগে রাধামোহন ঠাকুর ককবরক ভাষাকে ত্রিপুরী ভাষা বলেই পবিচয় দিয়েছেন, রাজ্যের সব উপজাতিদের ভাষা হিসাবে নয়। পুরান ত্রিপুরীরা রাজার বংশধর হিসেবে পরিচয় দিয়ে গৌরব বোধ করে। রাধামোহন ঠাকুর তাদের ভাষা বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করেছেন। পুরাতন ও নতুন ত্রিপুরী, জমাতিয়া, নোয়াতিয়া ও রিয়াং সম্প্রদায়ের ভাষাকে ককবরক ভাষী বলা হয়েছে। পরবর্তী কালে ভাষা গবেষকরা অন্যান্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে কিছু কিছু উচ্চারণগত পার্থক্য সত্ত্বেও মগ ও চাকমা ছাড়া সব উপজাতি সম্প্রদায়ের ভাষাকে বড়ো গোষ্ঠীভুক্ত বলে চিহ্নিত করেছেন।

বৈদিক যুগে নানা সংস্কারের মাধ্যমে সংস্কৃত ভাষাব সৃষ্টি হয়েছিল। সারা দেশে আর্য প্রভাব বিস্তার লাভ করার পর সর্বত্র রাজভাষায় সংস্কৃত ভাষার প্রভাব পড়েছে। সপ্তম শতাব্দীতেও আসামের রাজভাষা ছিল সংস্কৃত।

ত্রিপুরায় তেমনি বড়ো ভাষাও নানা সংস্কার ও মিশ্রণের মাধ্যমে আধুনিক ককবরক ভাষার রূপ নিয়েছে।

# প্রাচীন সভ্যতার বিচিত্র কাহিনী

বিংশ শতাব্দীর বহু আবিষ্কার মানব সভ্যতার ইতিহাসকে নতুন করে লিখতে বাধ্য করেছে। প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন গুলো আবিষ্কৃত হয়েছে এই শতাব্দীতে। সুদীর্ঘ তিন বা চার হাজার বছর মাটির নীচে চাপা পড়ে ছিল এসব নিদর্শন।

এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত তথ্যের ভিত্তিতে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হল, বিশ্বের চারটি নদী উপত্যকায় প্রাচীনতম সভ্যতার বিকাশ ঘটে ছিল প্রায় একই সময়ে। পরবর্তী সভ্যতাগুলোব ইতিহাসও তৈরী হয়েছে। আমরা খুব সংক্ষেপে প্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্রগুলো সম্পর্কে খানিকটা আলোকপাত করব। সর্বপ্রাচীন চারটি কেন্দ্র হল ১) ভারত ২) চীন ৩) মিশর ৪) মেসোপটেমিয়া।

# ভারত

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশক পর্যন্ত সকলেরই ধারণা ছিল ভারতীয় সভ্যতা আর্যদের অবদান। ভারতের ইতিহাস সে ভাবেই তৈরী হয়েছিল।

১৯২২ সালে প্রথম বাঙ্গালী প্রত্নতাত্ত্বিক রাখাল দাস বন্দোপাধ্যায় খনন কার্য চালিয়ে সিন্ধুনদীর তীরে প্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্রটি আবিষ্কার করেন। পরে পাঞ্জাবের ইরাবতী নদীর তীরে হরপ্পা নামে আরেকটি সভ্যতার কেন্দ্র আবিষ্কৃত হয়। প্রথম কেন্দ্রটির নাম হলো মহেঞ্জোদারো, স্থানীয় ভাষায় শব্দটির অর্থ হল মৃতের পুরি। এ ছাড়াও আরও চল্লিশটি কেন্দ্রে এই সভ্যতার নির্দশন পাওয়া গেছে।



পাঁচ হাজার বছর আগেব এই মৃত নগরীর নিদর্শন দেখে পৃথিবীর সব বিশেষজ্ঞরাই চমকে গেছেন। পোড়া ইটের তৈরী এমন সুপরিকল্পিত নগর সভ্যতা বিশ্বের আর কোথাও পাওয়া যায়নি। গ্রীক সভ্যতা গড়ে উঠেছে আরও অনেক পরে। নগরের পাকা বাড়ীঘর পাকা রাস্তা, জলনিকাশী ব্যবস্থা, মন্দির, সাধারন মানুষের জন্য বিশাল এলাকাজুড়ে স্নানাগার, শস্য জমা রাখার পাকা গোদাম ইত্যাদি যে কোন আধুনিক শহরের মতো, নানা রকম অলংকার মাটি, পাথর ও তামার তৈরী নানা বাসন পত্র অলংকার ও মূর্তি শি ও কারিগরদের দক্ষতার পরিচয় বহন করে। মিশর ও সুমের সভ্যতার সঙ্গে যোগাযোগ ও বাণিজ্যের বহু নিদর্শন ও শীল মোহর পাওয়া গেছে। সে যুগের লিপি এখনো পর্যন্ত পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। শীঘ্রই লিপির পাঠোদ্ধার হলে সে যুগের ইতিহাস বিস্তৃত ভাবে জানা যাবে।

এখানে তিন ধরনের নরকংকাল পাওয়া গেছে। দ্রাবিড়, আলপাইন ও অস্ট্রালয়েড। একসময় মনে হয়েছিল এটা দ্রাবিড় সভ্যতার অবদান। পরবর্তী অন্যান্য আবিষ্কার থেকে জানা গেছে দ্রাবিড় ও আলপাইন গোষ্ঠীর লোকেরা ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল থেকে এখানে এসে স্থায়ী বসতি গড়ে তুলেছিল। তিনটি মানব গোষ্ঠীর অবদানে এই উন্নত সভ্যতা সৃষ্টি হয়েছিল। অন্ততপক্ষে সাত হাজার বছর আগে এই সভ্যতার সূত্রপাত হয়েছিল।

বর্তমানে এসব অঞ্চল প্রায় মরুভূমির মত। কিন্তু দুইহাজার বছর আগেও এই অঞ্চল অত্যন্ত উর্বর ছিল এবং কৃষিকাজের উপযুক্ত মনোরম আবহাওয়া ছিল। তার বহু প্রমাণ পাওযা গেছে। সিন্ধু নদীর বালুচড়ে তখন সোনা, রূপা ও তামা পাওয়া যেত। অলংকার

ও তামার তৈরী নানা জিনিষ পত্র বিক্রী করে মিশর ও সুমের অঞ্চল থেকে প্রচুর ধনসম্পদ পেয়ে সিন্দু সভ্যতা দ্রুত উন্নতি লাভ করেছিল। বাংলার তাম্রলিপ্ত বন্দর এই সময় খুব সমৃদ্ধ হয়ে উঠে ছিল। বেলুচিস্তান- পাঞ্জাব-সিন্ধু-গুজরাট-বিহার ও বাংলায় সে যুগের সভ্যতা ছড়িয়ে পড়েছিল।

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে এবং আর্যদের আক্রমণে এই সভ্যতা ধ্বংস হয়েছিল। আর্যদের লিখিত ভাষা ছিলনা। তারা ছিল যাযাবর পশুপালক শ্রেণীর উপজাতি। নগর সভ্যতা পছন্দ করতোনা। বহু পুর অর্থাৎ নগর ধ্বংস করেছিল বলে আর্যদের রাজা ইন্দ্রকে বলা হতো পুরন্দর। বৈদিক সাহিত্যে বহু যুদ্ধের উল্লেখ রয়েছে। আর্যদের ছিল উন্নত লোহার তরোয়াল এবং দ্রুত গামী যুদ্ধের ঘোড়া।

দীর্ঘকাল ধরে দুর্গম পথে যুদ্ধ করতে করতে মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল দখল করে ক্রমে ক্রমে ভারতে এসেছে। মধ্য এশিয়ার প্রাচীন সভ্য জাতিগুলোর কাছ থেকে লোহার তরোয়াল সংগ্রহ করে শক্তিশালী হয়েছিল। তখন ভারতে লোহার তৈরী অস্ত্র তৈরী হতো না। পৃথিবীর সমস্ত যুদ্ধের ইতিহাসে দেখা যায় আক্রমণ কারীরা উন্নত অস্ত্রের সাহায্যে সহজেই যুদ্ধে জয়লাভ করেছে। ভারতে আর্যরা এসেছে উন্নত ঘোড়া ও তরোয়াল নিয়ে। তুর্কী ও পাঠানরা এসেছিল বারুদের কামান ও বর্বর দুঃসাহসী লুন্ঠণকারী বাহিনী নিয়ে। ইংরেজরা এসেছিল উন্নত আগ্নেয়াস্ত্র এবং নৌবহর নিয়ে। সিন্ধু সভ্যতার আধিবাসীরা সহজেই যুদ্ধে হেরে গিয়েছিল। যুদ্ধ বন্দীদের ক্রীতদাস বানিয়ে আর্যরা কৃষিকাজ শিখেছিল এবং গ্রামীণ সভ্যতার জন্ম দিয়েছিল।

## চীন

ভারতের প্রতিবেশী চীন দেশেও প্রাচীন সভ্যতার উদ্ভব ঘটেছিল হোয়াংহু নদীর উপত্যকায়। ভারত ও মিশরের কিছু পরে চীনা সভ্যতার সৃষ্টি হয়েছিল। তবে প্রাচীণ সভ্য দেশ গুলোর মধ্যে চীনা সভ্যতার আয়তন ছিল বেশ বড়। তিনটি প্রধান ভাগে চীনকে ভাগ করা হয়েছে ১) মঙ্গোলিয়াসহ বিস্তীর্ণ তৃণভূমি অঞ্চলের অধিবাসীরা ছিল যাযাবর পশুপালক ২) উত্তর চীনের সমভূমি অঞ্চল ছিল সভ্যতার কেন্দ্র ভূমি. ৩) তৃতীয় অংশটি ছিল ঘন বনাঞ্চল। মরুভূমি ও বরফাচ্ছন্ন অঞ্চল এবং পাহাড় পর্বত। চীনের মোট আয়তনের তিনভাগের দুইভাগ হল এই অঞ্চল।

মধ্য এশিয়ার অনেক গুলি আদিম উপজাতি গোষ্ঠীর লোক চীনে স্থায়ী বসতি স্থাপন করেছিল। ক্রমে সমগ্র চীনে তারা ছড়িয়ে পড়েছিল। ৫৬ টি জনগোষ্ঠীর মিশ্রণে চীনা জাতির উদ্ভব ঘটেছে। হানজাতি ভূক্তরাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। সর্বশেষ রাজবংশ ছিল চীন

রাজবংশ। অসংখ্য উপজাতি গোষ্ঠী চীনের পাহাড়ী অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। চীন রাজবংশের নামানুসারে দেশের নাম হয় চীন।

পৌরাণিক কাহিনী এবং লৌকিক উপকথা ছাড়া চীনেব প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায়না। ইংরেজ প্রত্নতাত্ত্বিক অ্যান্ডারসন ব্যাপক গবেষণা চালিয়ে ৭৫ বছর আগে মাটির তলা থেকে প্রাচীন সভ্যতার বহু নিদর্শণ আবিষ্কার করেন। বহু মাটির পাত্র এবং পাথরের হাতিয়ার পাওয়া গেছে। পাওযা গেছে অনেক নরমুন্ড ও কংকাল।

চারহাজার বছর আগে চীন ঐক্যবদ্ধ ছিল না। ১৪০ টি রাজ্যে অসংখ্য গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল। শিয়া গোষ্ঠী প্রথমে শক্তিশালী হয়ে দাসপ্রথা চালু করে। শিযা রাজবংশ ৫০০ বছব রাজত্ব করে। তারপর শান্ রাজবংশ ক্ষমতা দখল করে। এই সময় মধ্য প্রাচ্য থেকে গমের বীজ সংগ্রহ করে গমের চাষ শুরু হয়। ধাতুর ব্যবহারও এই সময় শুরু হয়। চীনারা ছিল প্রধানত কৃষিজীবী। ৪৫০ বছর শান্ বংশের রাজত্বের পর চু রাজবংশেব প্রতিষ্ঠা হয়। এরাও ৯০০ বছর রাজত্ব করে। এই বংশের শেষ রাজা নিহত হবার পব ৪০০ বছর ধরে বিভিন্ন সামন্ত প্রভুদের শাসন চলতে থাকে । এই সময় হান বংশও পূর্ব-পশ্চিমে রাজত্ব কবেছিল।

২২১ খৃষ্ট পূর্বাব্দে চীন রাজবংশ ক্ষমতা দখল করে সমগ্র চীনকে ঐক্যবদ্ধ করে। এদের সময় দেশের নাম হয় চীন। এই বংশের রাজত্বকালে চীনে লোহার ব্যবহার শুরু হয় এবং সব দিক থেকে উন্নত এক সভ্যতা গড়ে উঠে। শান্ বংশের রাজারা বিতাড়িত হয়ে কোরিয়াতে নতুন রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। অতিপ্রাচীনকাল থেকেই চীন দেশে ছবি এঁকে ও সাংকেতিক চিহ্নের সাহায্যে লিখন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়। কিন্তু স্বরধ্বনি ভিত্তিক লিপিমালা চীনে তৈরী হয়নি। ছবি এঁকে সব কথা বুঝান যায় না। তাই সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করতে হয়। এতে বহু সংখ্যক চিহ্ন ব্যবহার হয়।

প্রাচীন সভ্যতার অন্য দেশ গুলিতেও চিত্রলিপি ব্যবহাব করা শুরু হয়েছিল পাঁচ হাজার বছর আগে। চীন এবং সুমের সভ্যতা চিত্র লিপির পরবর্তী ধ্বনিলিপি আবিষ্কার করতে পারেনি। ধ্বনি থেকেই বর্ণমালা সৃষ্টি হয়েছে। আধুনিক পৃথিবীর আধিকাংশ ভাষাই ধ্বনিমালা ব্যবহার করে। মাত্র দেড় হাজার বছর আগে বর্ণমালা সৃষ্টি হয়েছে। সিরিয়া ও প্যালেস্টাইন, মিশর এবং মেসোপটেমিয়ার প্রভাবে বর্ণমালা আবিষ্কার করেছিল। গ্রীকদের বর্ণমালাও তাদের অনুসরণ করেই তৈরী হয়েছিল। ভারতীয় ব্রাহ্মী লিপির উদ্ভবও ঐ বর্ণমালা থেকেই হয়েছে। ব্রাহ্মী লিপি থেকেই বাংলা লিপিরও উদ্ভব হয়েছে। চীনারা এখনো চিত্র লিপি ব্যবহার করছে। লিখতে তিন শতাধিক চিহ্ন ব্যবহার করা হচ্ছে।

দুহাজার বছর আগে চীনে হুণ বংশের রাজত্বকালে পরীক্ষার মাধ্যমে রাজকর্মচারী নিয়োগের প্রথা চালু হয়। পৃথিবীতে প্রথম এই নিরপেক্ষ কর্মচারী নিয়োগ প্রথা প্রচলিত

হয়েছিল। তাদের রাজত্বকালেই কাঠ খোদাই করে ছাপার কাজ শুরু হয়। চীনের রাজারা পুরোহিত পন্থী ছিল না। যুক্তিবাদের পথ ধরেই তারা এগিয়েছে। চীনের প্রসিদ্ধ চিন্তাবিদ ও দার্শনিক কনফুসিয়াসের মতবাদ এবং বৌদ্ধ ধর্মের উদার মানবিকতাবোধ চীনাদের মধ্যে যুক্তিবাদী মানসিকতার জন্ম দিয়েছিল। চীনের সংস্কৃতিও এই ধারায় প্রাচীণ কাল থেকেই বিকশিত হয়েছিল।

বারবার কৃষক বিদ্রোহের ফলে কয়েকটি রাজবংশের উত্থান পতন ঘটে। শেষ পর্যন্ত ১৯১১ সালের গণতান্ত্রিক বিপ্লবে চীন-রাজবংশের অবসান ঘটে।

চীনের নানা পৌরাণিক উপাখ্যানে বন্য আদিম জীবন থেকে বিভিন্ন রাজবংশের একটা ধারাবাহিক ইতিহাস জানা যায়। তবে পৌরাণিক কাহিনীর সঙ্গে ইতিহাসের প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান খুব বেশী আবিষ্কৃত হয়নি। চারহাজার বছর আগের ইতিহাসটাকে পৌরাণিক কাল ধরা হয় এর পরবর্তী কালের ইতিহাস সম্পর্কে বহু নিদর্শণ আবিষ্কৃত হয়েছে। চীনে শক্তিশালী সম্রাটের শাসন থাকার ফলে মুসলমান্ বা খ্রীষ্টানরা চীনে আক্রমণ করার সাহস পায়নি। পূর্ব এশিয়া থেকে প্রশান্ত সাগরের তীরবর্তী অঞ্চল সহ প্রাচীণ আমেরিকার বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে পীতবর্ণের মঙ্গোলয়েড মানব গোষ্ঠীর উন্নত সভ্যতার রূপ হল চীন, কোরিয়া, জাপান ।এরাও মিশ্রিত মানব গোষ্ঠী।

## মিশর

মিশরকে বলা হয় নীল নদের দান। আফ্রিকা মহাদেশের উত্তর পূর্বে সাহারা মরুভূমির গা ঘেষে একফালি লম্বা ছোট্ট দেশ হল মিশর। নীল নদীর প্রবল প্লাবনে প্রতিবছর একবার নির্দিষ্ট সময়ে ডুবে যেত দেশ-টা। একমাস থাকতো জলের তলায়। জল সরে গেলে প্রচন্ড উর্বর মাটিতে একবার কৃষিকাজ করেই বিপুল পরিমাণ ফসল পাওয়া যেত। দেশটির দুদিকে মরুভূমি, দুদিকে সমুদ্র, আবহাওয়া রুক্ষ।

উর্বর কৃষি ক্ষেত্রের জন্যই আদিম মানুষের কয়েকটা বড় দল এখানে বসতি স্থাপন করেছিল। নদীপথে নৌকায় চড়ে শিকার করতে দক্ষ হয়ে উঠেছিল অধিবাসীরা। বন্যা এলাকা থেকে দূরে মরুভূমির গা ঘেষে মাটির ঘর তৈরী করে স্থায়ী বসতি গড়ে তুলেছিল। চাষের জন্য অসংখ্য ছোট ছোট খাল কেটে জল সেচের ব্যবস্থা করা হতো। বিশেষ পরিস্থিতির জন্য সব মানুষ একজোট হয়ে কাজ করতে বাধ্য হতো।

পাঁচ হাজার বছর আগে একজন সাহসী ও বুদ্ধিমান কৃষকের উদ্যোগে বন্যার কবল থেকে মিশরবাসীকে রক্ষা করা ও জমিকে কৃষিযোগ্য রাখার জন্য বাঁধ নির্মাণ করে **পৃথিবীর প্রথম জলসেচ ব্যবস্থা তৈরী হয়।** এই কৃষক নেতা মেনেস হলেন মিশরের

প্রথম রাজা। এই সময় থেকে মিশরের ঐতিহাসিক যুগ শুরু হয়েছে। তখন থেকে ৩১ টি রাজ বংশ মিশর শাসন করেছে। অতি উন্নত সভ্যতার জন্ম দিয়েছিল মিশর। সমুদ্র পথে ব্যবসা বাণিজ্য এবং অসংখ্য যুদ্ধের মাধ্যমে বিপুল সম্পদের অধিকারী হয়েছিল রাজারা। বহুদেশ আক্রমণ করে ধন সম্পদ লুন্ঠন ও ক্রীতদাস সংগ্রহ করত রাজারা। নানা কাজের জন্য শত শত কারিগর বন্দী করে আনা হতো। বিপুল বিলাসিতায় জীবন যাপন করতো মিশরের রাজারা।

তিন হাজার বছর আগে মিশরের সভ্যতা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল । আধুনিক পৃথিবীর মানুষের কাছে অজ্ঞাত ছিল এই সভ্যতা ।

বিংশ শতাব্দীর প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষকরা খনন কার্য চালিয়ে মরুভূমির ধূলার স্তুপের তলা থেকে আবিষ্কার করেছেন রাজাদের ৮০ টি সমাধি ক্ষেত্র। বড় বড় পাথরের তৈরী এসব সমাধিকে বলা হয় পিরামিড। বিশাল বিশাল পাথরের তৈরী সমাধি প্রাসাদের উপর তৈরী হতো অনেক উঁচু পাথরের সৌধ। এসব আবিষ্কারের পর পাথরের গায়ে শিল্প কার্যের ধরন ও জীবন ধারনের নানা উপকরণ দেখে জানা গেছে তারা কত উন্নত হয়েছিল। সাধারণ মানুষের মাটির তৈরী ঘর - বাড়ী মাটির সঙ্গে মিশে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কিন্তু রাজাদের সমাধিগুলো অক্ষত অবস্থায় রয়েছে। উপরের দিকে ধ্বংস হয়েছে অনেক সৌধ।

মিশরের মানুষ মূর্তি পূজা করতো। তারা বিশ্বাস করতো মৃত্যুর পরেও আরেক জীবন থাকে। তাই রাজার মৃত্যুর পর রাজপ্রাসাদের যাবতীয় সুযোগ সুবিধাসহ সমাধি প্রাসাদ তৈরী করা হতো। মৃত রাজার সঙ্গে সমস্ত রক্ষী ও দাস দাসীদের জীবন্ত সমাধি দেওয়া হতো, যাতে রাজার কোন কষ্ট না হয়। বিপুল পরিমাণ ধনরত্ন ও খাদ্য সমাধিতে রাখা হতো । এসব মূল্যবান ধনরত্ন ডাকাতি হতো বলে পরবর্তি সময়ে সমাধির উপর অনেক উঁচু পাথরের সৌধ তৈরী করা হতো। এগুলিকেই বলা হতো **পিরামিড**।

১৯২২ সালে মিশরের সবচেয়ে বড় পিরামিডটি আবিষ্কৃত হয়েছে। তের একর জমির উপর ৪৮১ ফুট উঁচু এবং ৭৫৫ ফুট লম্বা এই পিরামিড তৈরী করতে এক লক্ষ ক্রীতদাসের বিশ বছর ধরে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছিল। রাজারা নিজেরাই নিজেদের পছন্দমত সমাধি সৌধ জীবিত অবস্থায় তৈরী করাতেন। মিশরে কোন পাথরের পাহাড় ছিল না। দূর দুরান্ত থেকে হাজার হাজার ক্রীতদাস পাথর বয়ে নিয়ে আসতে বাধ্য হতো। পাথর বহন করতে গিয়ে অনেকেই মারা যেত । ক্রীতদাস সংগ্রহের জন্যই ঘন ঘন যুদ্ধ করতে হতো। সবচেয়ে বড় পিরামিডটি তৈরী করতে তেইশ লক্ষ বড় বড় পাথরের টুকরো বহন করে এনেছিল ১২ মাইল দূরের পাহাড় থেকে।

পিরামিডগুলো আবিষ্কৃত না হলে মিশরের ইতিহাস জানা যেতো না। পাঁচ হাজার

বছর আগে লিখিত ভাষায় নানা কাহিনী লিখিত থাকায় মিশরের ইতিহাস জানা গেছে।

বর্তমান মিশরের সঙ্গে প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার কোন সম্পর্ক নেই। তিন হাজার বছর আগে মিশরের প্রাচীন সভ্যতা ধ্বংস হয়েছে। ভিন্ন ভিন্ন উপজাতি গোষ্ঠী নতুন বসতি গড়ে তুলেছে। পরবর্তী সময়ে গ্রীক ও তুর্কীরা এখানে শাসন করেছে বহুকাল ধরে। আধুনিক মিশর মিশ্র জনগোষ্ঠীর স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিনত হয়েছে ।

## মেসোপটেমিয়া

টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর তীরে ছোট্ট একটি দেশে প্রাচীন যুগে একটি সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। গ্রীকরা এর নাম দিয়েছিল মেসোপটেমিয়া। দেশটির আধুনিক নাম হলো ইরাক ।

আরো আগে এখানে অসীরিয়া এবং ব্যাবিলোনিয়া নামে ছোট্ট দুটি সভ্যতার উদ্ভব ঘটেছিল। এদের উত্তর অংশকে বলা হতো আককাদ এবং দক্ষিণ অংশকে বলা হতো সুমের। পারস্য উপসাগরের তলা থেকে একসময় ভেসে উঠে ছিল এই অঞ্চলটি । দুটি নদীর পলিমাটি জমে তৈরী হয়েছিল বলে অঞ্চলটি ছিল সমভূমি এবং খুবই উর্বর।

কৃষিকাজ এবং পাথরের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে জানে এমন কয়েকটি মানব গোষ্ঠী এখানে স্থায়ী বসতি স্থাপন করেছিল। দূরের পাহাড় থেকে পাথর সংগ্রহ করে নিজেরাই তৈরী করত কৃষি যন্ত্রপাতি । ধীরে ধীরে এখানে গড়ে উঠেছিল নগর সভ্যতা। মন্দির,মূর্তি গোলাঘর, অস্ত্রাগার এবং বহু লিখিত দলিল আবিষ্কৃত হয়েছে এখানে। সে-যুগে পাথরের উপর খোদাই করে এবং তামার উপর খোদাই করে লিখিত হত দলিলপত্র। এগুলি সহজে নষ্ট হতনা। এসব দলিল থেকে জানা যায় জমি জমার মালিক ছিল নগরের দেবতা। ক্রমে পুরোহিতরা মালিক হয়ে বসেছিল। পুরোহিতরাই পরে রাজা হয়ে গেল। শিলা লিপিতে বহু যুদ্ধের বিবরণ রয়েছে।

সেমিটিক বংশের রাজা সারগন ছিলেন সে যুগের শ্রেষ্ঠ রাজা। দীর্ঘ যুদ্ধের পর দুর্ধর্ষ অসীরিয় এবং ব্যাববিলন রাজ্য দুটি সন্ধি করে ঐক্যবদ্ধ হয়। এই ব্যাবিলন রাজ্যের শ্রেষ্ঠ **রাজা হামুরাবি মানব সভ্যতার ইতিহাসে প্রথম আইন গ্রন্থ রচনা করে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত করেন। এদের সন্ধি চুক্তিটিও পৃথিবীর প্রথম সন্ধিচুক্তি হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে।** এই রাজবংশকে পরাজিত করে আর্যদের একটি শাখা এখানে রাজত্ব শুরু করে। তাদের প্রধান দেবতা ছিল সূর্য। এরা ৬০০ বছর রাজত্ব করেছিল। এই সভ্যতাও আবিষ্কৃত হয়েছে বিংশ শতাব্দীতে।

## অন্যান্য সভ্যতা

সুমের সভ্যতায় নগর দেবতার ধনসম্পত্তির হিসেব রাখার জন্য লিখিত ভাষার লিপি আবিষ্কৃত হয়েছিল। তেমনি ভূমধ্যসাগরের পূর্বকূল ঘেষে ছোট্ট দেশ ফিনিশীয়রা ব্যবসা বাণিজ্যের প্রয়োজনে ধ্বনিগত বর্ণলিপি আবিষ্কার করেছিল। সাড়ে তিন হাজার বছর আগে মাত্র ২৯ টি বর্ণের সাহায্যে সব কাজ চালাবার মত বর্ণমালা আবিষ্কার একটা বিপ্লব ঘটিয়ে ছিল। আধুনিক পৃথিবীর প্রায় সব কয়টি বর্ণমালা এদের অনুকরণে তৈরী হয়েছে। সমগ্র মানব সমাজ এই ক্ষুদ্র দেশটির কাছে বর্ণমালার জন্যে ঋণী হয়ে রইল।

## প্রথম লোহা আবিষ্কার

চার হাজার বছর আগে এশিয়া মাইনর যার আধুনিক নাম তুরস্ক প্রথম লোহার ব্যবহার শুরু করেছে। এর আগে তামা, সীসা, টিন ও ব্রোঞ্জ বিভিন্ন দেশে প্রচলিত হয়েছিল। লোহার ব্যবহার চালু করে এশিয়া মাইনর অর্থাৎ তুরস্ক বিখ্যাত হয়ে গেল।

লোহার অস্ত্র শস্ত্র হাতে পেয়ে ইন্দো - ইউরোপীয় উপজাতি গোষ্ঠীগুলো বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয়ে এশিয়া ও ইউরোপের নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। তাদের আদি বাসভূমি ছিল উড়াল পর্বতের বিস্তীর্ণ তৃণভূমি অঞ্চলে এবং কৃষ্ণসাগর তীর, ককেশাস ও তুর্কীস্থানে। এরাই আর্য নামে পরিচিত। প্রথমে এশিয়া মাইনর দখল করে দীর্ঘদিন ধরে লোহার অস্ত্র শস্ত্র ব্যবহার করতে শিখে দ্রুতগামী অশ্ব বাহিনী নিয়ে যুদ্ধ করতে করতে স্থায়ী বসতি স্থাপনের লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল।

এই আর্যদের একটি শাখা ভারতে এবং আরেকটি শাখা গ্রীস দেশ হয়ে ইউরোপে স্থায়ী বসতি গড়ে তুলে ছিল।

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে একজন জার্মান প্রত্নতাত্ত্বিক এশিয়া মাইনরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করে তের হাজার লিখিত চাকতির পাঠোদ্ধার করে প্রাচীন এই সভ্যতার ইতিহাস তৈরী করেন।

পন্ডিত জহরলাল নেহেরু বলেছেন-বর্বরতা অতিক্রম করে সভ্যতায় পরিণতি লাভ করাই হল ইতিহাসের শিক্ষা।ক্রমপরিবর্তনের কাহিনীই হল ইতিহাস। পৃথিবীর চারটি কেন্দ্রে সভ্যতার যখন চরম বিকাশ ঘটেছে সমগ্র ইউরোপ তখন ছিল বর্বর অবস্থায়।

এশিয়া থেকে বার বার মানুষের ঢেউ ইউরোপে গিয়ে শাসন করেছে। মানুষে মানুষে মিলনের মধ্য দিয়েই সভ্যতা বিকাশ লাভ করেছে। আর্য, হুণ, আরব, মঙ্গোল ও তুর্কিরা বহু শতাব্দী ইউরোপকে শাসন করেছে। আধুনিক ইউরোপের বহু সভ্য জাতি এইসব শাসকদের বংশধর।

আধুনিক যুগে ইউরোপ উন্নত সভ্যতার অধিকারী হয়ে পৃথিবীর সব মহাদেশে ছড়িয়ে পড়েছে।

প্রাচীন সভ্যতার মাঝামাঝি সময়ে গ্রীক সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল। বিভিন্ন সভ্যতার মিশ্রণে অতি উন্নত হয়েছিল গ্রীক সভ্যতা। বর্বরদের আক্রমণে একসময় এই সভ্যতা ধ্বংস হয়েছিল। গ্রীক পন্ডিতেরা তাদের জ্ঞানের গ্রন্থগুলো সঙ্গে নিয়ে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে আশ্রয় নিয়েছিল। আধুনিক ইউরোপের শিক্ষা সংস্কৃতি গ্রীক পন্ডিতদেরই অবদান। তাদের জ্ঞান ভান্ডারই জন্ম দিয়েছিল জাতিযতাবোধের নব-জাগরন।

গ্রীকরা ছোট ছোট নগর রাষ্ট্র গড়ে তুলেছিল। অভিজাতরা ভোগ করত গণতন্ত্র। ক্রীতদাসরা সৃষ্টি করতো সম্পদ। ইউরোপেও অভিজাতদেরই আধিপত্য গড়ে উঠেছিল। ১৯২৮ সাল পর্যন্ত ব্রিটেনের গণতন্ত্রে দেশের শতকরা মাত্র দশ জনের ভোটাধিকার ছিল।

৮০০ খ্রীষ্টাব্দে রোমান সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল। সম্রাট এবং পোপ হলেন ঈশ্বরের প্রতিনিধি। এই সাম্রাজ্যও ধ্বংস হয়ে যায় বর্বরদের আক্রমণে।

ইউরোপে ভাষা ভিত্তিক জাতিগঠন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে খ্রীষ্ট্রীয় দশম শতাব্দীতে। ফ্রান্স - জার্মান - রাশিয়া - ব্রিটেন - পোলান্ড - ইতালী - হাঙ্গেরী - বুলগেরিয়া এসব স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ে উঠতে থাকে এই সময়ে।

১০৬৬ খ্রীষ্টাব্দে নরম্যানরা ব্রিটেন দ্বীপটি দখল করার পর ইংরেজ জাতির উদ্ভব ঘটে।

এই সময় উত্তর ইউরোপের সর্বত্র চলছিল দস্যু, বর্বর জনগোষ্ঠীর আক্রমণ লুন্ঠণ ও হত্যালীলা। ভারতে চলছিল গজনীর মাহমুদের নিষ্ঠুর হত্যাকান্ড ও লুন্ঠণ। তুর্কীরা ইসলামের পতাকা হাতে নিয়ে ইসলামী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় ব্যস্ত। রক্তের বন্যায় ভেসে গেছে বহুদেশের অসংখ্য মানব সম্প্রদায়। ইসলামের সাম্রাজ্য বিস্তারকে প্রতিরোধ করতে ইউরোপের খ্রীষ্টানরা ঐক্য বদ্ধ হয়ে ধর্মযুদ্ধের ডাক দেয়। ইসলামের বাঁকাচাঁদ এবং খ্রীষ্টানদের ক্রুশ চিহ্নের এই ধর্মযুদ্ধ ইতিহাসে ক্রুসেড নামে পরিচিত। চলেছে দীর্ঘকাল ধরে, ঝড়েছে বহু মানুষের রক্ত। লুন্ঠিত হয়েছে বিপুল ধনরত্ন। সে যুগে জাতীয়তা বোধ ছিল না। মূল লক্ষ্য ছিল সাম্রাজ্য বিস্তার। কখনো ধর্মের নামে কখনো জনগোষ্ঠীর নামে।

প্রাচীন সভ্য দেশ গুলিতে মূর্তি পূজোর প্রচলন ছিল সর্বত্র। বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান এবং ইসলাম

ছিল মূর্তিপূজার বিরোধী। বৌদ্ধরা শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে ধর্মীয় চেতনার বিকাশ ঘটাতো। খ্রীষ্টানরা বৌদ্ধদের এই আদর্শ অনুসরণ করে শিক্ষা ও সেবামূলক কাজের মাধ্যমে ধর্ম প্রচারে ব্রতী হল।

আরবের মরুভূমি অঞ্চলে যাযাবর বেদুইনরা অবিরাম বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ছিল। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে তারা ঐক্যবদ্ধ আরব জাতির উদ্ভব ঘটাল। এরাই দুর্ধর্ষ যোদ্ধার জাতে পরিনত হল।

ইউরোপে তুর্কী বাহিনী পরাজিত না হলে খ্রীষ্টান ধর্মের অস্তিত্ব থাকতো না। ভারতে মারাঠা এবং শিখরা শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে না তুললে হিন্দু ধর্মের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবার সম্ভাবনা ছিল। দক্ষিণ ভারতেও হিন্দু রাজারা বহুকাল ইসলামী আক্রমণ কে প্রতিরোধ করতে পেরেছিল।

আফ্রিকা সম্পর্কে খুব কমই জানা গেছে। পর্তুগীজ উপনিবেশবাদীরাই প্রথম আফ্রিকা সম্পর্কে লিখতে থাকে। মাত্র এক হাজার বছর স্থায়ী ছিল আফ্রিকার কুশ সভ্যতা। ঘানা মালি ও ইথিওপিয়ায় এই সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। এখানে লোহা এবং স্বর্ণের খনি আবিষ্কৃত হয়েছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপের উপনিবেশ বাদীরা এই সভ্যতা ধ্বংস করে দাস ব্যবসার সূত্রপাত করে। গভীর জঙ্গলে ঢাকা অনুর্বর মহাদেশটিতে কৃষিসভ্যতার বিকাশ ঘটেনি।

মাত্র ৫০০ বছর আগে আমেরিকা আবিষ্কৃত হয়েছে। খনন কার্য চালিয়ে এই মহাদেশে তিনটি প্রাচীন সভ্যতা আবিষ্কৃত হয়েছে। সাড়ে তিন হাজার বছর আগে আমেরিকার মধ্যভাগে মায়া সভ্যতার জন্ম হয়েছিল। তারা পশু পালন করতে জানত না। বহু দেবতার পূজা করতো। দেবতার উদ্দেশ্যে নরবলি দিত। মাটির বাসনপত্র তৈরী করতে শিখেছিল। গোয়াতেমালা ও হন্ডুরাশে এই সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে।

মেক্সিকোর পাশে ১২০০ খ্রীষ্টাব্দে আজটেক নামে এক সভ্যতার ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। এদের সমাজে পুরোহিতই ছিল প্রধান। পাশেই ইনকা নামে আরেকটি রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। এরা লাঙ্গল দিয়ে চাষ করতে শিখেনি। সূর্য দেবতার পূজা করত। নরবলি ছিল তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের অঙ্গ। স্পেনিশ উপনিবেশ বাদীরা এই সভ্যতা ধ্বংস করেছিল। এই সব অর্ধসভ্য মানব গোষ্ঠীগুলো কৃষি যন্ত্রপাতি বা যুদ্ধের অস্ত্র তৈরী করতে জানতনা।

আধুনিক আমেরিকার অধিকাংশ মানুষই ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে এসে স্থায়ী বসতি গড়ে তুলেছে। বিশাল দেশের কৃষিজমি উদ্ধার ও কৃষি কাজের জন্য লক্ষ লক্ষ নিগ্রো এবং এশিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে অসংখ্য মানুষকে ক্রীতদাস রূপে বন্দী করে এনে কৃষি কাজে লাগিয়ে অতি দ্রুত উন্নতি ঘটিয়েছে। বিপুল পরিমাণ খনিজ সম্পদ ও আবিষ্কৃত

হয়েছে এই মহাদেশে। ক্রীতদাস ব্যবসা খুব লাভ জনক ছিল ঐ যুগে। প্রকাশ্য বাজারে পশুর মতো কেনা বেচা হতো এদের। মালিকরা এদের সঙ্গে পশুর মতই আচরণ করতো। ইচ্ছে করলে হত্যা করতেও কোন বাধা ছিল না। আমেরিকান প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন ক্রীতদাস প্রথা বাতিল করেছিলেন ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে। ৪০ লক্ষ ক্রীতদাস মুক্তি পেল কিন্তু এর জন্য প্রাণ দিতে হল প্রেসিডেন্টকে। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বিভিন্ন আইনের আড়ালে ক্রীতদাস প্রথা প্রচলিত ছিল আমেরিকায়। ৫০ বছর আগেও শ্বেতাঙ্গদের কাছে ঘেষতে পারতো না এশিয়া, আফ্রিকার কালো মানুষেরা।

রুশ বিপ্লবের পর বদলে গেল মানব সভ্যতার মানসিকতা। দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়লো মিশ্রণ প্রক্রিয়া। চাপা পড়তে লাগলো ধর্ম-বর্ণ ও জাতির প্রাসঙ্গিকতা। মানুষই হল শেষ কথা। সারা বিশ্বের সব দেশে এই প্রক্রিয়া কার্যকর হতে হয়তো কেটে যাবে আরও একটা শতাব্দী।

# ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির উত্তরাধিকার ও ত্রিপুরা

ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূল ধারা হলো ভারতের বুকে স্থায়ী ভাবে বসতি স্থাপন করেছে এমন সব জনগোষ্ঠীর মধ্যে সমন্বয় সাধন করা। দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে এই হল ভারতীয় সংস্কৃতির আদর্শ । পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অসংখ্য জনগোষ্ঠীর শ্রোত এসে স্থায়ী বসতি গড়ে তুলেছে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে। সংঘাত ও সমন্বয়ের স্তর পার হয়ে সভ্যতা ও সংস্কৃতির একটি ধারায় প্রবাহিত হয়েছে ভারতীয় জীবনধারা।

মুসলমান ধর্ম ও সংস্কৃতি ভারতীয় সমাজে একটি নতুন ধারার জন্ম দিয়েছে। সুদীর্ঘকাল শাসন ক্ষমতায় থাকার ফলে আরবী ভাষা ও ফারসী ভাষা এবং শরিয়তি শাসনের নিয়ন্ত্রণে তৈরী হয়েছে মুসলিম মানসিকতা। কিন্তু এদেশের অধিকাংশ মুসলমান হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম থেকে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হবার ফলে সাধারণ মুসলিম সমাজে মাতৃভাষা ও ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি মমতাবোধ লুকিয়ে আছে। পূর্ব-পাকিস্তানে উর্দুভাষা চাপিয়ে দেবার ফলে শিক্ষিত বাঙ্গালী মুসলিমরা যে ভাষা আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত মাতৃভাষা ভিত্তিক স্বাধীন বাংলা দেশের জন্ম দিয়েছিলেন সেটাই ভারতীয় ইতিহাসের সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ ধারার বড় প্রমাণ।

ত্রিপুরা সহ ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলো সুদীর্ঘ কাল স্বাধীন রাজ্য হিসাবে অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল। কিন্তু সব কয়টি স্বাধীন রাজ্যের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে প্রবেশ করলেই

আমরা ভারতীয় সংস্কৃতির পরিচয় পাই।

ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে ত্রিপুরাও ভারতীয় সভ্যতা এবং সংস্কৃতিরই অঙ্গ। ত্রিপুরার রাজবংশকে রাজামালায় যযাতির বংশধর বলে পরিচয় দিয়েছে। প্রাচীন ইতিহাসের বিতর্কে না গিয়েও মাণিক্য রাজাদের ঐতিহাসিক নিদর্শন গুলো বিশ্লেষণ করলেই ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির অঙ্গরূপেই ত্রিপুরাকে আমরা আবিষ্কার করতে পারি। ত্রিপুরার ভারতভুক্তি ভারতের মূল স্রোতে মিশে যাবার এক গৌরবময় অধ্যায়ের সূচনা করেছে।

সুদীর্ঘকাল রাজন্য শাসনে ত্রিপুরার উপজাতি জন সমাজের সব রকম উন্নয়নের ধারা অবরুদ্ধ হয়েছিল। প্রজাতান্ত্রিক ভারতে যুক্ত হবার ফলে ক্ষুদ্র রাজ্য ত্রিপুরার অধিবাসীরা বিশাল ভারতের নাগরিক হিসাবে প্রকৃত স্বাধীনতা ভোগ করার সুযোগ সৃষ্টি হল। ভারতের সম্পদ ও ঐতিহ্যের অংশীদার হিসেবে সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের পথে দ্রুত এগিয়ে যাবার অধিকার অর্জন করল। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির উত্তরাধিকার বহন করে ত্রিপুরার উপজাতিরা বিশ্বের দরবারে ভারতীয় নাগরিক রূপে পরিচয় দিয়ে আন্তর্জাতিক মঞ্চে মর্যাদাপূর্ণ স্থান করে নেবার অধিকারও অর্জন করল।

প্রাচীন কাল থেকেই ত্রিপুরা ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারা বহন করে চলেছে। রাজ্যের ইতিহাস তাই প্রমাণ করে।



## দ্বিতীয় অধ্যায়

# ত্রিপুরার ইতিহাস এবং ঐতিহাসিক উপাদান

বিংশ শতাব্দীর লেখক ও গবেষকদের মধ্যে ত্রিপুরার ইতিহাস সম্পর্কে তিনটি দৃষ্টিভঙ্গী লক্ষ্য করা যায়।

১) অন্ধ রাজভক্তি - যারা রাজবংশের প্রাচীণত্ব এবং গৌরব প্রচারে সচেষ্ট।

২) অন্ধ রাজন্য বিদ্বেষ - যারা রাজবংশের গৌরবকে খাটো করে দেখতে অভ্যস্ত।

৩) নিরপেক্ষ ইতিহাস গঠনের প্রয়াস - যারা বাস্তব অবস্থার মূল্যায়ন এবং ঐতিহাসিক উপাদানের ভিত্তিতে নিরপেক্ষ ইতিহাস গঠনে আগ্রহী।

এই তিনটি দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে আমরা বর্তমান গ্রন্থে তৃতীয় দৃষ্টিভঙ্গীটি অনুসরণ করব। কারণ আধুনিক দুনিয়া বাস্তব ভিত্তিক প্রামাণ্য নিদর্শনের ভিত্তিতেই ইতিহাসের বিশ্লেষণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের পক্ষপাতী।

ভারতীয় হিন্দুরাজাদের ইতিহাস চেতনা কম ছিল। তাছাড়া ঘন ঘন আক্রমণে রাজবংশের পরিবর্তন ঘটতো। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য রাজ্যে ভারতবর্ষ বিভক্ত ছিল। বহু রাজবংশ ইতিহাসের আড়ালে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। যাদের ইতিহাস কোন দিনই জানা যাবেনা।

রাজা-মহারাজাদের রাজ্যের সীমানাও স্থির থাকেনি। কখনো বেড়েছে কখনো কমেছে। আবার কখনো অন্য রাজ্যে বা সাম্রাজ্যে মিশে গিয়েছে। তাদের ইতিহাস সংগ্রহ করাও বেশ কঠিন কাজ।

ত্রিপুরার প্রাচীণযুগের ইতিহাস রচনার একমাত্র ভিত্তি হল পঞ্চদশ শতাব্দীতে মহারাজা ধর্ম মাণিক্যের আদেশে রাজপুরোহিত চন্তাই দুর্লভেন্দ্রের মৌখিক বর্ণনা অনুযায়ী শুক্রেশ্বর এবং বানেশ্বর নামক দুজন ব্রাহ্মণ পন্ডিতের রচিত রাজমালা।

পরবর্তী রাজাদের আমলে ৬ষ্ঠ খন্ড পর্যন্ত রাজমালা রচিত হয়েছে। ২য় খন্ড রচিত হয় অমর মাণিক্যের সময়, ৩য় খন্ড রচিত হয় গোবিন্দ মাণিক্যের সময়, ৪র্থ খন্ড রচিত হয় কৃষ্ণ মাণিক্যের সময়, কাশীচন্দ্র মাণিক্যের সময়, ৫ম খন্ড এবং কৃষ্ণ কিশোর মাণিক্যের সময় ৬ষ্ঠ খন্ড রচিত হয়। সব কয়টি রাজমালায় প্রাচীন যুগের ইতিহাস চন্তাই এর মৌখিক বর্ণনা অনুযায়ী কল্পিত কাহিনীর মত রচিত হয়েছে। মধ্যযুগের মাণিক্য উপাধিধারী রাজাদের সম্পর্কে লিখিত রাজবংশের বর্ণনা ইতিহাসের উপাদানের দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। তবুও ঐতিহাসিক নিদর্শনের সঙ্গে কিছু কিছু অসঙ্গতি ধরা পড়েছে, ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়নি।

# ঐতিহাসিক উপাদান

**প্রাচীণ যুগ**

১) রাজমালা

২) প্রতিবেশী রাজ্যের ইতিহাস

৩) পর্যটকদের বিবরণ

৪) প্রাচীন গ্রন্থ

৫) লোক গাঁথা

প্রতিবেশী রাজ্যের রাজাদের অনেক তাম্রলিপি, স্থাপত্য নিদর্শন, ব্রোঞ্জমূর্তি ও পাথরের মূর্তি পাওয়া গেছে। যার দ্বারা প্রমাণ হয় পার্বত্য ত্রিপুরার বিভিন্ন অংশ প্রাচীণকালে বিভিন্ন রাজবংশের অধীনে ছিল।

**ঐতিহাসিক যুগ**

২) মাণিক্যের সময় থেকে প্রচারিত মুদ্রা

৩) মন্দির প্রতিষ্ঠার শিলালিপি

৪) ব্রাহ্মণ, ফকির ও মন্দির সেবার জন্য ভূমিদানের তাম্রলিপি ও দীঘি উৎসর্গের তাম্রলিপি

৫) সরকারী দলিল পত্র

৬) সুলতান ও নবাব দের সঙ্গে চুক্তিপত্র

৭) ইংরেজ সরকারের সঙ্গে চুক্তিপত্র

৮) ইংরেজ প্রতিনিধির রিপোর্ট

৯) ঐতিহাসিকদের বিবরণ

১০) সমকালীন সাহিত্য গ্রন্থ

১১) পর্যটকদের বিবরণ

১২) গবেষকদের সংগৃহীত তথ্য

১৩) মন্দির ও অন্যান্য স্থাপত্য নিদর্শন।

সব দেশের ইতিহাসের মতই ত্রিপুরার ইতিহাসকেও তিনটি যুগে বিভক্ত করে বিচার বিশ্লেষণ করা সঙ্গত। সেদিক থেকে ১) প্রাচীনযুগ ২) মধ্যযুগ ও ৩) আধুনিক যুগ এই তিনটি ভাগে আমাদের আলোচনা ত্রিপুরার ইতিহাস বুঝতে সাহায্য করবে।

## প্রাচীন যুগ

ত্রিপুরার প্রাচীন যুগের ইতিহাসকে প্রাক্-ঐতিহাসিক যুগ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। যে যুগের প্রামাণ্য ইতিহাস জানা নেই তাকেই বলা হয় প্রাক-ঐতিহাসিক যুগ।

এযুগের ইতহিাস রচনার প্রধান ভিত্তি হল রাজমালা, পার্শ্ববর্তী রাজ্যের ইতিহাস ও

পর্যটকদের বিবরণ।

রাজমালায় বলা হয়েছে ত্রিপুরার রাজবংশ হল চন্দ্র বংশীয় রাজা যযাতির পুত্র দ্রুহ্যের বংশধর। পিতৃরাজ্য থেকে নির্বাসিত হয়ে কিরাত রাজ্যের কিয়দংশ জয় করে তিনি ত্রিবেগ নামে নতুন রাজ্য স্থাপণ করেন। এই বংশের ৩৯ জন রাজার শুধু নামের তালিকা আছে রাজত্বের কোন বিবরণ নেই। ৪০ তম রাজা ত্রিপুর সম্পর্কে সামান্য বিবরণ আছে। ত্রিপুর ছিলেন অত্যাচারী রাজা। তাই নিপীড়িত প্রজাদের আবেদনে সাড়া দিয়ে শিব তাকে হত্যা করেন। নিঃসন্তান অবস্থায় রাজার মৃত্যু হওয়ায় প্রজাদের প্রার্থনা অনুযায়ী বিধবা রাণী হীরাবতীর গর্ভে শিবের বরে ত্রিলোচন নামে সর্বগুণ সম্পন্ন এক পুত্রের জন্ম হয়। তিনি অল্প বয়সেই রাজা হন।

দেবতার বরে সন্তান লাভ করার ধারণাটি অবৈজ্ঞানিক এবং কল্পিত। মহাভারতে আমরা দেখতে পাই রাজা পাণ্ডু অক্ষম হওয়ায় দুই ঋষিকে সন্তান উৎপাদনের জন্য নিয়োগ করা হয়েছিল। কুন্তী ও মাদ্রী দুই রাণীর গর্ভজাত পঞ্চপান্ডবের কেউ পান্ডুর পুত্র নয়। এবিষেয়ে সন্দেহ ছিল বলেই কৌরবরা বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল।

মধ্যযুগেও ভারতে বংশরক্ষার জন্য নিয়োগ প্রথার প্রচলন ছিল। রাজ্য বা জমিদারী রক্ষার প্রয়োজনে এই ব্যবস্থার স্বীকৃতি ছিল মনুসংহিতায়। কিন্তু কুমারী মায়ের সন্তানের স্বীকৃতি ছিলনা। কুন্তীর কানীন পুত্র কর্ণ স্বীকৃতি পাননি।

রাজা ত্রিলোচন কাছাড় রাজকন্যাকে বিবাহ করেন। তাদের ১২ টি পুত্র সন্তান হয়। কাছাড় রাজ নিঃসন্তান হওয়ায় জ্যেষ্ঠ পুত্র দৃকপতিকে কাছাড়ের রাজা করা হয়। দ্বিতীয় পুত্র দক্ষিণ পিতার মৃত্যুর পর ত্রিবেগ রাজ্যের রাজা হন। কিন্তু জ্যেষ্ঠ পুত্র হিসেবে দৃকপতি ত্রিবেগ রাজ্যের অধিকার দাবী করেন। ফলে দুই ভাইয়ের মধ্যে যুদ্ধ হয়। দক্ষিণ যুদ্ধে পরাজিত হয়ে আরও দক্ষিণে সরে এসে বরাক নদীর তীরে নতুন রাজ্য স্থাপন করেন। দৃকপতির মৃত্যুর পর রাজা দক্ষিণ পিতৃরাজ্য ত্রিবেগ দখল করে রাজ্য বিস্তার করেন। পরবর্তী বংশধর প্রতীত আরও দক্ষিণে এসে ধর্মনগরে জুরি নদীর তীরে রাজধানী স্থাপন করেন।

রাজমালায় রাজা দক্ষিণের পরবর্তী ৪১ রাজার শুধু তালিকা উল্লেখ করা হয়েছে রাজত্বের কোন বিবরণ নেই। যযাতির পুত্র দ্রুহ্যের ৬৭ তম বংশধর ঈশ্বর ফা কি কারণে ফা উপাধি ধারণ করলেন তার কোন উল্লেখ নেই। রাজমালায় বর্ণিত বংশ তালিকার প্রথম উনচল্লিশ জন এবং রাজা দক্ষিণের পরবর্তী একানব্বই জন অর্থাৎ মোট ১৩০ জন রাজার শুধু নামের তালিকা ছাড়া রাজ্য শাসনের কোন প্রকার বিবরণ নেই। নামের তালিকাও ধারাবাহিক নয়। সুদীর্ঘ কালের ইতিহাস শুধুমাত্র একজন চন্তাই এর স্মৃতি

নির্ভর মৌখিক বিবরণ থেকে লিখিত হয়েছে। রাজমালায় শুধু রাজাদের কথা বলা হয়েছে। প্রজাদের সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি।

ত্রিবেগ রাজ্যের কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়নি। অনেকে রাজমালার বর্ণনা অনুযায়ী আসামের নওগাঁও অঞ্চল কে ত্রিবেগ বলে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। কিন্তু ঐ অঞ্চলে দীর্ঘকাল রাজত্বের কোন রকম নিদর্শণ আবিষ্কার করা যায়নি।

ফলে আধুনিক ঐতিহাসিকগণ ঐ সব বর্ণনাকে কল্পিত এবং কিংবদন্তীর উপর নির্ভরশীল একটি কাহিনী বলেই সিদ্ধান্ত করেছেন। মাণিক্য রাজাদের পূর্ববর্তী রাজারা ছিলেন প্রভাবশালী সর্দার রাজা।

নৃতাত্ত্বিক এবং ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে ত্রিপুরার রাজবংশকে ত্রিপুরী বংশোদ্ভুত বলেই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। রাজপরিবারে বিভিন্ন রাজ্যের রাজকন্যা ও অভিজাত বংশের কন্যাদের বিবাহ সূত্রে মিশ্রণ ঘটেছে। ত্রিপুরার রাজপরিবারে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়ে বাংলা-আসাম-মণিপুর-নেপাল-মধ্যপ্রদেশ-পাঞ্জাব ও রাজস্থানের রাজকন্যারা রাণী হয়ে এসেছেন। তাছাড়াও রাজ্যের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সর্দার কন্যারা পত্নী - উপপত্নী - রাণী-মহারাণী হয়েছেন। রাজপরিবারে বহুবিবাহ প্রাচীন কাল থেকেই প্রচলিত ছিল। রাজকুমারদের মধ্যে সিংহাসনের দাবীতে কলহ, বিবাদ ও ষড়যন্ত্রও ছিল প্রাচীন কাল থেকেই।

ত্রিপুরা, কাছাড়, শ্রীহট্ট, কুমিল্লা, ময়নামতি ও আরাকান অঞ্চল থেকে অনেকগুলো তাম্রলিপি ও মুদ্রা পাওয়া গেছে। পঞ্চদশ শতাব্দীর আগে ত্রিপুরা নামে কোন রাজ্যের উল্লেখ নেই। একটি তাম্রলিপি থেকে জনা যায় ত্রিপুরার পূর্ব নাম ছিল সুবঙ্গ। পূর্ব-বাংলার বিভিন্ন রাজাদের অধীনে পার্বত্য অঞ্চলের বিভিন্ন অংশ যুক্ত ছিল।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মুসলমান শাসন শুরু হবার আগে বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মাবলম্বী বিভিন্ন রাজবংশ এই অঞ্চলে রাজত্ব করেছেন তার বহু প্রামাণ্য তাম্রলিপি ও অন্যান্য নিদর্শণ পাওয়া গেছে।

পর্যটক ও ঐতিহাসিকদের নানা বিবরণ থেকে জানা যায় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে ত্রিপুরার অধিকাংশে অঞ্চল সমতটের শক্তিশালী গুপ্তবংশীয় রাজাদের অধীনে ছিল। তাম্রলিপিতেও তার প্রমাণ পাওয়া গেছে।

চীনা পরি ব্রাজক হিউয়েন সাং এর বিবরণ থেকে জানা যায় সপ্তম শতাব্দীতে রাত ও খড়গ বংশীয় সামন্ত রাজাদের অধীনে ছিল সুবঙ্গ অর্থাৎ ত্রিপুরার অধিকাংশ অঞ্চল। ত্রিপুরা ছাড়াও সমগ্র পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গ তাদের অধীনে ছিল। খড়গ বংশীয় রাজারা বৌদ্ধ ছিলেন। গোমতী নদীর একটি শাখানদী ক্ষিরদার তীরে দেবপর্বতে ছিল তাদের রাজধানী।

রাত্র বংশীয় রাজারা ছিলেন বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী।

পরবর্তী রাজারা ছিলেন দেব বংশীয়। এই বংশের ভবদেব ও কান্তিদেব বিখ্যাত ছিলেন। তাদের কাছ থেকে চন্দ্র বংশীয় রাজারা এই অঞ্চল দখল করে নেন।

চন্দ্র বংশীয় রাজারা একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। এই বংশের সাতজন রাজার নাম জানা গেছে। তাদের রাজধানী ছিল লোহিতগিরি বর্তমান নাম লালমাই।

শ্রীহট্টে প্রাপ্ত একটি তাম্রলিপিতে জানা যায় শ্রীহট্ট অঞ্চলটিও সমতটের অধীন ছিল।

চোল বংশীয় রাজাদের আক্রমণে চন্দ্রবংশীয় বৌদ্ধ রাজাদের পতন ঘটে। চোলরাজার জামাতা জাত বর্মন ব্রাহ্মণ্য হিন্দু বর্মন রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করেন। সেন রাজাদের আক্রমণে বর্মন বংশের রাজত্বের অবসান ঘটে। এসব প্রামাণ্য নিদর্শণ বিশ্লেষণ করে ঐতিহাসিকগণ সিদ্ধান্ত করেছেন যে চুতর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত ত্রিপুরা নামে কোন রাজ্য গড়ে উঠেনি।

রাজমালার বর্ণনা অনুসারে ফা উপাধিধারী রাজারা প্রথমে ধর্মনগরে রাজ্য স্থাপন করেন। এর পর ৯১ জন রাজার নামের তালিকা ছাড়া আর কোন বিবরণ নেই। এই সময় ফা উপাধিধারী ত্রিপুরী সর্দাররা ত্রিপুরার অন্যান্য উপজাতি জনগোষ্ঠীগুলোর উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে একটি রাজ বংশ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। তখন তাদের রাজ্যের সীমানা উত্তর কাছাড় থেকে পূর্ব ত্রিপুরা অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তুর্কী মুসলমানদের আক্রমণে বাংলার রাজবংশগুলো বিপর্যস্ত হওয়ার সুযোগে ত্রিপুরার রাজবংশ সমতল ভূমিতে রাজ্য বিস্তারে সচেষ্ট হন। হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করায় ব্রাহ্মণদের সহায়তায় হিন্দু প্রজাদের সমর্থন লাভ করেন। সে সময় সমতলের বিশাল অঞ্চল জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। রাস্তা ঘাট দুর্গম ছিল। গেরিলাযুদ্ধে মুসলমান সেনারা সুদক্ষ ছিল না। কিন্তু মুসলমানরা অল্পকালের মধ্যেই সামরিক শক্তিতে শক্তিমান হয়ে সমগ্র বাংলায় আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিল। ব্যাপকহারে নিম্নবর্ণের হিন্দুরা মুসলমান ধর্মগ্রহণ করার ফলে মুসলনানরা শক্তিশালী হয়ে উঠে।

ফলে ত্রিপুরার রাজারাও প্রথম দিকে সুলতানের বশ্যতা স্বীকার করে রাজ্যের স্বীকৃতি আদায় করেছিলেন।

সুলতানের দরবারে ত্রিপুরার রাজপুত্র রত্নফাকে প্রতিনিধি হিসেবে পাঠানো তারই প্রমাণ। সুলতানের সেনা বাহিনীর সাহায্যে সর্বকনিষ্ঠ রাজকুমার রত্নফার রাজ্যলাভ থেকে ত্রিপুরার সঙ্গে সুলতানের ঘনিষ্ঠ মিত্রতা বৃদ্ধি পায়। রাজ্যলাভে সহায়তার জন্য কিছু সংখ্যক হাতি উপহার পাঠানো এবং রাজমালার বর্ননা অনুযায়ী একটি মূল্যবান রত্ন উপহার দিয়ে রত্নফার মাণিক্য উপাধি লাভ থেকে ত্রিপুরার মাণিক্য রাজাদের ধারাবাহিক

রাজত্বের সূত্রপাত হয় এবং প্রাচীন যুগের অবসান হয়।

## মধ্যযুগ

রাজমালার বর্ণনা অনুসারে রত্ন মাণিক্য ত্রিপুরায় মাণিক্য শাসনের প্রতিষ্ঠাতা। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর আবিষ্কৃত তাম্রলিপি থেকে জানা যায় ধর্মমাণিক্য রত্ন মাণিক্যের পূর্ববর্তী রাজা। রত্নমাণিক্যের অভিষেক মুদ্রায় ১৩৮৬ শকাব্দ (১৪৬৪ খ্রীঃ) উল্লেখ রয়েছে। এটাই ত্রিপুরার রাজাদের প্রথম মুদ্রা। তা থেকে মনে হয় রত্ন মাণিক্য মুসলিম সুলতানদের প্রভাবে প্রথম মুদ্রা প্রচলন করেন।

ধর্মমাণিক্যের ভূমিদান সম্পর্কিত একটি তাম্রলিপিতে ১৩৮০ শকাব্দ (১৪৫৮ খ্রীঃ) উল্লেখ রয়েছে এবং ত্রিপুর বংশাবলীতে ধর্মমাণিক্যের রাজত্বকাল ১৪৩১-১৪৬২ খ্রীঃ বলা হয়েছে। তাছাড়া তাম্রলিপিতে ধর্মমাণিক্যের পিতার নাম মহামাণিক্য উল্লেখ রয়েছে।

কালীপ্রসন্ন সেন রাজমালার প্রস্তাবনায় বলেছেন -

প্রণয় করিল রাজা গৌড়েশ্বর সঙ্গে,
কনিষ্ঠ পুত্র পাঠাইল লোক সঙ্গে বঙ্গে।

আবার বলেছেন—

ত্রিলোচন বংশে মহামাণিক্য নৃপতি।
তানপুত্র ধর্মমাণিক্য নাম খ্যাতি।।

প্রাপ্ত তাম্রলিপির সঙ্গে এই বর্ণনা মিলে যাচ্ছে।

এসব নিদর্শণ বিশ্লেষণ করে ঐতিহাসিকগণ মাহামাণিক্যকে মাণিক্য শাসনের প্রতিষ্ঠাতা বলে মেনে নিয়েছেন। সে যুগে ত্রিপুরায় একটি হিন্দু রাজবংশের গৌরব বৃদ্ধির জন্য হিন্দু ব্রাহ্মণ পন্ডিতেরা মাণিক্য উপাধি এবং চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় বলে ত্রিপুরার রাজবংশের পরিচয় দিয়েছেন। রত্নমাণিক্য সুলতানদের কাছ থেকে এই রাজবংশের স্বীকৃতি আদায় করেছেন।

কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় বলেছেন ভারতে বৌদ্ধ প্রভাব ক্ষুন্ন করার জন্য, যে সব হিন্দু রাজারা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আনুগত্য স্বীকার করেছেন তাদেরকে চন্দ্র বংশীয় রাজা বলে ব্রাহ্মণরা ঘোষনা দিয়েছেন। ভারতে সূর্যবংশীয় অথবা চন্দ্র বংশীয় বলে পরিচয় দিয়ে হিন্দু রাজারা গৌরব বোধ করতেন। বাংলা, উড়িষা, উত্তর ভারত ও দক্ষিণ ভারতের বহু তাম্রলিপিতে বিভিন্ন বংশের রাজারা চন্দ্র বংশীয় বলে পরিচয় দিয়েছেন। ত্রিপুরার রাজ বংশের প্রাচীণত্ব প্রমাণ করার জন্যই রাজমালায় চন্দ্রবংশীয় রাজা যযাতির বংশধর বলে

পরিচয় দেওয়া হয়েছে। ভারতে শক-হূণ-দ্রাবিড় ও অন্যান্য বহু জাতি গোষ্ঠীর রাজারা নিজেদের চন্দ্রবংশীয় বলে পরিচয় দিয়েছেন। এতে আর্য-অনার্য পার্থক্য করা হয়নি। হিন্দুধর্মের সমন্বয় প্রচেষ্টা এখানে লক্ষ্যনীয়।

রত্নমাণিক্য তুর্কী সুলতানদের সঙ্গে মৈত্রী সম্পর্ক স্থাপন করে নিজের রাজ্য সংহত ও সুসংগঠিত করেন। রাজ্যের উন্নতি কল্পে বিভিন্ন পেশায় দশ হাজার বাঙ্গালীকে ত্রিপুরায় পাঠাবার জন্য সুলতানকে অনুরোধ করেন। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ কামার, কুমার, সূত্রধর, রাজমিস্ত্রী, কৃষক, ব্যবসায়ী, কারিগর ইত্যাদি বিভিন্ন পেশার দশ হাজার হিন্দু ও মুসলিম বাঙ্গালীকে সুলতানের নির্দেশে ত্রিপুরায় পাঠানো হয়। রাজধানী রাঙ্গামাটির পাশেই রত্নপুর নামে নতুন রাজধানী স্থাপন করে বাঙ্গালীদের পুনর্বাসন দেওয়া হয়। রত্নমাণিক্য বাংলার সুলতানী শাসনের অনুকরণে শাসন পদ্ধতির সংস্কার করেন এবং বাংলা ও ফারসী ভাষায় রাজকার্য পরিচালনা করেন। তখন থেকে ত্রিপুরার রাজারা মুসলিম অনুকরণে রাজপোষাক ব্যবহার শুরু করেন। উজীর, নাজীর, সুবা দেওয়ান ইত্যাদি পদ সৃষ্টি করা হয়। সেরেস্থা গঠন করে রাজস্ব আদায় ও আয় ব্যয়ের হিসাব রাখার ব্যবস্থা প্রচলিত হয়। মুসলিম অনুকরণে সামরিক পদ্ধতি চালু করে রাজ্যকে একটা শক্তিশালী সুগঠিত রাজ্যে পরিনত করতে সক্ষম হন।

রাজমালায় রত্নমাণিক্যকে প্রথম মাণিক্য শাসক বলে বর্ণনা করা হলেও প্রাপ্ত তাম্রলিপির বর্ণনা অনুযায়ী ধর্ম মানিক্য হলেন রত্ন মানিক্যের পিতা এবং মহামানিক্য হলেন রত্নমানিক্যের পিতামহ।

রাজমালায় বর্ণিত ছেংতুংফা মুসলিম আক্রমণে বিপর্যস্ত হিন্দু রাজাদের পতনের সুযোগ নিয়ে প্রাচীন কমলাঙ্ক আধুনিক কুমিল্লা দখল করে মেঘনা নদীর তীর পর্যন্ত রাজ্যের সীমা বিস্তৃত করেন। পূর্ববর্তী রাজা জঝারফা রাঙ্গামাটির লিকা বংশীয় মগ রাজাকে পরাজিত করে রাঙ্গামাটি দখল করেছিলেন।

## মহামাণিক্য

আধুনিক ঐতিহাসিকদের মতে ছেংতুফাই হলেন মহামাণিক্য। মুসলিম আক্রমণে ভীত রাজাকে মহারাণী মহাদেবী উৎসাহ যুগিয়ে ত্রিপুর সেনাদের মদ মাংস ভোজ দিয়ে যুদ্ধে উদ্দীপিত করেন। প্রচুর সেনাক্ষয় করে যুদ্ধে জয়লাভ করেন। মহারাণীর যুদ্ধে অংশ গ্রহণের বিষয়ে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেন। তবে এটাই ছিল ত্রিপুরার রাজাদের

বিরুদ্ধে সুলতানের প্রথম যুদ্ধ। যুদ্ধ জয়ে উৎসাহিত হয়ে মহামাণিক্য পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং শ্রীহট্টের কিছু অংশ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন।

## ধর্মমাণিক্য

তাম্রলিপি অনুযায়ী মহামাণিক্যের পুত্র ধর্মমাণিক্য ১৪৩১ থেকে ১৪৬২ খ্রী: পর্যন্ত ৩২ বছর রাজত্ব করেন। রাজমালায় ধর্মমাণিক্যের ৩২ বছর রাজত্বের উল্লেখ আছে। তবে পিতৃ পরিচয় ভিন্ন রকম দেওয়া আছে। ঐতিহাসিকগণ তাম্রলিপির নিদর্শণ অনুযায়ী মতভেদ খন্ডন করেছেন।

রাজমালায় বলা হয়েছে পিতা জীবিত কালেই ধর্মমাণিক্য তীর্থ পরিদর্শণে গিয়ে বারাণসীতে অবস্থান করার সময় পিতার মৃত্যু সংবাদ নিয়ে রাজ পরিষদগণ ধর্ম মাণিক্যকে ত্রিপুরায় এনে সিংহাসনে বসান এবং রাজ্যে শৃংখলা স্থাপণ করেন।

রাজ্যে বিশৃংখলার সুযোগে বাংলার সুলতান ত্রিপুরা রাজ্যের কিছু অংশ জয় করে নেন। ধর্ম মাণিক্য হারানো অংশ উদ্ধার করেন এবং মুসলিম রাজধানী সুবর্ণগ্রাম লুষ্ঠণ করেন। ধর্ম মাণিক্য বারাণসী থেকে আসার সময় একটি ব্রাহ্মণ পরিবারকে সঙ্গে আনেন। এই ব্রাহ্মণ পরিবারকে ভূমিদান সংক্রান্ত একটি তাম্রলিপির কথা রাজমালায় উল্লেখ করা হয়েছে। ইতিহাস রচনায় এই তাম্রলিপি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি কুমিল্লায় ধর্মসাগর নামে একটি দীঘি খনন করান।

ধর্ম মাণিক্যই প্রথম ত্রিপুরার রাজবংশের পরিচয় লাভের উদ্দেশ্যে সংস্কৃত ও বাংলায় রাজমালা রচনার আদেশ দেন। রাজপুরোহিত দুর্লভেন্দ্র স্মৃতি শক্তি প্রয়োগ করে অতীতের রাজবংশের বর্ণনা দেন এবং বানেশ্বর ও শুক্রেশ্বর নামে দুই বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ পন্ডিত রাজমালার লিখিত রূপ দেন। এই রাজমালার পান্ডুলিপি পাওয়া যায়নি। পরবর্তী কালে বিভিন্ন রাজাদের আমলে রাজমালা পরিবর্তিত ও পরিবর্দ্ধিত আকার লাভ করে। মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের সময় সংস্কৃত রাজ রত্নাকরম পরিমার্জিত রূপে রচিত হয়। কিন্তু তাও এখন দুষ্প্রাপ্য।

## রত্নমাণিক্য

ধর্মমাণিক্যের পর পুত্র রত্ন মাণ্িক্য রাজা হন। তিনি রাজার ১৮ জন পুত্রের মধ্যে সর্ব কনিষ্ঠ ছিলেন। খুব সম্ভবত ধর্মমাণিক্য সুলতানের সঙ্গে সন্ধি করে রাজ্যের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেন এবং রাজকুমার রত্নফাকে রাজার প্রতিনিধি হিসেবে সুলতানের দরবারে

জামিন রাখেন। রত্নফা সুলতানের প্রিয় পাত্র হয়ে উঠেন এবং রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে রাজা করে পুত্রদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সুযোগ্য পুত্র রত্নফাকে রাজ্য থেকে বঞ্চিত করার প্রতিবাদে সুলতানের সেনা বাহিনীর সহযোগিতায় রত্নফা রাজ্যের সিংহাসন লাভ করেন। বাংলার সুলতান এই সুযোগে একজন বিশ্বস্ত মিত্রকে ত্রিপুরার সিংহাসনে বসিয়ে বার্ষিক একশটি হাতি কর স্বরূপ আদায়ের ব্যবস্থা করেন।

রাজমালার ডাঙ্গর ফা হলেন ধর্মমাণিক্য। পুত্রদের বুদ্ধি পরীক্ষায় রত্নফার শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে রাজমালায় একটি কাহিনীর বর্ণনা রয়েছে। রত্নমাণিক্য ত্রিপুরায় প্রথম মুদ্রা প্রচার করেন। মুদ্রার সাক্ষ্য অনুযায়ী তিনি ১৪৬৭ খ্রী: পর্যন্ত রাজত্ব করেন। ১৪৬২ খ্রীষ্টাব্দে ধর্মমাণিক্যের মৃত্যুর পর কিছু সময় সিংহাসন নিয়ে বিবাদ ও যুদ্ধ বিগ্রহে অতিবাহিত হয়। কাজেই প্রকৃত রাজত্ব কাল ছয় বছরের বেশী নয়।

## ১ম প্রতাপমাণিক্য

রত্নমাণিক্যের মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রতাপ মাণিক্য রাজা হন। কিন্তু তিনি অত্যাচারী শাসক হিসেবে পরিচিত হওয়ায় রাজ্যের সেনাপতিরা রাজাকে হত্যা করে রাজার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুকুট মাণিক্যকে রাজা করেন। তিনিও বেশীদিন রাজত্ব করার সুযোগ পাননি। একটি তাম্রলিপি থেকে জানা যায় প্রতাপ মাণিক্যের মৃত্যুর পর নাবালক পুত্র বিজয় মাণিক্যকে রাজা করে মাতুল দৈত্যনারায়ন ও মহারাণী পুণ্যবতী রাজ্য পরিচালনা করেন। ক্ষুব্ধ সেনাপতিরা তিনজনকে হত্যা করে রাজ ভ্রাতা মুকুট মাণিক্যকে রাজা করেন। কি কারণে মুকুট মাণিক্য অল্পদিনের মধ্যেই সিংহাসন হারান বা মারা যান তা জানা যায়নি।

## ২য় প্রতাপ মাণিক্য

মুকুট মাণিক্যের পুত্র দ্বিতীয় প্রতাপ মাণিক্য ১৪৯০ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে রাজা হন। এই সময়ের একটি মুদ্রা পাওয়া গেছে। তিনিও সেনাপতিদের হাতে নিহত হন।

রত্নমাণিক্য থেকে পরবর্তী রাজাদের ধারাবাহিকতা রাজমালার সঙ্গে আবিষ্কৃত মুদ্রা ও তাম্রলিপির বর্ণনায় মিলছে না। মুদ্রা ও তাম্রলিপির বর্ণনাকে ইতিহাসের ভিত্তি হিসেবে মেনে নিতে হয়েছে।

# ধন্যমাণিক্য

১৪৯০ খ্রীষ্টাব্দে ধন্যমাণিক্য সিংহাসনে আরোহণ উপলক্ষে মুদ্রা প্রচার করেন। একবছর আগে মুকুট মাণিক্যের মুদ্রা প্রচারিত হয়েছে ১৪৮৯ খ্রীষ্টাব্দে। মুদ্রার সাক্ষ্য অনুযায়ী ধন্যমাণিক্য মুকুট মাণিক্যের পুত্র বলেই ঐতিহাসিকগণ সিদ্ধান্ত করেছেন যদিও রাজমালায় ধন্যমাণিক্যকে মুকুট মাণিক্যের প্রপৌত্র বলা হয়েছে।

ধন্যমাণিক্যের মুদ্রাতেই প্রথম ত্রিপুরার উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৪১২ শকাব্দের (১৪৯০ খ্রীঃ) মুদ্রায় নিজেকে ত্রিপুরেন্দ্র বলে পরিচয় দিয়েছেন।

ত্রিপুরা নামের উৎপত্তি কবে হয়েছে তার কোন প্রমাণ নেই। মহাভারতে যে ত্রিপুরা রাজ্যের উল্লেখ রয়েছে ঐতিহাসিকগণ মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুরে আধুনিক ছত্রিশগড় জেলায় ত্রিপুররাজ ও কোশল রাজের প্রাচীন রাজ্যের অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছেন। মহাভারতের যুদ্ধে উত্তর পূর্বাঞ্চল থেকে কিরাতরাজ কৌরবপক্ষে যোগ দেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। মহাভারতের যুদ্ধে কৌরব পক্ষে হাজার হাজার ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজারা যোগ দিয়েছেন। প্রত্যেক রাজ্যের সক্ষম পুরুষেরা রাজার সৈন্যদলে যোগ দিতে বাধ্য হয়েছিল। যুদ্ধের শেষে কোন রাজা বা সৈন্য জীবিত ছিলনা।

পান্ডবেরা অশ্বমেধ যজ্ঞ কালে শত্রুপক্ষে যোগদানকারী অধিকাংশ রাজ্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। ঐ সময় কিরাত রাজ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপজাতি গোষ্ঠীর সর্দার রাজাদের অধীনে বিভক্ত হয়ে যায়। বহু রাজ্যের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যায়।

ধন্য মাণিক্যের সমসাময়িক বাংলা কাব্যেও ত্রিপুরা জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়। সম্ভবত সুসংগঠিত রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবার পর ত্রিপুরা নামটির প্রচার শুরু হয়।

ধন্যমাণিক্যকে মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ রাজা বলা হয়। রত্ন মাণিক্যের পর থেকে সেনাপতিরা শক্তিশালী হয়। বেশ কয়েক জন রাজাকে তাদের হাতে প্রাণ দিতে হয়। ধন্যমাণিক্য প্রধান সেনাপতির কন্যা কমলা দেবীকে বিয়ে করে নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন। দশজন সেনাপতিকে পরামর্শ কক্ষে ডেকে এনে ঘাতকের সাহায্যে হত্যা করেন। এতকাল শুধু ত্রিপুরী সম্প্রদায় থেকে সেনাপতি পদে নিযুক্ত করা হতো। ধন্য মাণিক্য রিয়াং সম্প্রদায় থেকে রায়কাচাক এবং রায়কাছাম নামে দু'জন সেনাপতি নিযুক্ত করেন। তাদের সাহায্যে দুর্দান্ত কুকী রাজাকে বশীভুত করেন। কুকী সেনারা তখন থেকে রাজার শক্তি ও প্রভাব বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।

সুলতান হুসেন শাহের সময় বিশৃংখলা দেখা দেয়। এই সময় ধন্য মাণিক্য সমতল অঞ্চলের অনেকগুলো গ্রাম রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। জমিদার প্রতাপ রায় রাজার বশ্যতা

স্বীকার করেন।

চট্টগ্রামকে কেন্দ্র করে ত্রিপুরা আরাকান ও বাংলার সুলতানের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। প্রথমবারের যুদ্ধে ত্রিপুর সেনারা জয়ী হয়। হুসেনশাহ্ বিশাল বাহিনী নিয়ে তৃতীয় বারের যুদ্ধে ত্রিপুরার রাজার কাছ থেকে চট্টগ্রাম দখল করে নিতে সক্ষম হন। এই সময় ত্রিপুরার কিছু অংশ হুসেন শাহের দখলে চলে যায়।

ধন্যমাণিক্য শিল্প সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ১৫০১ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির প্রতিষ্ঠা করে তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন। তিনি রত্নপুরে চৌদ্দ দেবতার মন্দির, উদয়পুরে মহাদেব মন্দির নির্মাণ করান এবং কসবার কমলাসাগর দীঘি খনন করান। ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দে বসন্তরোগে মারা যান। তিনি ২৫ বছর রাজত্ব করেন।

## ধ্বজ মাণিক্য

ধন্য মাণিক্যের মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ পুত্র ধ্বজ মাণিক্য রাজা হন কিন্তু অল্পকাল রাজত্ব করার পর মারা যান। এ যাবত ধ্বজমাণিক্যের কোন মুদ্রা বা তাম্রলিপি পাওয়া যায়নি।

## দেবমাণিক্য

ধ্বজ মাণিক্যের ভাই দেবমাণিক্য ১৫২০ সালে রাজা হন। ঐ বছরের একটি মুদ্রা পাওয়া গেছে। দেব মাণিক্য চট্টগ্রাম দখল করেছিলেন কিন্তু বেশীদিন রক্ষা করতে পারেননি। তিনি সাময়িক কালের জন্য সোনার গাঁও জয় করে দখল করে ছিলেন। সুলতান নসরত খাঁ ঐ সময় বাবরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। ফিরে এসে সোনার গাঁও উদ্ধার করেন।

দেবমাণিক্য মিথিলার এক তান্ত্রিক সাধুর প্রভাবে পড়েন। তান্ত্রিক ক্ষমতার লোভে রাজাকে হত্যা করেন। দ্বিতীয় রাণীর নাবালক পুত্র কুমার ইন্দ্রের নামে রাজ্য শাসন শুরু করেন। সেনাপতিরা ক্ষিপ্ত হয়ে কুমার ইন্দ্র, রাজমাতা ও তান্ত্রিক সাধু লক্ষ্মীনারায়ণকে হত্যা করেন। রাজমালায় ইন্দ্রকে ধ্বজ মাণিক্যের পুত্র বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

## বিজয় মাণিক্য

ইন্দ্র মাণিক্যকে হত্যা করার পর সেনাপতিরা দেব মাণিক্যের পুত্র বিজয় মাণিক্যকে রাজা করেন। তিনি কয়েকটি মুদ্রা প্রচার করেন। মুদ্রা থেকে জানা যায় বিজয় মাণিক্য

ত্রিশ বছর রাজত্ব করেন এবং এই সময় রাজ্যের গৌরব বৃদ্ধিপায়। প্রধান সেনাপতি দৈত্য নারায়ণের কন্যাকে বিবাহ করেন। শ্বশুর খুব শক্তিশালী হয়ে উঠায় ঘাতকের সাহায্যে শ্বশুরকে হত্যা করেন। রাণী একথা জানতে পেরে ঘাতক মাধবকে হত্যা করেন। রাজা ক্ষুব্ধ হয়ে রাণীকে নির্বাসন দেন। সেনাপতির ক্ষমতা উজির ও নাজিরের মধ্যে ভাগ করে দেন।

বিজয় মাণিক্য একদল ভাড়াটে আফগান অশ্বারোহী বাহিনীকে সামরিক বাহিনীতে নিযুক্ত করেন। শ্রীহট্ট, খাসিয়া, জয়ন্তিয়া, জয় করে সন্ধি করে শান্তি স্থাপন করেন। আফগান ভাড়াটে সৈন্যরা বিদ্রোহ করে উজীর প্রচন্ড নারায়ণকে হত্যা করে। রাজা বিদ্রোহীদের চতুর্দ্দশ দেবতার বাড়ীতে বলি দেন। এই সময় মোগল আক্রমণের ভয়ে বাংলার সুলতান বিজয় মাণিক্যের সঙ্গে সন্ধি করে শান্তি স্থাপণ করেন।

উদয়পুরে গোপীনাথ মন্দির নির্মাণ ও দীঘি খনন করান। ব্রহ্মোত্তর ও দেবোত্তর ভূমিদান করেন। ১৫৬৩ খ্রীষ্টাব্দে বসন্ত রোগে মারা যান।

## অনন্ত মাণিক্য

১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দে বিজয় মাণিক্যের দ্বিতীয়পুত্র অনন্ত মাণিক্য রাজা হন। ঐ বছরের একটি মুদ্রা পাওয়া গেছে। শ্বশুর গোপীপ্রসাদ ক্ষমতালোভে মাত্র দেড় বছর রাজত্ব কালের মধ্যেই জামাতা অনন্ত মাণিক্যকে হত্যা করে ত্রিপুরার রাজা হন।

## উদয় মাণিক্য

১৫৬৭ খ্রীষ্টাব্দে সেনাপতি গোপী প্রসাদ উদয় মাণিক্য নাম নিয়ে সিংহাসনে বসেন। তিনি নিজ নামে মুদ্রা প্রচার করেন। ত্রিপুরার রাজধানী রাঙ্গামাটি এই সময় থেকে উদয়পুর নামে পরিচিত হয়। চন্দ্রপুরে চন্দ্রসাগর নামে একটি দীঘি খনন করান। এই সময় সুলতান সুলেমান চট্টগ্রাম অধিকার করে নেন। প্রজাদের দুর্ভোগ বেড়েছিল। রাজ্যের সীমাও সংকোচিত হয়েছিল।

## জয়মাণিক্য

১৫৭৩ খ্রীষ্টাব্দে উদয় মাণিক্যের পুত্র জয় মাণিক্য রাজা হন। এই বছরের একটি মুদ্রা পাওয়া গেছে। বিজয়মাণিক্যের এক ভ্রাতা অমরমাণিক্য কৌশলে জয়মাণিক্যকে হত্যা

করে পুরাতন রাজবংশের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন।

## অমর মাণিক্য

১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দে অমর মাণিক্য নিজ নামে মুদ্রা প্রচার করে রাজা হন। রাজার অধীনস্থ সামন্ত জমিদারদের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। মোগলদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য ঈশা খাঁ ত্রিপুরার রাজার সঙ্গে মিত্রতা করেন।

অমরপুরে এক দীঘি খনন করে ত্রিতল রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করান। রাজধানী সেখানে স্থানান্তর করেন। শ্রীহট্ট জয় করে শ্রীহট্ট বিজয়ী মুদ্রা প্রচার করেন। রাজত্বের শেষ দিকে বিপর্যয় দেখা দেয়। পর্তুগীজ সেনার সাহোয্যে আরাকান রাজ সিকন্দর শাহ্ উদয়পুর অধিকার করেন। ব্যাপক লুণ্ঠণ ও হত্যাকান্ড চালিয়ে মগ সেনারা আরাকানে ফিরে যায়। অমরমাণিক্য মনুনদীর তীরে পালিয়ে গিয়ে শিবির স্থাপন করেন। সেখানেও রাজার শ্যালক বিদ্রোহ করায় মানসিক ভারাক্রান্ত রাজা বিষ পানে আত্মহত্যা করেন।

## রাজধর মাণিক্য

অমর মাণিক্যের মৃত্যুর পর ১৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজধর মাণিক্য রাজা হন এবং মুদ্রা প্রচার করেন। মগেরা উদয়পুর ত্যাগ করার পর রাজধর মাণিক্য উদয়পুরে পুনরায় রাজধানী স্থাপণ করেন। তিনি ঈশ্বর আরাধনায় বেশী সময় দেন। বিষ্ণুমন্দির প্রতিষ্ঠা করে দিবারাত্র কীর্তনের ব্যবস্থা করেন। এই সুযোগে মোগলরা ত্রিপুরা আক্রমণে উদ্যোগী হয়েও ফিরে যায়। ১২ বছর রাজত্ব করার পর সিংহাসন নিয়ে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়।

রাজধর মাণিক্যের পর ঈশ্বর মাণিক্য নামে এক রাজা স্বল্পকাল রাজত্ব করেন। রাজমালায় ঈশ্বর মাণিক্যের নাম উল্লেখ নেই। কিন্তু ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের একটি মুদ্রায় রাজার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়।

## যশোধর মাণিক্য

রাজধর মাণিক্যের পুত্র যশোধর মাণিক্য ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিপুরার রাজা হন। ঐ বছরে প্রচারিত মুদ্রা পাওয়া গেছে। একই বছরে প্রথম দিকে ঈশ্বর মাণিক্য স্বল্পকাল রাজত্ব করেন।

১৬১৮ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার সুবাদার ইব্রাহিম খাঁ ত্রিপুরা আক্রমণ করেন। রাজমালায় বলা হয়েছে মোগল সম্রাটের কর হিসেবে হাতি দিতে অস্বীকার করায় এই আক্রমণ

হয়েছিল। ঐতিহাসিকরা মনে করেন মোগলদের আরাকান আক্রমণের প্রয়োজনেই ত্রিপুরা আক্রমণ করা হয়েছিল। মোগল বাহিনী দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে কুমিল্লা ও কৈলাগড় (আধুনিক কসবা) দিয়ে মধ্যরাত্রে উদয়পুর আক্রমণ করে রাজধানী দখল করে। মোগলদের দক্ষ গোলন্দাজ বাহিনী ও বন্দুকধারী সেনাদের সঙ্গে ত্রিপুরার সেনারা টিকতে পারেনি। রাজা যশোধর মাণিক্য বনাঞ্চলে পালিয়ে গিয়েও ধরা পড়ে বন্দী হন। রাজাকে সস্ত্রীক বন্দী করে সম্রাট জাহাঙ্গীরের কাছে পাঠানো হয়। সম্রাট বার্ষিক নিয়মিত কর প্রদানের বিনিময়ে রাজ্য ফিরিয়ে দেবার প্রস্তাব দেন। কিন্তু যশোধর মাণিক্য এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বাকী জীবন তীর্থস্থানে কাটিয়ে দেন। নজর বন্দী অবস্থায় বৃন্দাবনে ১৬২৩ খ্রীষ্টাব্দে রাজার মৃত্যু হয়।

## উদয়পুরে মোগল শাসন

উদয়পুরে আড়াই বছর মোগল শাসনের সময় ভয়ানক মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে বহু মোগল সৈন্য মারা যায়। অনেকে পালিয়ে যায়। মোগল দের রাজস্ব খাতায় 'সরকার উদয়পুর' নামে অধীনস্থ রাজস্ব এলাকার স্বীকৃতি পায়। এই সময় বহু সাধারণ মুসলমান স্থায়ী ভাবে ত্রিপুরায় বসবাস শুরু করে।

## কল্যাণ মাণিক্য

যশোধর মাণিক্যের নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যু হওয়ায় রাজ্যের নতুন রাজা হিসেবে মহামাণিক্যের কনিষ্ঠপুত্র গগনফার বংশধর কল্যাণ মাণিক্যকে সিংহাসনে বসান হয়। ১৬২৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজার অভিষেক মুদ্রা প্রচারিত হয়। কল্যাণ মাণিক্য বুদ্ধিমান ছিলেন। তিনি রাজকুমারদের ঠাকুর উপাধি চালু করেন। জ্যেষ্ঠপুত্র গোবিন্দ ঠাকুরকে যুবরাজ করেন।

সুবাদার সুজার আক্রমণকে প্রতিহত করেন। একজন পর্যটক লিখেছেন ত্রিপুরার পাহাড়ে গেরিলাযুদ্ধে মোগলদের প্রতিরোধ করা ত্রিপুরার সেনাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল।

রাজত্বের শেষ দিকে কল্যাণ মাণিক্য সুবাদার সুজার বশ্যতা স্বীকার করে কুমিল্লায় সুজার নামে একটি মসজিদ নির্মাণ করান। পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলি সুজানগর নামে পরিচিত হয়। রাজমালায় বলা হয়েছে গোবিন্দ মাণিক্য সুজার সঙ্গে মিত্রতার নিদর্শণ রূপে মসজিদটি নির্মাণ করান।

কল্যাণ মাণিক্য বহু নিস্কর ভূমি ব্রাহ্মণদের দান করেন। কসবায় কল্যাণসাগর দীঘি খনন করান। কসবার কালীবাড়ী বলে পরিচিত সিংহবাহিনী দশভুজা ভগবতীর মন্দিরটি

নির্মাণ করিয়ে মূর্তিটি প্রতিষ্ঠিত করেন। মূর্তির নিম্নভাগে একটি শিবলিঙ্গ থাকায় এটি কালী মূর্তি রূপে পরিচিত হয়েছে। খোয়াই মহকুমার কল্যাণপুর নগরটি ও তিনি স্থাপন করেন। সেখানে একটি প্রাসাদ ও কালী মন্দির নির্মাণ করিয়ে ছিলেন। ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে ৮০ বছর বয়সে তিনি প্রয়াত হন। তিনি ৩৪ বছর রাজত্ব করেন।

## গোবিন্দ মাণিক্য

কল্যাণ মাণিক্যের মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠপুত্র গোবিন্দ মাণিক্য রাজা হন। ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে নিজ নামে মুদ্রা প্রচার করেন। একই বছরে বৈমাত্রেয় ভাই নক্ষত্ররায় রাজাকে অস্বীকার করে নিজ নামে মুদ্রা প্রচার করেন। গোবিন্দ মাণিক্য মন্দিরে পশুবলি নিষিদ্ধ করায় চন্তাই নক্ষত্র রায়ের পক্ষ নেন। ছত্র মাণিক্য নাম নিয়ে নক্ষত্র রায় রাজা হন। দুই ভাইয়ের মধ্যে প্রচন্ড যুদ্ধে গোবিন্দ মাণিক্য পরাজিত হন।

## ছত্র মাণিক্য

ছত্র মাণিক্য ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসন দখল করে গোমতী নদীর তীরে এক প্রাসাদ নির্মাণ করান। কুমিল্লার কাছে ছত্রখিল এবং ব্রাহ্মণ বাড়িয়ার কাছে ছত্রপুর নামে দুটি গ্রাম ছত্র মাণিক্যের নামানুসারে নামকরন হয়। ছত্রসাগর নামে একটি দীঘিও খনন করান। মাত্র ছয় বছর রাজত্ব করার পর প্রয়াত হন।

গোবিন্দ মাণিক্য রিয়াংদের আশ্রয়ে থাকার সময় ঔরঙ্গজেবের ভয়ে সুজা আরাকানে পালিয়ে যাবার সময় গোবিন্দ মাণিক্যের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়। সুজা গোবিন্দ মাণিক্যকে একটি বহুমূল্য তরবারি উপহার দেন।

ত্রিপুরায় সুজা লুকিয়ে আছে খবর পেয়ে বাদশা ঔরঙ্গজেব ত্রিপুরার রাজাকে অবিলম্বে সুজাকে বাদশার হাতে তুলে দেবার দাবী জানিয়ে ফারসী ভাষায় একটি চিঠি লিখেন। সেই চিঠি সংরক্ষিত আছে।

রাজমালায় বলা হয়েছে ছত্রমাণিক্যের মৃত্যুর পর প্রজাদের অনুরোধে গোবিন্দ মাণিক্য দ্বিতীয়বার রাজ্যভার গ্রহণ করেন। কিন্তু অহোম রাজার দূতদের বর্ণনায় জানা যায়, আরাকান রাজার সাহায্যে গোবিন্দ মাণিক্য যুদ্ধ করে ছত্র মাণিক্যকে হত্যা করে সিংহাসন দখল করেন।

এই সময় রিয়াং বিদ্রোহ দেখা দেয়। নদীপথে বাঁশ নিয়ে আসার সময় গঙ্গাপূজ

উপলক্ষে ছড়িয়ে দেওয়া দড়িছিড়ে যাওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজকর্মচারীদের আচরণে বিক্ষোভ দেখা দেয়। বনজ সম্পদের উপর কর বৃদ্ধির কারণে আগে থেকেই ক্ষোভ ছিল। বিদ্রোহীদের দমন করতে রাজা একদল সৈন্য পাঠান। রিয়াং সর্দারদের বন্দী করে এনে মৃত্যুদন্ডের আদেশ দেওয়া হয়। এই আদেশ কার্যকর হলে ভীষণ বিদ্রোহ দেখা দিতে পারে আশংকা করে মহারাণী গুণবতী রাতের বেলায় সর্দারদের সঙ্গে দেখা করে তাদের বুঝিয়ে সুজিয়ে শান্ত করেন। নিজের স্তনদুগ্ধ পান করতে দিয়ে সর্দারদের নিজের সন্তানরূপে বরণ করে নেন। রিয়াং সর্দারদের আনুগত্য দেখে রাজা খুশী হয়ে তাদের মুক্ত করে দেন।

গোবিন্দ মাণিক্য দ্বিতীয় বার রাজা হয়ে সৎকাজে মনোযোগ দেন। গোমতীর বাঁধ নির্মাণ করে শস্য ক্ষেত্র রক্ষার ব্যবস্থা করেন। ভূবনেশ্বরী মন্দির নির্মাণ করেন। মহারাণী ও একটি বিষ্ণু মন্দির নির্মাণ করেন। কসবা থানার জাজিয়ারা গ্রামে গুণবতী দীঘি খনন করান। রাজভ্রাতা জগন্নাথ ঠাকুর উদয়পুরে জগন্নাথ দীঘি ও জগন্নাথ মন্দির নির্মাণ করান। এই সময়ে ভূমিদানের তাম্রলিপিও পাওয়া গেছে। হস্তীর বিনিময়ে লবণ আমদানী করেন। রাজমালার তৃতীয় খন্ড এই সময় রচিত হয়। ১৬৭৬ খ্রীঃ গোবিন্দ মাণিক্য প্রয়াত হন। রাজর্ষি উপন্যাস এবং বিসর্জন নাটকে রবীন্দ্র নাথ গোবিন্দ মাণিক্যকে অমর করে রেখেছেন। কিন্তু কবির রচনার সঙ্গে ইতিহাসের কিছু ব্যতিক্রম রয়েছে।

## রামদেব মানিক্য

পিতার মৃত্যুর পর ১৬৭৬ খ্রীষ্টাব্দে পুত্র রামদেব মাণিক্য রাজা হন। ঐ বছরেই অভিষেক মুদ্রা প্রচার করেন। ভ্রাতুষ্পুত্র দ্বারিকানাথ বিদ্রোহ করে নরেন্দ্র মাণিক্য নাম নিয়ে জমিদারদের সহায়তায় সিংহাসন দখল করেন। রামদেব মাণিক্য বাংলার নবাবের সাহায্যে রাজ্য উদ্ধার করেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র রত্নঠাকুরকে যুবরাজ করেন। বড় ঠাকুর নামে নতুন পদ সৃষ্টি করে দ্বিতীয়পুত্র দূর্জয় সিংহকে ঐ পদে নিয়োগ করেন। ১৬৮১ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দিরটির সংস্কার করান। ১৬৮৫ খ্রীষ্টাব্দের মুদ্রা থেকে মনে হয় রামদেব মাণিক্য ঐ বছর প্রয়াত হন। ত্রিপুরায় রামপুর নামে ৩৮ টা গ্রাম এবং রামনগর নামে সতেরটা গ্রাম আছে।

## ২য় রত্ন মানিক্য

পিতার মৃত্যুর পর যুবরাজ রত্নদেব ঠাকুর দ্বিতীয় রত্ন মাণিক্য নামে মাত্র সাত বছর বয়সে রাজা হন। ১৬৮৫ খ্রীষ্টাব্দে অভিষেক মুদ্রা প্রচার করেন। নাবালক রাজার মামা

বলিভীম নারায়ণ রাজার নামে রাজ্য শাসন করেন। রাজপরিবারের অনেককেই ষড়যন্ত্রের অভিযোগে হত্যা করেন। নবাবের রাজস্ব সময়মত না দেওয়ায় বলিরামকে নবাব বন্দী করেন। শেষ পর্যন্ত ইসলাম ধর্ম গ্রহন করে তিনি নিষ্কৃতি পান।

## নরেন্দ্র মানিক্য

১৬৯৩ খ্রীষ্টাব্দে বলিভীম নারায়ণ সরে যাওয়ার পর নরেন্দ্র মাণিক্য নবাবকে আরও বেশী রাজস্ব দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মোগলদের সহায়তায় রাজ্য দখল করেন এবং দ্বিতীয় রত্ন মাণিক্যকে নজর বন্দী করেন।

গোবিন্দ মাণিক্যের ভ্রাতা জগন্নাথ ঠাকুরের পুত্র চম্পকরায় মোগল সেনাপতি মীর খানের সাহায্য নিয়ে দুই বছরের মধ্যেই নরেন্দ্র মাণিক্যকে হটিয়ে দ্বিতীয় রত্ন মাণিক্যকে পুনঃরায় সিংহাসনে বসান এবং নিজে যুবরাজ হন। কিন্তু চম্পক রায়ের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ উঠায় রাজা তাকে হত্যা করে নিজের হাতে শাসন ভার নেন। তিনি বৈমাত্রেয় ভাই দুর্জয় সিংকে যুবরাজ ও ঘনশ্যামকে বড়ঠাকুর নিযুক্ত করেন। সর্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা চন্দ্রমণি ঠাকুরকে মোগল দরবারে রাজার প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। দ্বিতীয় রত্ন মাণিক্য মোগলদের বশ্যতা স্বীকার করে কর হিসাবে হস্তী প্রেরণ করেন। ফলে রাজ্যে শান্তি শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত হয়।

নরেন্দ্র মাণিক্য এবং দ্বিতীয় রত্ন মাণিক্যের প্রচারিত মুদ্রা পাওয়া গেছে। দ্বিতীয় রত্ন মাণিক্যের সময় আসামের রাজা রুদ্র সিংহ ত্রিপুরার সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনের জন্য রতন কন্দলী ও অর্জুন দাস বৈরাগীকে রাজদূত হিসেবে ত্রিপুরায় পাঠিয়েছিলেন। রুদ্রসিংহ মোগলদের বিরুদ্ধে হিন্দু রাজাদের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। ১৭০৯ থেকে ১৭১৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে আসামের রাজদূতেরা তিনবার গোপন পত্র আদান প্রদান করেন। তাদের লিখিত বিবরণ থেকে জানা যায় দ্বিতীয় রত্ন মাণিক্য কুমিল্লার জগন্নাথপুরে সতের রত্ন মন্দির নির্মাণ করান। বৈমাত্রেয় ভাই বড়ঠাকুর ঘনশ্যাম ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে দ্বিতীয় রত্ন মাণিক্যকে সিংহাসন চ্যুত করে নিজে মহেন্দ্র মাণিক্য নাম নিয়ে রাজা হন। রাজার অনুগতরা ঘনশ্যামের ষড়যন্ত্রের কথা রাজাকে যথাসময়ে জানিয়েছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় রত্নমাণিক্য তাদের কথা বিশ্বাস করেননি। আসামের দুইজন রাজদূতের উপস্থিতিতেই মোগল সেনাপতি মুরাদ বেগের সহায়তায় ঘনশ্যাম ঠাকুর রাজদরবারে এসে দ্বিতীয় রত্নমাণিক্যকে সিংহাসন থেকে সরিয়ে নিজেই সিংহাসনে বসেন। ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই মে এই ঘটনা ঘটেছিল। রাজাকে বন্দী করা হয় এবং রাজার ভগিনীপতি

দর্লভ নারায়ণকে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হয়। এক ধাত্রীর পরামর্শে দ্বিতীয় রত্নমাণিক্যকেও হত্যা করা হয়। গোমতীর তীরে রাজার চিতায় রানীরা সহমরণে যান। পঁচিশজন রাণীই নিঃসন্তান ছিলেন।

## মহেন্দ্র মাণিক্য

১৭১২ খ্রীষ্টাব্দে ঘনশ্যাম ঠাকুর মহেন্দ্র মাণিক্য নাম নিয়ে রাজা হন। তিনি আসামের দুজন রাজদূতের সঙ্গে পরামর্শ করে ত্রিপুরার রাজদূত হিসেবে অবিরাম নারায়ণকে আসামের রাজদরবারে প্রেরণ করেন। আসাম থেকে ত্রিপুরার রাজদূত ফিরে আসার আগেই রাজার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর কারণ জানা যায়নি।

## ২য় ধর্ম মাণিক্য

মহেন্দ্র মাণিক্যের মৃত্যুর পর যুবরাজ দুর্জয় সিংহ দ্বিতীয় ধর্ম মাণিক্য নাম নিয়ে ত্রিপুরার রাজা হন। ১৭১৪ খ্রীষ্টাব্দে নিজনামে মুদ্রা প্রচার করেন। এই সময় বাংলার নবাব ত্রিপুরা রাজ্যের সমতল ভূমি দখল করে মোগল জমিদার নিযুক্ত করেন। নুরনগর পরগনার জন্য বার্ষিক ২৫ হাজার টাকা কর ধার্য করেন। কিন্তু মোগল সম্রাট এই কর রেহাই করে দেন। সম্রাটের জন্য হাতি ধরার খরচ বাবত কর রেহাই দেওয়া হয়।

ইতিমধ্যে ছত্র মাণিক্যের এক বংশধর জগৎরাম মোগল রাজকর্মচারী মীর হাবিবের সাহায্যে চন্ডীগড় দুর্গ দখল করেন। নবাব সুজাউদ্দিন ত্রিপুরার সমতল ক্ষেত্রকে **চাকলা রোশনাবাদ** আখ্যা দিয়ে বার্ষিক ৯২,৯৯৩ টাকা কর ধার্য করে জগৎ মাণিক্যকে জমিদার হিসেবে স্বীকৃতি দেন। তাকে সাহায্য করার জন্য একদল মোগল সেনা কুমিল্লায় অবস্থান করে।

দ্বিতীয় ধর্ম মাণিক্য মুর্শিদাবাদে গিয়ে জগৎশেঠের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করে নবাবের সঙ্গে মীমাংসার ব্যবস্থা করেন। নবাব সুজাউদ্দিন ধর্মমাণিক্যকে মোগল অধীনে জমিদার হিসেবে চাকলা রোশনাবাদ রাজার জমিদারী বলে ঘোষণা দেন। ১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে এই ঘটনা ঘটে। পরবর্তী ত্রিশ বছরের মধ্যেই চাকলা রোশনাবাদ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে চলে যায়।

## মুকুন্দ মাণিক্য

দ্বিতীয় ধর্মমাণিক্যের মৃত্যুর পর রাজভ্রাতা চন্দ্রমণি ঠাকুর মুকুন্দ মাণিক্য নাম নিয়ে রাজা হন। জ্যেষ্ঠ পুত্র পাঁচকড়ি ঠাকুরকে মুর্শিদাবাদে নবাবের প্রতিনিধি হিসেবে রাখা হয়। রাজধানী উদয়পুরে হাজি মাসুম নামে এক ফৌজদার নিয়োগ করা হয়। ফৌজদারকে হত্যার এক ষড়যন্ত্রে রাজা যুক্ত আছেন সন্দেহ করে রাজাকে সস্ত্রীক বন্দী করা হয়। তীব্র হতাশায় মুকুন্দ মাণিক্য বিষপানে আত্মহত্যা করেন। এই সময় রাজপরিবারে সিংহাসন লাভের জন্য নানা ষড়যন্ত্র ও সংঘাত চলতে থাকে। ফলে ইংরেজ অধিকারের পূর্ব পর্যন্ত বিশ বছরের সঠিক ইতিহাস পাওয়া কঠিন।

## দ্বিতীয় জয় মাণিক্য ও ইন্দ্রমাণিক্য

মুকুন্দ মাণিক্যের মৃত্যুর পর সুবা রুদ্র মাণিক্য জয়মাণিক্য নামে সিংহাসনে বসেন। ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে নিজ নামে মুদ্রা প্রচার করেন। এদিকে মুকুন্দ মাণিক্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র পাঁচকড়ি ঠাকুর নবাব দরবারে রাজপ্রতিনিধি হিসেবে অবস্থান কালে সিংহাসনের দাবীদার হন। নবাবের সেনাদলের সাহায্যে উদয়পুর দখল করে ইন্দ্রমাণিক্য নাম নিয়ে রাজা হন। ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রা প্রচার করেন। জয়মাণিক্য মতাই পাহাড়ে আশ্রয় নিয়ে বারবার উদয়পুর আক্রমণ করে ইন্দ্রমাণিক্যকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেন। রাজ্যের জমিদার তালুকদাররা দুইভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। একপক্ষ ইন্দ্রমাণিক্যকে এবং অন্যপক্ষ জয়মাণিক্যকে সমর্থন করতে থাকে। রাজা ইন্দ্রমাণিক্য মোগল সেনার সাহায্য চাইলেন। কিন্তু জয়মাণিক্য গোপনে মোগল নায়েবকে ঘুষ দিয়ে বশীভূত করেন। মোগল নায়েব রাজস্ব অনাদায়ের দায়ে অভিযুক্ত করে ইন্দ্র মাণিক্যকে বন্দী করে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। জয় মাণিক্য রাজ্য ফিরে পান।

## দ্বিতীয় উদয়মাণিক্য

এই সময় ২য় ধর্ম মাণিক্যের পুত্র গঙ্গাধর ঠাকুর মোগল সেনার সাহায্য নিয়ে জয় মাণিক্যকে হটিয়ে ২য় উদয় মাণিক্য নাম নিয়ে রাজা হন।

রাজপরিবারে তীব্র আত্মকলহের সুযোগ নিয়ে মোগল রাজ কর্মচারীরা কিং মেকারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে ঘুষ,লুণ্ঠণ ও নজরানার মাধ্যমে লাভবান হতে থাকে। প্রতিবারের

আক্রমণে হাতি ও রাজস্বের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়।

মুর্শিদাবাদে বন্দী অবস্থায় ইন্দ্র মাণিক্যের মৃত্যু হয়। জয় মাণিক্য আবার মোগল সেনার সাহায্য নিয়ে ২য় উদয় মাণিক্যকে হটিয়ে ত্রিপুরার রাজা হন।

## বিজয় মাণিক্য ও কৃষ্ণমাণিক্য

জয় মাণিক্যের মৃত্যুর পর রাজভ্রাতা হরিমণি ঠাকুর বিজয় মাণিক্য নাম নিয়ে মোগল সনদ পেয়ে রাজা হন এই সময় সমসের গাজীর উত্থান শুরু হয়। নানা অরাজকতার মধ্যে বিজয় মাণিক্যের মৃত্যু হওয়ায় ইন্দ্র মাণিক্যের ভ্রাতা যুবরাজ কৃষ্ণমণি ঠাকুর রাজ্য ভার গ্রহন করেন। ইতিমধ্যে সমসের গাজী রাজধানী উদয়পুর দখল করে নেওয়ায় কৃষ্ণ মাণিক্য পুরাতন আগরতলায় বসবাস শুরু করেন। সমসের গাজীর মৃত্যুদন্ড কার্যকর হবার পর রাজধানী উদয়পুর থেকে পুরাতন আগরতলায় স্থানান্তর করেন।

## সমসের গাজী

রাজ পরিবারের আত্ম কলহের সুযোগ নিয়ে সমসের গাজী নামে দক্ষিণ শিকের এক ক্ষুদ্র জমিদারের তহশীলদার বিদ্রোহী হয়ে উঠেন। জমিদার কন্যাকে বিবাহ করতে চাইলে জমিদার তহশীলদারকে তাড়িয়ে দেন। সমসের গাজী গোপনে সেনা সংগ্রহ করে একদিন জমিদারকে আক্রমণ করে হত্যা করেন এবং জমিদার কন্যাকে বিবাহ করেন। রাজা ইন্দ্রমাণিক্য খবর পেয়ে বিদ্রোহীকে দমন করার জন্য একজন উজীরের নেতৃত্বে সেনা দল পাঠান। কিন্তু সমসের কে পরাজিত করতে না পেরে জমিদার হিসেবে স্বীকৃতি দেন।

কিছুদিন পরই নবাবের এক প্রতিনিধি হাজি হোসেনের সাহায্যে বেশী খাজনা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সমসের গাজী চাকলা রোশনা বাদের জমিদারী লাভ করেন। বিজয় মানিক্যের মৃত্যুর পর সমসের গাজী চাকলা রোশনা বাদের শাসনকর্তা হিসেবে নিজেকে ঘোষণা দেন এবং রাজকর দেওয়া বন্ধ করেন। যুবরাজ কৃষ্ণমনি ঠাকুর বার বার চেষ্টা করেও বিদ্রোহ দমনে ব্যর্থ হন।

সমসের গাজী প্রতিটি এলাকায় নিজের আত্মীয় স্বজনদের শাসনকর্তা রূপে নিযুক্ত করেন। গরীব প্রজাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য বাজারে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দাম নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। কেউ নিয়ম ভঙ্গ করলে শাস্তি পেত। এর ফলে সমসের গাজীর জনপ্রিয়তা বেড়ে যায়। নবাবের রাজস্ব দেবার জন্য বিত্তবান লোকদের বাড়ীতে ডাকাতি

শুরু না করলে সমসের গাজীকে ক্ষমতা থেকে হঠানো সম্ভব হতো না। তাহলে তখন থেকেই ত্রিপুরায় হিন্দু রাজাদের পরিবর্তে মুসলিম শাসন স্থায়ী হতো। এর আগে মোগল শাসকরা আড়াই বছর উদয়পুরে শাসন কার্য চালিয়ে মহামারীর আক্রমণে রাজ্য ত্যাগ করেছিল নতুবা যশোধর মানিক্যের সময় থেকেই মোগল শাসন প্রতিষ্ঠিত হতো।

সমসের গাজীর নির্দেশে নিত্য প্রয়োজনীয় কয়েকটি দ্রব্যের দাম ছিল নিম্নরূপ ঃ-

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| চাউল | = | প্রতিসের | = | এক পয়সা |
| লংকা | = | ” | = | এক পয়সা |
| গুড় | = | ” | = | দুই পয়সা |
| রসুন পিয়াজ | = | ” | = | দুই পয়সা |
| মসুর ডাল | = | ” | = | দুই পয়সা |
| মটর ডাল | = | ” | = | দুই পয়সা |
| সরিষার তেল | = | ” | = | তিন আনা |
| ঘী | = | ” | = | পাঁচ আনা ইত্যাদি। |

সমসের গাজী বার বছর দক্ষতার সঙ্গে শাসন কার্য চালিয়েছিলেন। বিভিন্ন স্থানে দুর্গ নির্মাণ করেন। আকবরের অনুকরণে হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায় থেকে রাজকর্মচারী নিয়োগ করেন। দরিদ্র প্রজাদের মধ্যে বিনামূল্যে জমি বন্টন করেন। ব্রাহ্মণদের মধ্যে ভূমিদানও করেছিলেন।

সমসের গাজীর ডাকাতির বিরুদ্ধে জমিদার ও ধনী ব্যক্তিরা ক্রমাগত নবাবের দরবারে অভিযোগ পেশ করতে থাকেন। এই সুযোগে যুবরাজ কৃষ্ণমণি নবাবকে তুষ্ট করার জন্য দরবার করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত নবাব একদল সৈন্য পাঠিয়ে সমসের গাজীকে বন্দী করেন। ডাকাতির অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় নবাব সমসের গাজীকে মৃত্যুদন্ড দেন। কামানের মুখে উড়িয়ে দেবার আদেশ কার্যকর হয়।

## কৃষ্ণ মাণিক্য

দীর্ঘ বার বছর পর ত্রিপুরার রাজবংশ নবাবের নির্দেশে রাজ্যের অধিকার ফিরে পান। যুবরাজ কৃষ্ণমণি ঠাকুর কৃষ্ণ মাণিক্য নাম নিয়ে সিংহাসনে বসেন। সমসের গাজীর শাসন কালে যুবরাজ কৃষ্ণমণি পুরাতন আগরতালায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। রাজা হবার

পর উদয়পুর থেকে পুরাতন আগরতলায় রাজধানী স্থানান্তর করেন।

১৭৬০ সালে কৃষ্ণ মাণিক্য রাজা হন। ঠিক এক বছর পরই চাকলা রোশনা বাদের রাজস্ব নিয়ে ফৌজদার রেজা খানের সঙ্গে তীব্র বিরোধ দেখা দেয়। এই সুযোগে ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ শে ফেব্রুয়ারী ইষ্টইন্ডিয়া কোম্পানীর গভর্নরের নির্দেশে লেফটেন্যান্ট মাথুস ২০০ ইংরেজ সেনা নিয়ে ত্রিপুরা অভিযান শুরু করেন।

আধুনিক অস্ত্র শিক্ষায় সুশিক্ষিত ও সুশৃংখল ইংরেজ বাহিনীর সঙ্গে রাজার পদাতিক কুকী সৈন্যদের যুদ্ধে জয়ী হবার সম্ভাবনা নেই দেখে রাজা কৃষ্ণ মাণিক্য আত্মসমর্পণ করেন। ত্রিপুরার সমতল ভূমি ইংরেজ অধিকারে গেল। ইংরেজ কালেক্টর ম্যারিয়টের সঙ্গে রাজার দুটি চুক্তি হয়। প্রথম চুক্তিতে বার্ষিক রাজস্ব একলক্ষ টাকা এবং যুদ্ধের খরচ বাবত ৪৫৪৬৩ টাকা রাজাকে দিতে হবে। দ্বিতীয় চুক্তিতে সেলামী বা নজরানা বাবত একলক্ষ এগারো হাজার একশ নব্বই টাকা ছয় আনা তিন পয়সা দিতে হবে। রাজার আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করে কয়েকটি কিস্তিতে অর্থ দেবার সুযোগ দেওয়া হয়। এই চুক্তি শুধু চাকলা রোশনা বাদের জমিদারী সম্পর্কিত। পার্বত্য ত্রিপুরার প্রতি ইংরেজদের কোন আকর্ষণ ছিলনা।

র‍্যালফ - লিক নামে একজন ইংরেজ কর্মচারী চাকলা রোশনা বাদের প্রথম রেসিডেন্ট নিযুক্ত হলেন। ত্রিপুরার জমিদারী ইংরেজের অধীনস্থ হল। ইংরেজের অভিযান শুরু হওয়ায় নবাবের ফৌজদার রেজাখান সেনাদল নিয়ে সরে যান।

এই সময় থেকে জমিদারী ও পার্বত্য ত্রিপুরার বিচার ব্যবস্থা আলাদা হয়ে যায়।

কৃষ্ণ মাণিক্যের রাজত্বের শেষ সময় রাজস্ব আদায় নিয়ে ইংরেজ রেসিডেন্ট লিক সাহেবের সঙ্গে বিরোধ সৃষ্টি হয়। ফলে ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে দশ বছরের জন্য জমিদারীর ভার সরাসরি ইংরেজ সরকারের নিয়ন্ত্রণে নেওয়া হয়। রাজস্ব আদায়ের পর রাজকর বাদ দিয়ে রাজার শাসন ব্যয় ও রাজপরিবারের ভরণ পোষনের অর্থ রাজাকে দেবার ব্যবস্থা হয়। ঠিক দশ বছর পর ১৭৯২ সালে জমিদারী ফেরত দেওয়া হয়।

কৃষ্ণ মাণিক্যের রাজত্ব কালে কুকীরা বিদ্রোহ করে। রাজার সৈন্যরা সেই বিদ্রোহ দমন করেন। উদয়পুর থেকে চতুর্দ্দশ দেবতার বিগ্রহ পুরাতন আগরতলায় এনে প্রতিষ্ঠিত করেন। কুমিল্লার সতের রত্নমন্দির নির্মাণ সম্পূর্ণ করেন। ২৩ বছর রাজত্বের পর ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রয়াত হন।

## মহারাণী জাহ্নবী দেবী

মহারাজ কৃষ্ণ মাণিক্য নি:সন্তান হওয়ায় সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে বিরোধ দেখা দেয়। কৃষ্ণ মাণিক্যের ভ্রাতুষ্পুত্র রাজধর মাণিক্যকে রাজা ও রাণী উত্তরাধিকারী হিসেবে নির্বাচন করেছিলেন। রেসিডেন্ট লিক সাহেব মহারাণী জাহ্নবী দেবীর সঙ্গে পরামর্শ করে রাজধর মাণিক্যকে রাজা এবং অন্য দাবীদার দূর্গামণিকে যুবরাজ করার সুপারিশ অনুমোদনের জন্য গভর্ণরের কাছে পাঠান। অনুমোদন পেতে দু বছর দেরী হয়। এই সময় মহারাণী শাসন কার্য চালান। কুমিল্লার রাণীর দীঘি এই সময় খনন করা হয়। রাধানগরে রাধামাধব মন্দিরটিও তিনি নির্মাণ করান।

## দ্বিতীয় রাজধর মাণিক্য

১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ সরকারেব অনুমোদন লাভের পর রাজধর মাণিক্য রাজা হন। দুর্গামনিকে যুবরাজ করা হয়।

রাজধর মাণিক্য মণিপুরের রাজকন্যাকে বিবাহ করেন। এটাই ত্রিপুরার সঙ্গে মণিপুব রাজবংশের প্রথম বৈবাহিক সম্পর্ক। এর ফলে দুই রাজ্যের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

চাকলা রোশনা বাদের জমিদারীতে ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনুযায়ী ত্রিপুরার রাজাদের স্থায়ী মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময় ইংরেজ রেসিডেন্ট পদ বিলুপ্ত করে রোশনাবাদ অঞ্চলকে নিয়ে ত্রিপুরা জেলা গঠ ন করা হয়। ত্রিপুরা রাজ্যের নাম হয় পার্বত্য ত্রিপুরা। জেলা শাসনের জন্য একজন ইংরেজ কালেক্টার নিয়োগ করা হয়।

রাজধর মাণিক্যের বিরুদ্ধে বিজয় মাণিক্যের পুত্র রামচন্দ্র ঠাকুর রিয়াং প্রজাদের প্ররোচিত করে বিদ্রোহ ঘটানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। শেষ দিকে রাজধর মাণিক্য ঈশ্বর উপাসনায় সময় কাটান। ১৮০৪ সালে তিনি প্রয়াত হন। তিনি ১৯ বছর রাজত্ব করেন।

## দুর্গামাণিক্য

রাজধর মাণিক্য দুর্গামাণিক্যকে যুবরাজ নিযুক্ত করলেও নিজ পুত্র রামগঙ্গার হাতে শাসনভার দিয়ে যান। পিতার মৃত্যুর পর যুবরাজের দাবীকে উপেক্ষা করেই রামগঙ্গা মাণিক্য নাম নিয়ে সিংহাসনে বসেন। এর ফলে রাজ্যে বিশৃংখলা দেখা দেয়। রাজ পরিবার

দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। দুর্গামণি কুকীদের সাহয্যে যুদ্ধের উদ্যোগ নেন। গভর্নর জেনারেল দুর্গামণিকে দেওয়ানী আদালতের আশ্রয় নিতে পরামর্শ দেন। ১৮০৮ সালে কুকী আক্রমণের হাত থেকে ইংরেজ সেনারা রাজাকে সপরিবারে রক্ষা করেন।

আদালতে দুর্গামণির দাবী স্বীকৃত হওয়ায় তিনি দুর্গা মাণিক্য নাম নিয়ে রাজা হন। এই সময় থেকে রাজাদের অভিষেক ক্রিয়ার সময় ইংরেজ সরকারকে নজরানা দেওয়া বাধ্যতা মূলক করা হয়। ১৮১৩ সালে তীর্থ ভ্রমণে গিয়ে পাটনায় মটর দুর্ঘটনায় দুর্গমাণিক্য মারা যান।

## রামগঙ্গা মাণিক্য

দুর্গামাণিক্যের পুত্র সন্তান না থাকায় ইংরেজ সরকার বড়ঠাকুর রামগঙ্গা মাণিক্যকে রাজপদে অনুমোদন দেয়। রামগঙ্গা মাণিক্য আবার রাজা হন। অভিষেক দেরীতে হয় কারণ সিংহাসনের দাবীতে শম্ভুচন্দ্র ঠাকুর মামলা করেন। দাবী ছিল দুর্গা মাণিক্য শম্ভুচন্দ্র ঠাকুরকে যুবরাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। আদালতে মামলা গ্রাহ্য হয়নি। শম্ভুচন্দ্র বিদ্রোহ করে রাজধানী আক্রমণ করেন। বারবার আক্রমণ করেও সফল হতে পারেন নি।

১৮২২ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজ সরকার ত্রিপুরা ও শ্রীহট্টের সীমানা নির্ধারণ করেন। এতে রাজা ক্ষুব্ধ হন। কিন্তু তাতে কোন ফল হয়নি।

রামগঙ্গা মাণিক্য পুরীর মন্দিরে গোপীনাথ মন্দির নির্মাণ করে দেবোত্তর সম্পত্তি দান করেন। বৃন্দাবনে একটি কুঞ্জ নির্মাণ করেন। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ ই নভেম্বর তিনি প্রয়াত হন।

## কাশী চন্দ্র মাণিক্য

১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে রামগঙ্গা মাণিক্যের মৃত্যুর পর কনিষ্ঠ ভ্রাতা কাশীচন্দ্র মাণিক্য ত্রিপুরার রাজা হন। এদিকে শম্ভুচন্দ্র ঠাকুর সিংহাসনের দাবীতে বার্ষিক ২৫ হাজার টাকা কর দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ইংরেজ সরকারের কাছে এক আবেদন পাঠান। ইংরেজ সরকার পার্বত্য ত্রিপুরার ব্যাপারে কোন আগ্রহ না দেখিয়ে আবেদন অগ্রাহ্য করেন। কাশীচন্দ্র মাণিক্য শম্ভুচন্দ্রকে শান্ত করার জন্য মাসিক বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করেন।

নিয়মিত রাজস্ব আদায় ও জমিদারী পরিচালনার জন্য কাশীচন্দ্র মাণিক্য কোরজন নামে এক ইংরেজ ম্যানেজার নিযুক্ত করেন। সীমান্ত পুনর্গঠনের নামে এই সময় ইংরেজ সরকার কাছাড় জেলার কয়েকশ মাইল সমতল ভূমি ত্রিপুরা থেকে আলাদা করে নেয়।

মণিপুর সীমান্তে ও কিছু অংশে ত্রিপুরার দাবী অগ্রাহ্য করা হয়।

কাশীচন্দ্র মাণিক্য মণিপুর রাজকন্যা কুটিলাক্ষী দেবীকে বিবাহ করেন। পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র ঠাকুরকে বড়ঠাকুর করে নিজভ্রাতা রামগঙ্গা মাণিক্যের পুত্র কৃষ্ণ কিশোর মাণিক্যকে যুবরাজ নিযুক্ত করেন। বড় ঠাকুর কৃষ্ণচন্দ্র পিতার জীবিত কালেই মারা যান।

শেষ জীবনে যুবরাজ কৃষ্ণ কিশোর মাণিক্যের সঙ্গে মতবিরোধ হওয়ায় কাশীচন্দ্র মাণিক্য উদয়পুরে বসবাস শুরু করেন। সেখানে ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রয়াত হন।

## কৃষ্ণ কিশোর মাণিক্য

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য ইংরেজ সরকারের অনুমোদন পেয়ে রাজা হন। তখনই আড়াই বছর বয়স্ক পুত্র ঈশান চন্দ্রকে যুবরাজ নিযুক্ত করেন। পুরাতন আগরতলা থেকে বর্তমান আগরতলায় রাজধানী স্থানান্তর করেন। এখানে শিকারের সুবিধার জন্যই নতুন রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। তখন আগরতলায় পশুশিকারের উপযোগী বনাঞ্চল ছিল। কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য আসামের রাজকন্যা রত্নমালা এবং মণিপুরের তিন রাজকন্যা চন্দ্র কলা, অখিলেশ্বরী এবং বিধুকলাকে পর পর বিবাহ করেন। তাছাড়াও ত্রিপুরী ও মণিপুরী অনেক উপপত্নী ছিল। ১৪ জন পুত্র ও ১৫ জন কন্যার পিতা হন কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য।

বিলাসী রাজার অপব্যয় নিয়ে উজীরের সঙ্গে মতভেদ ও কলহ দেখা দিয়েছিল। শিকার প্রিয় রাজা একদিন বজ্রপাতে মারা যান। তিনি ২০ বছর রাজত্ব করেন।

## ঈশান চন্দ্র মাণিক্য

১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে পিতার মৃত্যুর পর যুবরাজ ঈশান চন্দ্র মাণিক্য রাজা হন। ১২৫ টি স্বর্ণমুদ্রা নজরানা দাবী করে ইংরেজ সরকার। শেষ পর্যন্ত ১১১ টি স্বর্ণ মুদ্রা নজরানা দিতে হয়।

১১ লক্ষ টাকা ঋণভার নিয়ে অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ঋণভার থেকে মুক্তির জন্য গুরু বিপিন বিহারী গোস্বামীর হাতে শাসন কার্য পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়।

১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের সময় একদল ভারতীয় বিদ্রোহী সেনা ত্রিপুরায় প্রবেশ করে। তাদের একটা অংশ কাছাড়ে চলে যায় আরেকটি অংশ রাজ্যে আশ্রয় নেয়। সিপাহী বিদ্রোহের প্রতি রাজার সমর্থন আছে বলে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ সন্দেহ করতে থাকে। রাজা ভীত হয়ে বিদ্রোহী সিপাহীদের গ্রেপ্তার করে ইংরেজদের হাতে তুলে দেন। তাদের

সকলের ফাঁসি হয়। ঈশানচন্দ্র মাণিক্যের রাজত্ব কালেই তিপ্রা বিদ্রোহ এবং কুকী উপদ্রব হয়। রাজার আট ভাই গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়।

মাত্র ৩৪ বছর বয়সে ঈশাণ চন্দ্র মাণিক্য মারা যান। নিজের পুত্ররা নাবালক এবং ভ্রাতারা দুর্দান্ত হওয়ায় কাউকে যুবরাজ করে যাননি। গুরু বিপিন চন্দ্র বিপদ বুঝে অমাত্যবর্গের সহযোগিতায় এক দলিল তৈরী করেন। তাতে রাজার ভ্রাতা বীরচন্দ্র ঠাকুরকে যুবরাজ এবং রাজপুত্র ব্রজেন্দ্র চন্দ্রকে বড় ঠাকুর ও দ্বিতীয় রাজপুত্র নবদ্বীপ চন্দ্রকে কর্তাপদে নিযুক্ত করার কথা উল্লেখ করা হয়।

রাজার অন্য দুই ভ্রাতা চক্রধ্বজ এবং নীলকৃষ্ণ এই দলিল মিথ্যা দাবী করে মামলা করেন। দুটি পৃথক মামলায় নীলকৃষ্ণ দাবী করেন চক্রধ্বজ রাজার অবৈধ সন্তান কাজেই বিবাহিতা রাণীদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ সন্তান হিসেবে নীলকৃষ্ণই সিংহাসনের প্রকৃত অধিকারী। ইংরেজ আদালতে রাজ্যের উত্তরাধিকার প্রশ্নে বহু গোপন দলিল ও কেচ্ছা প্রকাশ পায়।

## আধুনিক যুগ

উত্তরাধিকারের মামলা চলাকালীন সময়ে দলিল অনুযায়ী বীরচন্দ্র মাণিক্য সাময়িক রাজা হন। মামলায় ঠাকুর লোকদের সাক্ষী জরুরী হয়ে পড়ে। সবাই দাবী করে গুরু বিপিন বিহারীকে বিদায় না করলে কেউ সাক্ষী দিবে না। বীরচন্দ্র মাণিক্য বাধ্য হয়ে গুরুকে বন্দী করে ঠাকুর ব্রজেন্দ্র মোহনকে রাজ্যের শাসন কার্য পরিচালনার দায়িত্ব দেন।



মহারাজ বীবচন্দ্রমাণিক্য

স্থানীয় আদালত নীলকৃষ্ণের দাবীকে মেনে রায় দেন। নীলকৃষ্ণকে রাজ্যের প্রকৃত অধিকারী বলে ঘোষণা দেয়া হয়। কিন্তু অধিকাংশ রাণী এবং ঠাকুর লোকদের বেশীর ভাগ বীরচন্দ্র মাণিক্যের পক্ষে সাক্ষী দেওয়ায় হাইকোর্ট বীরচন্দ্রকেই সিংহাসনের অধিকারী বলে ঘোষণা দেন।

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই মার্চ বীরচন্দ্র মাণিক্যের অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ১২৫ টি স্বর্ণমুদ্রা ইংরেজ সরকারকে নজরানা দিতে হয়। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ সরকার বীরচন্দ্রকে মহারাজা উপাধিতে ভূষিত করেন।

ইংরেজ সরকার ভারতীয় সামন্ত রাজাদের নামে এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে। তাতে ত্রিপুরার রাজাকে ইংরেজ সরকারের অধীনস্থ সামন্ত রাজা হিসাবে উল্লেখ করা হয়। স্বাধীন ত্রিপুরা তখন থেকে পার্বত্য ত্রিপুরা নামে পরিচিত ও লিখিত হয়। রাজার অভিষেক কালে নজরানা আদায় করা হতো। এবারের ঘোষণায় বলা হয় যে রাজার মৃত্যুর পর নিজের পুত্র রাজা হলে রাজ্যের বার্ষিক রাজস্বের অর্দ্ধেক এবং পুত্র ছাড়া অন্য কেউ রাজা হলে এক বছরের সম্পূর্ণ রাজস্ব নজরানা হিসেবে দিতে হবে।

অভিষেকের পর বীরচন্দ্র মাণিক্য আমোদ প্রমোদে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। গুরু বিপিন বিহারী বন্দী অবস্থায় মারা যান। সচীব ব্রজমোহন ঠাকুর এবং দেওয়ান গুরুদাসকে পদচ্যুত করা হয়। বীরচন্দ্র মাণিক্যের হিতৈষীরা একে একে বিতাড়িত হওয়ায় ইংরেজ সরকারের দাবী অনুযায়ী প্রয়োজনীয় দলিল পত্র পেশ করা যায়নি।

ঈশান চন্দ্রের রাণীরা আশা করেছিলেন নবদ্বীপ চন্দ্র ঠাকুরকে যুবরাজ করা হবে। কিন্তু বীরচন্দ্র মাণিক্যের নির্দেশে নবদ্বীপ চন্দ্রকে বন্দী করা হয় এবং পিতার দেওয়া জায়গীর নবদ্বীপচন্দ্রনগর বাজেয়াপ্ত করা হয়। ভ্রাতুষ্পুত্র নবদ্বীপ চন্দ্রকে বঞ্চিত করে বীরচন্দ্র মাণিক্য নিজ পুত্র রাধাকিশোরকে যুবরাজ পদে অভিষিক্ত করেন।

রাজ্যের অস্থির অবস্থার সুযোগে লুসাই কুকীরা উপদ্রব শুরু করে। তাদের দমন ও রাজকার্য পর্যবেক্ষণের জন্য ত্রিপুরায় প্রথম একজন ইংরেজ পলিটিক্যাল এজেন্ট নিযুক্ত হন। এতে রাজা ক্ষুব্ধ হলেও প্রজারা উপকৃত হয়েছে। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে এ ডব্লিও বি. পাওয়ার প্রথম পলিটিক্যাল এজেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। কাছাড় ও চট্টগ্রাম থেকে প্রচুর সৈন্য এনে কুকীদের দমন করা হয়।

এই সময় থেকে ত্রিপুরায় আধুনিক যুগের সূত্রপাত হয়। ইংরেজ সরকারের নির্দেশে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন তৈরী হয়। এটাই ত্রিপুরায় প্রথম লিখিত আইন। এতকাল পর্যন্ত রাজার কথাই ছিল আইন।

পূর্ব সীমান্তে রাজ্যের সীমানা নির্দিষ্ট করার জন্য পলিটিক্যাল এজেন্ট কঠোর পরিশ্রম করেন। ফলে কুকী উপদ্রব দমনের সুবিধা হয়।

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ অনুকরণে আদালত গঠন করা হয়। প্রশাসন, শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারের জন্য রাজ্যের বিভিন্ন পদে অভিজ্ঞ অবসর প্রাপ্ত ব্রিটিশ রাজকর্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়।

১৮৭৩ সালে নীলমণি দাস ত্রিপুরার দেওয়ান নিযুক্ত হন। তিনি ব্রিটিশ অনুকরণে আবগারী বিভাগ-স্টাম্প প্রচলন এবং দলিল রেজেষ্ট্রী করার নিয়মাবলী চালু করেন।

১৮৭৬ সালে ত্রিপুরায় প্রথম আদালতের রায়ে নর হত্যাকারীকে ফাঁসি দেওয়া হয়। পার্বত্য প্রজাদের জন্য প্রচলিত পার্বত্য আদালত বাতিল করে সকলের জন্য একই বিচার ব্যবস্থা চালু করা হয়। প্রধান বিচার পতি পদ সৃষ্টি করে যুবরাজকে খাস আপীল আদালতের প্রধান বিচারপতি মনোনীত করা হয়।

প্রজাস্বত্ব আইন,কর্মচারী সম্বন্ধীয় আইন এবং নাবালকের সম্পত্তি রক্ষা আইন তৈরী করা হয়। রাজ্যের আয় ব্যয়ের জন্য বাজেট প্রথা চালু করা হয়। প্রশসনিক সুবিধার জন্য রাজ্যকে উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ তিনটি বিভাগে ভাগ করা হয়।

১৮৭১ সালে আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি স্থাপন করা হয়। প্রথম চেয়ারম্যান হন ইংরেজ পলিটিক্যাল এজেন্ট। সারা ভারতের সঙ্গে ত্রিপুরাতেও ১৮৭২ সালে লোকগণনা শুরু হয়।

১৮৭৫ সালে স্থাপিত হয় রাজ্যের প্রথম পোষ্ট অফিস। ১৮৯০ সালে ইংবেজী শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় আগরতলা সরকারী উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়। ১৯০৪ সালে এটি উমাকান্ত একাডেমী নামে পরিচিত হয়।

দেওয়ান নীলকান্ত বাবুর পরামর্শে উকীলদের পরীক্ষা ব্যবস্থা চালু হয়। এভাবে ত্রিপুবায় আধুনিক যুগের আর্বিভাব ঘটায় মহারাজার চাটুকারগণ বিরক্ত হয়ে নীলকান্ত বাবুকে বিতাড়নের পরামর্শ দেন। দেওয়ান নীলকান্তবাবু বিদায় নেবার পর ১৮৯০ সালে উমাকান্ত দাসকে মন্ত্রীরূপে গ্রহণ করেন। ইংরেজ কর্তৃপক্ষের চাপে মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য রাজ্যে দাসপ্রথা এবং সতীদাহ প্রথা বন্ধ করতে বাধ্য হন। এই সময়ের সহকারী পলিটিক্যাল এজেন্টের রিপোর্ট থেকে জানা যায় মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য সতীদাহ প্রথা বন্ধের বিরোধী ছিলেন। কারণ তিনি মনে করতেন এই প্রথা বন্ধ হলে হিন্দু ধর্মের উপর আঘাত হানা হবে।

ভারতে ১৮৪৩ সালে ক্রীতদাস প্রথা এবং ১৮২৯ সালে সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ হয়। কিন্তু ত্রিপুরায় বার বার নির্দেশ প্রঠানো সত্ত্বেও মহারাজা নানা অজুহাতে তা কার্যকর করা থেকে বিরত থাকেন। ফলে ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ সরকারের কঠোর মনোভাবের চিঠি পেয়ে ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ২২ শে মে এক ঘোষণা বলে সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করেন। দাস প্রথাও নিষিদ্ধ হয়। ত্রিপুরায় ক্রীতদাস কেনাবেচা প্রচলিত ছিল।

মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য খুবই বুদ্ধিমান ছিলেন। সঙ্গীত ও কাব্য চর্চায় অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। ভারতের বিখ্যাত সঙ্গীতাচার্যদের নিয়ে বহুবার আসর বসিয়েছেন। বেশ কয়েকটি কাব্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। রাজকন্যা অনঙ্গমোহিনী দেবীও কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। মহারাণী ভানুমতির অকাল মৃত্যুতে মহারাজার হৃদয়

যখন ভারাক্রান্ত ঠিক তখনই রবীন্দ্রনাথের ভগ্ন-হৃদয় কাব্যগ্রন্থ খানি পেয়ে মহারাজা মুগ্ধ হন। রবীন্দ্রনাথকে কবি স্বীকৃতি দিয়ে বিশেষ দূত পাঠান। তখনো মহারাজা জানতেন না যে রবীন্দ্রনাথ তখন মাত্র ২২ বছরের যুবক। পরবর্তী সময়ে কবিকে বন্ধুর মত বরণ করে নিয়েছিলেন। কলকাতা ও কার্শিয়াং - এ বিশ্রাম করার সময় রবীন্দ্রনাথকে সঙ্গে নিয়ে কাব্য চর্চা করতেন। ১৮৯৬ সালে কলকাতায় মহারাজার মৃত্যু হয়। কলিকাতার কালিঘাটে বীরচন্দ্রের স্মৃতিসৌধ নির্মিত হয়েছে।

মন্ত্রী উমাকান্তের চেষ্টায় রাজ্য আধুনিক রূপ নিতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে তাকে সরাবার ষড়যন্ত্রও চলতে থাকে।

এই সময় থেকে বিংশ শতাব্দীর তিন মহারাজার রাজত্ব কালে রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরার রাজকার্য পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শদান ও সারাদেশের গুণীজনদের সঙ্গে মহারাজাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ সৃষ্টি করে রাজ্যের গৌরব বৃদ্ধিতে সাহায্য করেন। এই সময়ে ত্রিপুরায় দুই বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব কর্ণেল মহিমচন্দ্র এবং কুমার ব্রজেন্দ্র কিশোর রবীন্দ্রনাথের স্নেহ ধন্য ছিলেন। ত্রিপুরায় রাজকার্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের জন্য নিয়মিত পরামর্শ ও উৎসাহ দান করে বহু জটিল পরিস্থিতিতে সমাধানের পথ করে দিয়েছেন।

# বিংশ শতাব্দীর তিন মহারাজা

মাণিক্য রাজবংশের শেষ তিন জন মহারাজা (১) রাধাকিশোর মাণিক্য ,(২) বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্য এবং বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত রাজত্ব করেছেন। শেষের দুজন মহারাজা অল্পবয়সে মারা না গেলে শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত দুজন রাজার রাজাত্বকালেই রাজন্য যুগের অবসান হতো। বীর বিক্রমের রাজত্ব করার সুযোগ হয়তো ঘটতো না।

## রাধাকিশোর মাণিক্য

ঈশানচন্দ্র মাণিক্যের যে ইচ্ছাপত্রকে জাল প্রমাণ করার জন্য মামলা হয়েছিল সেই দলিল বলে মামলায় জয়লাভ করে বীরচন্দ্র মাণিক্য রাজা হন। ঐ ইচ্ছাপত্রে ঈশানচন্দ্র মাণিক্যের ভ্রাতা বীরচন্দ্রকে যুবরাজ এবং নিজের জ্যেষ্ঠপুত্র ব্রজেন্দ্র চন্দ্রকে বড়ঠাকুর ও দ্বিতীয় পুত্র নবদ্বীপ চন্দ্রকে কর্তাপদে নিয়োগের কথা উল্লেখ ছিল। কিন্তু রাজা হবার পর বীরচন্দ্র মাণিক্য নিজপুত্র রাধাকিশোরকে যুবরাজ পদে নিযুক্ত করেন। ঈশানচন্দ্র মাণিক্যের পুত্র নবদ্বীপচন্দ্র বঞ্চিত হন। ১৮৯৬ সালে পিতার মৃত্যুর পর রাধা কিশোর মাণিক্য রাজা হন। নিজ পুত্র বীরেন্দ্র কিশোরকে যুবরাজ পদে অভিষিক্ত করেন। রাধাকিশোরের



মহারাজ রাধাকিশোর মানিক্য

বৈমাত্রেয় ভাই সমরেন্দ্র চন্দ্র আদালতে মামলা করে সিংহাসনের দাবীদার হন। কিন্তু আদালত এই দাবী অগ্রাহ্য করে। সমরেন্দ্র ছিলেন মহারাণী ভানুমতির পুত্র। ভানুমতি জীবিত থাকলে তিনিই হয়তো রাজা হতেন। কিন্তু তিনি ছিলেন অত্যন্ত বদমেজাজি ও অসংযমী।

যুবরাজ অবস্থায় রাধাকিশোর বিচার, রাজস্ব, পুলিশ, শিক্ষা ও চিকিৎসা বিভাগ পরিচালনা করেন। রাজা হবার পর প্রশাসনকে গতিশীল করার জন্য বিলনীয়া ও উদয়পুর বিভাগ দুটি সৃষ্টি করেন। ১৮৯৮ সালে কার্যনির্বাহক সভা গঠন করেন। আইন প্রনয়নের জন্য ব্যবস্থাপক সভা গঠন করেন। রাজস্ব ও বিচার বিভাগের পুনর্বিন্যাস ঘটান হয়। কৃষি ও শিল্পের জন্য পৃথক বিভাগ খোলা হয়। বাজেটের ক্ষেত্রে রাজার ব্যক্তিগত ও রাজ্যগত দুটি বাজেট তৈরী করা হয়। জঙ্গল আবাদে উৎসাহ দেওয়া হয়। সারা রাজ্যে প্রথম জরীপের ব্যবস্থা করা হয়।

১৯০১ সালে রাজ্যে দুর্ভিক্ষ দেখা দেওয়ায় রাধাকিশোর প্রজাদের মধ্যে বিনামূল্যে ধান চাউল বিতরণ করেন। পার্বত্য প্রজাদের খাজনা মকুব করেন। চিকিৎসার সুযোগ বৃদ্ধির জন্য ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হাসপাতাল স্থাপন করেন।



উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ

১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পে রাজপ্রাসাদ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ নির্মাণ করেন। ১৯০১ সালে প্রাসাদ নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়। এই সময় প্রায় তিনবছর মহারাজা বাঁশ ছনের তৈরী ঘরে বসবাস করেন।

রাধাকিশোর মাণিক্য বাংলা ভাসা ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি নিজেকে

হিন্দু বাঙ্গালী রাজা বলে পরিচয় দিতেন। সারা বাংলায় যখন ফারসী ভাষায় রাজকার্য চলছে তখন থেকে ত্রিপুরার রাজ ভাষা বাংলা। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাওয়ায় বাংলার বহুগুনী জনের সঙ্গে মহারাজার পরিচয় ঘটে।

বহু বাঙ্গালী কবি ও বিজ্ঞানী মহারাজার বৃত্তি ও সাহায্য লাভ করে উপকৃত হন।

বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের প্রতি মহারাজার সহানুভূতি ছিল। এজন্য ইংরেজ সরকার কিছু কালের জন্য মহারাজা উপাধি কেড়ে নেন।

রাধাকিশোরের বার বছরের রাজত্ব কালে রবীন্দ্রনাথ পাঁচবার আগরতলায় আসেন। কবির আগমনে আগরতলায় সাংস্কৃতিক অঙ্গনে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। শান্তিনিকেতনে আশ্রম স্কুলের জন্য নিয়মিত সাহায্য পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। রাধাকিশোর ত্রিপুরা থেকে ছাত্রবৃত্তি দিয়ে বহু ছাত্র শান্তিনিকেতনে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। কবি-বন্ধু বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্রকে লন্ডনে পাঠাবার জন্য অর্থ সাহায্য করেন। কবি হেমচন্দ্র শেষ বয়সে অন্ধ হয়ে যাওয়ায় কবিকে মাসিক বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করেন।

পারিষদবর্গকে প্রশ্রয় দেবার ফলে রাজশক্তি দুর্বল হচ্ছে বলে কবি মহারাজাকে যথাসময়ে সতর্ক করেন। সারাভারতের বিশিষ্ট দেশীয় রাজাদের সঙ্গে কবি মহারাজাকে পরিচয় করিয়ে দেন। কলকাতা ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী হওয়ায় এবং গর্ভনর জেনারেলের সঙ্গে প্রিন্স দ্বারকানাথের গভীর বন্ধুত্ব থাকায় ত্রিপুরার রাজপরিবারকে কঠিন সংকট থেকে মুক্ত করেছিলেন কয়েকবার কৃষ্ণ কিশোর মাণিক্যের সময়। এই সূত্রে ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে আত্মীয়তার মত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে সারনাথে এক মটর দুর্ঘটনায় মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্যের অকাল মৃত্যু হয়। শিক্ষা প্রসারের যে কাজে মহারাজা ব্রতী হয়েছিলেন তা হঠাৎ বাধাপ্রাপ্ত হয়।

## বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্য

পিতা রাধাকিশোর মাণিক্যের আকস্মিক মৃত্যুর পর যুবরাজ বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্য রাজা হন। তিনি মণিপুরী পাটরাণী তুলসীবতীর পুত্র ছিলেন - বীরেন্দ্রকিশোর। অমাত্য সভাকে পুর্নগঠিত করে ষ্টেট কাউন্সিল গঠন করেন। শাসন পরিষদ এবং আপীল আদালত গঠন করেন। যোগ্য প্রশাসক নিয়োগের জন্য সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার প্রচলন করেন। তিনি প্রথম ত্রিপুরায় চীপ সেক্রেটারীপদ সৃষ্টি করেন। কৃষি ও রেশম শিল্পের উন্নতির জন্য দুটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করেন। ত্রিপুরায় খনিজ তেল অনুসন্ধানের জন্য বার্মা অয়েল কোম্পানীকে লাইসেন্স দেন। ত্রিপুরায় চল্লিশটি চা-বাগান গড়ে তুলে রাজস্ব বৃদ্ধি করেন।

বীরেন্দ্র কিশোর ছিলেন দক্ষ চিত্রশিল্পী। কুঞ্জবন প্রাসাদ, লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির, দুর্গাবাড়ী ও লালমহল তিনি নির্মাণ করান। রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি উপলক্ষে বীরেন্দ্র কিশোর এক অভিনন্দন সভার আয়োজন করেন। ১৯১৯ সালে মহারাজার আমন্ত্রনে রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরায় আসেন।


মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্য

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বীরেন্দ্র কিশোর অর্থ ও সৈন্য দিয়ে বৃটিশ সরকারকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেন। রাজ্যের অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনেই ইংরেজ সরকারের সব চাহিদা পূরণ করতে হয়েছে। বিশ্বযুদ্ধে ত্রিপুরার কোন স্বার্থ ছিলনা।

১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র ৪০ বছর বয়সে মহারাজার অকাল মৃত্যু হয়। এই বছরেই মারা যান ত্রিপুরার প্রখ্যাত ব্যক্তি কর্ণেল মহিমচন্দ্র ঠাকুর। পর পর তিনজন রাজার অমাত্য ও রাজদূত হিসেবে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তিনি।

## বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য

পিতা বীরেন্দ্র কিশোরের অকাল মৃত্যুর সময় যুবরাজ বীরবিক্রম কিশোর নাবালক ছিলেন। একটি শাসন পরিষদ গঠন করে রাজ্য শাসন করা হয়। ১৯২৮ সালে নিয়মমত অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করে রাজ্যভার গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন রাজপুর বংশীয় রাণী অরুন্ধতীর পুত্র।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগেই বীর বিক্রম কিশোর ইউরোপ ও আমেরিকার অনেক দেশ ভ্রমণ করে বিশ্বনেতাদের সঙ্গে পরিচিতি লাভ করেন। ১৯৩১ থেকে ১৯৩৬ পাঁচ পছরে তিনবার ইউরোপ ভ্রমণ করেন। ১৯৩৯ সালে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ঘুরে আসেন।


মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য

ত্রিপুরার শেষ মহারাজা আধুনিক শিক্ষা ও সভ্যতার অভিজ্ঞতার আলোকে রাজ্যকে উন্নত করার স্বপ্ন দেখেছিলেন। জুমচাষের পরিবর্তে সমতল চাষে উপজাতিদের উৎসাহিত করেন। মৌখিক ভাবে জমি ক্রয় নিষিদ্ধ করেন। রাস্তাঘাট নির্মাণে উদ্যোগী হন। আগরতলাকে একটি পরিকল্পিত নগরীতে পরিণত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। অনুমোদন ছাড়া পাকাবাড়ী তৈরী নিষিদ্ধ হয়।

১৯৩৫ সালে ত্রিপুরা ষ্টেট ব্যাংক স্থাপন করা হয়। রাজধানীতে একটি গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা নেন, যার অধীনে থাকবে ডিগ্রী কলেজ, মেডিক্যাল কলেজ,

কৃষি -চারুকলা ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। এই উদ্দেশ্যে কলেজটিলায় বিস্তীর্ণ এলাকা নির্দিষ্ট করা হয়। কিন্তু মহারাজার অকাল মৃত্যুতে এই পরিকল্পনা রূপায়িত হয়নি। গণতান্ত্রিক শাসনের পঞ্চাশ বছরেও শাসক দলগুলো এই পরিকল্পনাকে গুরুত্ব দেয়নি।

১৯৪১ সালের রায়পুর দাঙ্গা এবং ১৯৪৬ সালের নোয়াখালির দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত হিন্দু উদ্বাস্তুদের রাজ্যে আশ্রয় ও সাহায্য দিয়ে মহারাজা উদার মনের পবিচয় দেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইংরেজ সরকারকে সবদিক দিয়ে সাহায্য করেন। প্রথম ত্রিপুরা রাইফেল বাহিনী গঠন করে আরাকান ও বার্মা যুদ্ধে অংশ নেন। এবারই প্রথম ত্রিপুর সেনারা রাইফেল ব্যবহারের অনুমতি পেয়েছিল।

বীরবিক্রমের অভিষেকের পর থেকেই ত্রিপুরায় ভারতীয় গণআন্দোলনের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে। যুদ্ধের সময় রতনমনির নেতৃত্বে রিয়াং বিদ্রোহ ঘটে।

রাজতন্ত্রের মধ্যেই একটা গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য মহারাজা উদ্যোগী হন। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ায় তা স্থগিত রাখতে বাধ্য হন।

১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সারা ভারতে এক অস্থির অবস্থা দেখা দেয়। যুদ্ধে জয়লাভ করলেও ইংরেজ সরকার খুবই দুর্বল হয়ে পড়ে। রাজ্যের প্রজাদের মধ্যেও রাজনৈতিক চেতনার বিস্তার ঘটে। ভারতের স্বাধীনতা আসন্ন হয়ে উঠায় দেশীয় রাজাদের সংগঠন ভবিষ্যত নিয়ে নানা পরিকল্পনার কথা ভাবতে থাকেন অধিকাংশ দেশীয় রাজ্য ভারত রাষ্ট্রে যোগ দেবার সিদ্ধান্ত নেন। মহারাজা বীরবিক্রমও স্বাধীন ভারতে যোগ দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ভারত স্বাধীন হবার মাত্র তিনমাস আগে ৩৯ বছর বয়সে মহারাজা বীর বিক্রমের অকাল মৃত্যু ঘটে।

মহারাজ বীরবিক্রম, শিল্প সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ৮০ তম জন্ম দিনে কবিকে ভারত ভাস্কর্য উপাধি প্রদান করেন। তিনি সঙ্গীত ও নাটকের ভক্ত ছিলেন। বিখ্যাত শিল্পীদের আমন্ত্রণ করে আনতেন। সঙ্গীতজ্ঞ অনিলকৃষ্ণ ঠাকুর ছিলেন প্রিয় বন্ধু। মেলাঘরে নীরমহল বীরবিক্রমের আধুনিক রুচির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।



নীরমহল

# রাজন্য যুগের শেষ প্রতিনিধি

## যুবরাজ কিরীটবিক্রম

১৯৪৭ সালের ১৭ই মে মহারাজা বীর বিক্রম কিশোরের অকাল মৃত্যু হওয়ার পর যুবরাজ কিরীট বিক্রম নাবালক থাকায় মহারাজ পদে অভিষেকের অনুমোদন পাওয়া যায়নি। ব্রিটিশ সরকার তখন ক্ষমতা হস্তান্তরেব প্রস্তুতি নিচ্ছে। ভারত সরকারের পরামর্শে রাজমাতা কাঞ্চনপ্রভা দেবীর নেতৃত্বে একটি শাসন পরিষদ গঠন করা হয়। এই সময় রাজ্যের পরিস্থিতি ছিল অস্থির। দেশবিভাগ- উদ্বাস্তু আগমন-রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করতে হয়েছিল তরুণ যুবরাজকে।


যুবরাজ কিরীটবিক্রম

অল্পদিন পরই ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা ঘোষণার আগেই ভারতের ৬৮১টি দেশীয় রাজ্য ভারত রাষ্ট্রে যোগ দেবার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেয়। কাশ্মীর, হায়দ্রাবাদ ও জুনাগর তিনটি বড় রাজ্য যোগদানে অনিচ্ছা প্রকাশ করতে থাকে। ত্রিপুরা রাজ্যেও রাজপরিবার দুইভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। জনসাধারণ পাকিস্থান ভুক্তির তীব্র বিরোধীতা করে। শেষ পর্যন্ত নানা ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে ১৯৪৯ সালের অক্টোবরে ত্রিপুরার ভারত ভুক্তি চুক্তি সম্পন্ন হয়।

# মহারাণী কাঞ্চনপ্রভা দেবী

ত্রিপুরায় রাজন্যযুগের শেষ লগ্নে চরম জটিল পরিস্থিতির মধ্যে মহারাণী কাঞ্চনপ্রভা দেবী যে সাহসিকতা ও বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন তা ত্রিপুরার ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। চারদিকে চলছিল নানা ষড়যন্ত্র এবং চরম অস্থিরতা এবং ঘরে বাইরে নানা দিক থেকে নানা চাপ ও হুমকী। জনগনের মধ্যে ভারত ভুক্তির প্রবল আকাংখা মহারাণীকে সাহস যুগিয়েছিল। মহারাজা বীরবিক্রমের সুচিন্তিত শেষ ইচ্ছা কার্যকর করতে তিনি সুদৃঢ় মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন।


কাঞ্চনপ্রভা দেবী

মহারাণী কাঞ্চন প্রভা দেবী ছিলেন মহারাজ বীরবিক্রমের দ্বিতীয় মহিষী এবং মধ্য প্রদেশের পান্না রাজ্যের রাজকন্যা। বীরবিক্রমের প্রথমা মহিষী বিবাহের একবছর পরেই মারা যান।

ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণার সাতদিন আগে ৮ই আগষ্ট ১৯৪৭ তারিখে মাতা মহারাণী এক ঘোষণায় ব্রিটিশ সরকারের ক্ষমতা হস্তান্তর দিবসটিকে স্মরণীয় উৎসব হিসেবে পালন করার জন্য নির্দেশ জারি করেন। ১৫ই আগষ্ট ১৯৪৭ তারিখে সারাদেশের সঙ্গে ত্রিপুরায়ও স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। রাজ্য ও জমিদারীর সমস্ত স্কুল, কলেজ, অফিস, আদালতে দুইদিনের ছুটি ঘোষণা করা হয়।

আনুষ্ঠানিকভাবে ত্রিপুরার ভারতভুক্তির চুক্তি সম্পাদনে দুইবছর সময় অতিবাহিত হয়। এর দুটি কারণ জানা যায়। প্রথমত রাজপরিবারে তীব্র বিরোধীতা করে একটি অংশ পাকিস্থানপন্থী ষড়যন্ত্রকারীদের সঙ্গে হাত মেলায়। রাজ্যে ভয়ানক অস্থির অবস্থার সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয়ত কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতাদের একাংশ ত্রিপুরার মত একটি ক্ষুদ্ররাজ্যের সমস্ত দায়ভার নেওয়া সর্ম্পকে আপত্তি তুলেন। বিশেষত ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন রাজ্যের সীমান্ত ও রাজ্যের শান্তি শৃংখলা রক্ষা বিষয়ে সংকটের কথা উল্লেখ করা হয়।

ষড়যন্ত্রকারীরা-মুসলিম ন্যাশনাল গার্ড- নামে একটি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ত্রিপুরাকে জোর করে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। তাদের প্রতিরোধের জন্য নাগরিকদের উদ্যোগে একটি সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলা হয়।

এসব খবর জেনে প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্যাটেলকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন। আসাম সরকারকেও ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ পাঠানো হয়। আসাম থেকে সশস্ত্র বাহিনী ত্রিপুরায় আসে। মহারাজার বৈমাত্রেয় ভাই দুর্জয় কিশোরকে ষড়যন্ত্রের দায়ে অভিযুক্ত করে রাজ্যত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়। তৎকালীন দেওয়ান সত্যব্রত মুখার্জীকে বরখাস্ত করা হয়। কারণ তিনি ষড়যন্ত্রকারীদের প্রশয় দিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠে।

১৯৪৮ সালের ১২ ই জানুয়ারী মাতা মহারাণী শাসন পরিষদ বাতিল করে একক রাজপ্রতিনিধি হিসেবে শাসন ভার গ্রহণ করেন।

১৯৪৯ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর যুবরাজ কিরীট বিক্রমের পক্ষে মাতা মহারাণী কাঞ্চনপ্রভা দেবী আনুষ্ঠানিক ভাবে ত্রিপুরার ভারতভুক্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। ১৫ই অক্টোবর থেকে এই চুক্তি কার্যকর হয় এবং ত্রিপুরায় রাজন্য শাসনের অবসান ঘটে। ত্রিপুরা ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের অঙ্গ হয়ে যায়।

ত্রিপুরার ভারতভুক্তি চুক্তির প্রধান ত্রুটি হল এই চুক্তিতে চাকলা-রোশনাবাদ জমিদারী সম্পর্কে কোন উল্লেখ নেই। ইংরেজ সরকারের সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী চাকলা

রোশনাবাদের যিনি জমিদার হবেন তিনিই হবেন ত্রিপুরার সিংহাসনের অধিকারী। বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে এ রীতি কার্যকর হয়েছে। এসব সরকারী দলিলপত্র থেকে প্রমাণ হয় চাকলা - রোশনা বাদের জমিদারী ত্রিপুরা রাজ্যের অংশ বলে ইংরেজ সরকার স্বীকার করে নিয়েছিল। ভারতভুক্তির চুক্তিতে এসব উল্লেখ থাকলে চাকলা রোশনাবাদের বিশাল অঞ্চল ত্রিপুরা রাজ্যের সঙ্গে সঙ্গে ভারত রাষ্ট্রের অঙ্গ হয়ে যেতো। তাহলে ত্রিপুরায় উদ্বাস্তু সমস্যা দেখা দিতনা। কি কারনে চুক্তিতে জমিদারীর কথা উল্লেখ করা হয়নি সে রহস্য আজো জানা যায়নি। হয়তো রাজপরিবার আশা করেছিল রাজ্য গেলেও জমিদারী ভোগ করার সুযোগ থাকবে। যারা পাকিস্তানের সঙ্গে ত্রিপুরার অন্তর্ভুক্তি চেয়েছিলেন তাদের মনেও এরূপ আশা এবং আশ্বাস ছিল মনে হয়। কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতারাও ত্রিপুরার ব্যাপারে খুব উৎসাহী ছিলেন না বলেই এসব তথ্য জানার চেষ্টাও করেননি। আরও আশ্চর্যের ব্যাপার হলো ত্রিপুরার কোন রাজনৈতিক দল বা নাগরিক বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে কোন দাবী উত্থাপন করেনি। অথচ রোশনাবাদ অঞ্চল ত্রিপুরা রাজ্যের অবিভাজ্য অঙ্গ বলেই গণ্য করা হতো তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। সরকারী চিঠি পত্রে জানা যায় দেওয়ান এ.বি. চাটার্জী এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে একটি চিঠি দিয়েছিলেন, কিন্তু দুই বছর পর কেন্দ্রীয় সরকারের জবাব পান ত্রিপুরার প্রথম চীপ কমিশনার রণজিৎ কুমার রায়। কেন্দ্রীয় সরকারের চিঠিতে বলা হয় রোশনাবাদ জমিদারী মহারাজার ব্যক্তিগত সম্পত্তি। এ ব্যাপারে ভারপ্রাপ্ত সরকারের কিছু করণীয় নেই। কেন্দ্রীয় সরকার বিষয়টার উপর কোন গুরুত্বই দেয়নি। এই চিঠি তার প্রমাণ।

ভারতের অঙ্গরাজ্য ত্রিপুরার যাবতীয় দায়িত্ব ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা চুক্তি অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের উপরই পড়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার এই দায়িত্ব কি ভাবে কতটা পালন করেছে তা পরবর্তী ৫০ বছরের ইতিহাস থেকেই জানা যাবে।

ত্রিপুরার ভারতভুক্তি সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে নানা রকম বিভ্রান্তি ছড়ানো হয়।এ বিষয়ে মহারাজকুমার পূর্ণেন্দু কিশোর দেব-বর্মনের (ক্ষীর গোপাল কর্তা) একটি প্রবন্ধ “ফার ইষ্ট ফোকাস” পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। স্থানীয় ‘দৈনিক সংবাদ’ পত্রিকায় ৫ই জানুয়ারী ২০০০ তারিখে প্রবন্ধটির বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করা হয়। এতে তিনি যে মতামত দিয়েছেন তার মর্মার্থ হল,- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর রাজনৈতিক পরিস্থিতির অস্থিরতা লক্ষ্য করে দূর দৃষ্টি সম্পন্ন মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য রাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু প্রজাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য ভারতরাষ্ট্রের সঙ্গে ত্রিপুরাকে যুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি বিশ্বাস করতেন হিন্দু ও বৌদ্ধ সংখ্যাগরিষ্ঠ পার্বত্য চট্টগ্রামেরও ভারতভুক্তি প্রয়োজন।

মহারাজার অকাল মৃত্যু না ঘটলে ত্রিপুরা রাজ্যের সঙ্গে চাকলা রোশনাবাদ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম ভারত রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হতো। দেশীয় রাজাদের সর্বভারতীয সংগঠনে ত্রিপুরার মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের মর্যাদাপূর্ণ স্থান ছিল। ভারত স্বাধীন হলে কয়েকটি দেশীয় রাজ্য স্বাধীন সত্তা বজায় রাখবেন বলে প্রস্তাব করায় মহাবাজা বীর বিক্রম সেই অবাস্তব প্রস্তাব নাকচ করে দেন।

পরবর্তীকালে সরকারী দলিল থেকে জানা যায় যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের চাক্মা রাজা দেশ ভাগের পর ভারতের পতাকা তুলে দীর্ঘদিন ভারত সরকারের সঙ্গে ভারত ভুক্তির দাবীতে চেষ্টা করেন। দিল্লীতে প্রধানমন্ত্রী নেহেরু চাকমা রাজার সঙ্গে দেখা করেন নি। বহু চেষ্টার পর সর্দার প্যাটেলের সঙ্গে দেখা করেন। কিন্তু প্যাটেল সক্রিয় কোন ভূমিকা নেননি ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মহারাজা বীর বিক্রমের চিন্তায় ছিল। ভারত ভাগ হয়ে গেলে ত্রিপুরা রাজ্যটি ভারতের মূল ভূখন্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। বর্তমান আসাম আগরতলা রাজপথের তখন অস্তিত্ব ছিল না। সেজন্য উদ্বিগ্ন মহারাজা ত্রিপুরার সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ রক্ষার জন্য সিলেট জেলার ভারতভূক্তি নিশ্চিত করার আবেদন জানিয়ে আসামের কংগ্রেস নেতা গোপীনাথ বরদলৈকে চিঠি পাঠিয়েছিলেন। মহারাজার এক প্রতিনিধি দল চিঠি নিয়ে আসাম গিয়েছিল। সিলেট জেলা হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। এ বিষয়ে প্রচার আন্দোলন চালাবার জন্য মহারাজা তিন লক্ষ টাকা বরদলৈকে দিয়েছিলেন। কিন্তু আসামের কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে বাঙ্গালীভীতি থাকায় সিলেটকে ভারত ভুক্তির প্রশ্নে আন্তরিক উদ্যোগ নেননি। মুসলিম লীগ নেতারা মন্ত্রীত্বের প্রলোভন দেখিয়ে তপশীল জাতির নেতাদের পক্ষে টেনে নিতে সক্ষম হয়েছিল। এটাও ইতিহাসের জটিল সন্ধিক্ষণে এক ট্র্যাজেডি।

ত্রিপুরার ভারতভুক্তির প্রস্তাব দিয়ে মহারাজা বীরবিক্রম মাণিক্য পন্ডিত নেহেরু এবং প্যাটেলের সঙ্গে আলোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার দিয়ে মহারাজার প্রতিনিধি হিসেবে কুমার ব্রজেন্দ্র কিশোরকে দিল্লী পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু কলকাতা পৌঁছেই তিনি জরুরী খবর পেলেন মহারাজা খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন বাধ্য হয়ে তারা তাড়াতাড়ি আগরতলায় ফিরে আসেন। মহারাজার মৃত্যুর পর মহারাণী কাঞ্চন প্রভাদেবী ১৩ ই আগষ্ট ১৯৪৭ সালেই মহারাজার প্রস্তাব ভারত সরকারের কাছে পাঠিয়েছিলেন।

# কর্ণেল মহিমচন্দ্র ঠাকুর

বিংশ শতাব্দীর রাজন্যপর্বে কর্ণেল মহিমচন্দ্র ঠাকুর একটি বিশিষ্ট আসন অধিকার করে আছেন। ছাত্র জীবনে কলকাতায় ঠাকুর পরিবারের বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহপাঠি হিসেবে রবীন্দ্রনাথ ও ঠাকুর পরিবারের অন্যান্যদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেন। মহারাজা বীরচন্দ্রের বিশ্বস্ত অনুগামী হিসেবে বহু জটিল সমস্যা সমাধানে রবীন্দ্রনাথের সহযোগিতা লাভ করেন। মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্যেরও অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ অনুগামী হিসাবে রাজকার্য পরিচালনায় কর্ণেল মহিমঠাকুরের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যোগাযোগ ও পরামর্শ লাভ করেন। রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে কর্ণেল মহিমচন্দ্রের মন কতটা উদার হয়ে উঠেছিল তা বিভিন্ন লেখায় ও পত্রে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। দেশীয় রাজ্য গ্রন্থের কিছু উদ্ধৃতি মহিমচন্দ্রের উদার মানসিকতা বুঝতে সাহায্য করবে। এছাড়াও -'ত্রিপুর দরবারে রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে মহিমচন্দ্র ঠাকুরের উপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।



কর্ণেল মহিমচন্দ্র ঠাকুর

'দেশীয় রাজ্য' নামক গ্রন্থে মহিম চন্দ্র ঠাকুর বলেছেন, ''ভারতের প্রায় এক তৃতীয়াংশ অঞ্চল দেশীয় রাজাদের শাসনে ছিল। ইংরেজ সরকার দেশীয় রাজ্যগুলোকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্তম্ভ হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া সত্ত্বেও দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতারা দেশীয় রাজ্যগুলো সম্পর্কে কোন ভাবনা চিন্তা করেন নি। মহাত্মা গান্ধী নিজেও একজন দেশীয় রাজ্যবাসী। তাঁর পূর্বপুরুষ দেশীয় রাজ্যের রাজকর্মচারী ছিলেন।'' তিনি আরও বলেছেন, ''অধিকাংশ দেশীয় রাজা প্রজার অর্থে আমোদ প্রমোদ ও বিলাসিতায় জীবন কাটাতেন। প্রজাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনীতি ও সমাজনীতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। ...... রাজকুমারদের শিক্ষার ভার দেওয়া হতো অর্ধশিক্ষিত ইংরেজ সামরিক অফিসারদের হাতে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইংরেজ চরিত্রের মন্দ দিক গুলো রপ্ত করে উচ্ছৃংখল জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে উঠতো যুবরাজরা।''

........ ''স্বাধীন রাজ্যের প্রজাগণ আধুনিক শিক্ষার সুযোগ পেলে স্বাধীনতার মূল্য উপলব্ধি করতে পারতো এবং ব্রিটিশ ভারতের জনগণকে স্বাধীনতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার সুযোগ বৃদ্ধি পেত। দেশীয় রাজাদের খরচে ইংরেজ সরকার দিল্লীতে দরবার বসিয়ে পরিচয় আদান প্রদানের জন্য উৎসবের আয়োজন করতো। বহু রাজা নির্ধারিত ব্যয়ভার বহনের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ঋণ করতে বাধ্য হতেন। প্রজাদের উপর বাড়তি কর বসিয়ে ঋণ শোধ করতে হতো।''

মহারাণী ভিক্টোরিয়া শাসন ভার গ্রহণের পর, বছরে দুবার উপাধি প্রদানের ব্যবস্থা চালু হয়। মোটা টাকার বিনিময়ে ইংরেজ সরকারের উপাধি লাভ করার জন্য সংক্রামক ব্যাধির মত সাড়া পড়ে যেত। জমিদারদের মধ্যেও উপাধিলাভের জন্য ভয়ানক প্রতিযোগিতা ছিল।

লর্ড কার্জনের উদ্যোগে দেশীয় রাজাদের এক দরবার উপলক্ষে দেশীয় শিল্পের এক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যপূর্ণ নানা শিল্পকার্য দেখে ইউরোপ-আমেরিকা ও জাপানের প্রতিনিধিরা আবাক হয়ে যান। বিদেশে এসব শিল্পের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু দেশীয় রাজারা ইউরোপের শিল্পসম্ভার ব্যবহার করে গর্ববোধ করতেন।

'.......... ইংরেজ প্রভাবে রাজাদের পোষাক আশাক বদলে গেল। মোগল -পাঠানের কাঠখোট্টার মতো সাজগোজ লুপ্ত হয়ে ইউরোপীয় আধুনিক অভিজাত পোষাক ব্যবহার শুরু হল।'

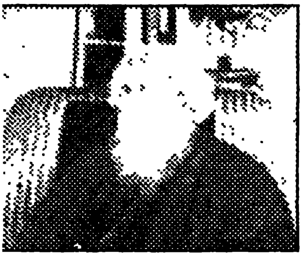
'........... ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসন কালে ইংরেজ সৈনিক ও অফিসাররা বহু দেশীয় রাজ্যে যুদ্ধের পব বিপুল ধনসম্পদ লুন্ঠন করে দেশে নিয়ে গেছে। একমাত্র টিপু সুলতানেব বাজকোষ থেকে সেকালের হিসেবে ত্রিশ কোটি টাকার ধনরত্ন লুন্ঠণ করে নিয়েছে। কিন্তু লুন্ঠিত সম্পদের তালিকা দেখে জানা গেছে আরও বহুগুন বেশী মূল্যের ধনরত্ন লুন্ঠিত হয়েছে।'

'......... রাজা মহারাজাদের পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে বহু ভারতীয় শিল্প লুপ্ত হয়ে গেছে। দক্ষ শিল্পীরা কৃষকে রূপান্তরিত হয়েছে।'

কর্ণেল মহিমচন্দ্র ঠাকুরের দেশীয় রাজ্য গ্রন্থ থেকে এই সামান্য উদ্ধৃতি পড়লেই বোঝা যায় তিনি রবীন্দ্রনাথের উদার মানবিতকতা বোধে কতটা উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। কর্ণেল মহিম ঠাকুর সুদীর্ঘকাল ধরে রাজপরিবারের বিভিন্ন জটিল ও গোপন খবরের ডায়েরি লিখে গেছেন। উত্তরাধিকার সংক্রান্ত মামলায় দক্ষতার সঙ্গে বিভিন্ন তথ্য দিয়ে রাজাদের স্বার্থ রক্ষা করেছেন। ১৯২৩ সালে তিনি প্রয়াত হন।

# কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা

ত্রিপুরায় আধুনিক যুগের চারজন রাজার সঙ্গে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। কবির আশি বছর জীবনের প্রায় ৬০ বছর ত্রিপুরার রাজাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের সঙ্গে বয়সের পার্থক্য সত্ত্বেও বন্ধুর মত সম্পর্ক গড়ে উঠে। মহারাজার প্রথমা মহিষী ভানুমতির মৃত্যুতে ভারাক্রান্ত অবস্থায় কর্ণেল মহিমচন্দ্র ঠাকুর রবীন্দ্রনাথের ভগ্নহৃদয় কাব্যগ্রন্থটি মহারাজার হাতে তুলে দেন। কাব্যগ্রন্থখানি পাঠ করে মহারাজা এত মুগ্ধ হন যে অবিলম্বে একজন রাজপ্রতিনিধি পাঠিয়ে কবিকে অভিনন্দন জানান এবং কবি স্বীকৃতি প্রদান করেন। রবীন্দ্র নাথের বয়স তখন মাত্র ২২ বছর। ঠাকুর পরিবারের বাইরে কারো কাছেই তখনও কবি হিসেবে রবীন্দ্রনাথ পরিচিত হননি। কবি এ ঘটনায় অভিভূত হন। ত্রিপুরার আধুনিক যুগের প্রথম মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের কাছ থেকে রাজকীয় 'কবি' স্বীকৃতি লাভ এবং শেষ মহারাজা বীর বিক্রম মাণিক্যের কাছ থেকে 'ভারত ভাস্বর' উপাধিলাভ কবির জীবনে এক অবিস্মরনীয় স্মৃতি এবং রাজপরিবারের অতি উন্নত সাংস্কৃতিরও স্থায়ী ইতিহাস হয়ে রইল।



কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মহারাজা ঈশানচন্দ্র মাণিক্য এবং ভ্রাতা বীরচন্দ্র মাণিক্যের পিতা কৃষ্ণ কিশোর মাণিক্যের সময় থেকে কলকাতার ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে ত্রিপুরার রাজপরিবারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। রাজপরিবারের বহু জটিল সমস্যা সমাধানে প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর এবং পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্যক্তিগত প্রভাব খাটিয়ে ইংরেজ সরকারের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের সহানুভূতি সূচক সিদ্ধান্ত আদায় করেন। রাজপরিবার এ বিষয়ে নানাভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। রবীন্দ্রনাথও রাজপরিবারের সঙ্গে দীর্ঘকালের আত্মীয়তার সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেছেন।

মহারাজা রাধাকিশোরের সঙ্গে ছিল ঘনিষ্ঠতম সম্পর্ক। প্রতিটি সমস্যার কথা মহারাজা রবীন্দ্রনাথকে জানিয়েছেন এবং সমাধানের জন্য পরামর্শ নিয়েছেন। মহারাজার অভিষেকের এক বছরের মধ্যে ভূমিকম্পে রাজবাড়ী ভীষণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, রাজকোষে অর্থ নেই। ইংরেজ সরকার রাজপ্রাসাদ তৈরীর জন্য ঋণ দেবার প্রস্তাব করেন। রবীন্দ্রনাথ খবরটা জানা মাত্রই মহারাজাকে সাবধান করে দিয়ে বলেন, ইংরেজ বণিকদের বিশ্বাস করা কঠিন। ঋণ দিয়ে সুদে আসলে দেনার ভার বাড়িয়ে হয়তো বিনিময়ে চাকলা জমিদারী

দখল করার মতলব থাকতে পারে। কাজেই যে কোন ব্যাংক থেকে ঋণ নেবার পরামর্শ দেন। ত্রিপুরার রাজপরিবারে আত্মকলহ এবং ষড়যন্ত্রের সুযোগ মুসলমান সুলতান এবং নবাবেরা নিয়েছে এবং ইংরেজরাও নিয়েছে। নানা অজুহাতে রাজ্যের বিভিন্ন অংশ মোগল নবাবরা দখল করেছে ইংরেজরাও করেছে। শেষ পর্যন্ত ইংরেজ কমিশনার সম্পূর্ণ রাজ্যটিকে ভারত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত করার প্রস্তাব পাঠিয়েছিল। প্রিন্স দ্বারাকানাথ বড়লাটকে বুঝিয়ে সে প্রস্তাব বাতিল করার ব্যবস্থা করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরার মহারাজাকে আদর্শ হিন্দু রাজারূপে দেখতে আগ্রহী ছিলেন। তাই হিন্দু আদর্শ অনুযায়ী রাজার প্রধান কর্তব্য হবে প্রজা পালন, এ কথা বিংশ শতাব্দীর তিন জন মহারাজাকে নানা ভাবে বুঝাবার চেষ্টা করেন। এবিষয়ে কবি অনেকটা সাফল্য লাভ করেন।

মহারাজা রাধা কিশোর মাণিক্য এক চিঠিতে অক্ষেপ করে জানান প্রজাকল্যাণের জন্য বহু পরিকল্পনা অর্থের অভাবে করা যাচ্ছেনা। তবে শুভ কাজ শুরু করে যাবার চেষ্টায় ত্রুটি থাকবেনা বলে কবিকে আশ্বস্ত কবে চিঠি লিখেন। মহারাজার অকাল মৃত্যু না ঘটলে অনেক কাজ শুরু করা হতো তাতে সন্দেহ নেই।

বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্যও কবির আদর্শে প্রভাবিত হয়ে অনেক কাজ শুরু করেছিলেন। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের ধাক্কায় শুভ প্রচেষ্টা নানাভাবে ব্যাহত হয়। যুদ্ধের পরে তিনিও অকালে প্রয়াত হন।

বীরেন্দ্র কিশোরের সময় থেকে দেশীয় রাজ্যের যুবরাজদেব শিক্ষা ব্রিটিশ সরকারের প্রতিষ্ঠিত বিশেষ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিশেষ পাঠ্যসূচি অনুযায়ী গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হয়। রবীন্দ্রনাথের চেষ্টায় বিলেত থেকে এমন একজন ইংরেজ শিক্ষক আনা হয় যিনি সব দিক থেকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বীরেন্দ্র কিশোরের শিক্ষার দায়িত্ব নেন। রাধাকিশোর পুত্রকে বাইরে পাঠাতে রাজী ছিলেন না। রাজ্যের শেষ মহারাজা বীর বিক্রম কিশোরই এই রাজ্যের প্রথম রাজপুত্র যিনি রাজপরিবারের চৌহদ্দির বাইরে গিয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। ইউরোপ ও আমেরিকার বহু দেশ ঘুরে বিশ্বের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ লাভ করেন। রাজ্যভার গ্রহণের পর ত্রিপুরা রাজ্যে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি আন্তরিক ভাবেই উদ্যোগী হয়েছিলেন। শাসন কাঠামোর সংস্কার এবং সীমাবদ্ধ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু করতেও উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে সব উদ্যোগ স্থগিত হয়ে যায়। যুদ্ধের শেষে দুই বছরের মধ্যেই মহারাজার অকাল মৃত্যু হয়।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রবীন্দ্রনাথ সাতবার ত্রিপুরায় আসেন। রাধা কিশোর

মাণিক্যের সময় চারবার, বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্যের সময় একবার ১৯১৯ সালে শিলং থেকে ফেরার পথে কবি আমন্ত্রিত হয়ে ত্রিপুরায় আসেন। বীর বিক্রমের আমন্ত্রনে দুইবার ত্রিপুরায় আসেন। ১৯২৬ সালে কবি শেষ বারের মত ত্রিপুরায় আসেন। এর পরেও কবি আরও ১৫ বছর জীবিত ছিলেন কিন্তু ত্রিপুরায় আর আসেননি।

কবির ঘনঘন আগমনে রাজপরিবারে নানা গুঞ্জন উঠে। এতে কবি মনে মনে ক্ষুব্ধ হন। এক চিঠিতে বলেন, আত্মার টানেই তিনি আগরতলায় আসেন নিজের কোন স্বার্থে নয়। কবির শেষ জন্মদিন মহারাজা বীরবিক্রম রাজকীয় গুরুত্ব দিয়ে রাজদরবার ডেকে আনুষ্ঠানিক ভাবে পালন করেন এবং কবিকে **'ভারত ভাস্কর'** উপাধিতে ভূষিত করেন। এই ঘটনায় রবীন্দ্রনাথ গভীর আনন্দ প্রকাশ করেন। এর কিছুকাল পরেই মহাকবির জীবনদীপ নির্বাপিত হয়।

রবীন্দ্রনাথ শেষবার ১৯২৬ সালে ত্রিপুরায় অবস্থানকালে পাঁচটি গান রচনা করেন।

(১) "দোলে প্রেমের দোলন চাঁপা ..................",

(২) "ফাগুনের নবীন আনন্দে .......................",

(৩)" এসো আমার ঘরে এসো........................."

(৪) "বনে যদি ফুটলো কুসুম ..........................",

(৫) "আপনহারা, মাতোয়ারা ........................"।

এছাড়া যামিনী না যেতে জাগালে না কেন গানটি ব্রহ্মপুত্রের বুকে নৌকায় বসে রচনা করেছিলেন । কিন্তু প্রথম সুর দিয়ে গানটি পরিবেশন করেন আগরতলায়।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস রাজর্ষি রচিত হয় রেলে ভ্রমণকালে এক স্বপ্নে দেখা কাহিণী অবলম্বন করে। পরে মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের কাছ থেকে গোবিন্দ মাণিক্যের ও ছত্র মাণিক্যের ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বণে রচনা করেন বিসর্জন নাটক। কবি ইতিহাসকে সম্পূর্ণ অনুসরণ করতে রাজী হননি। কারণ একটি আদর্শ এবং সামাজিক দ্বন্দ্ব এই নাটকে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। মুকুট গল্পে তিন রাজপুত্রের সিংহাসন লাভের প্রতিযোগীতা এবং পরিণাম তুলে ধরেছেন। রাজর্ষি-বিসর্জন এবং মুকুট এই তিনখানি গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরার রাজবংশকে অমর করে রেখেছেন। কাহিনী কাব্য - গ্রন্থটি মহারাজা রাধা কিশোর মাণিক্যের নামে উৎসর্গ করেছেন।

কবি দুইবার কার্সিয়াং এ মহারাজা বীরচন্দ্র মানিক্যের অবসরকালীন সঙ্গী হয়েছিলেন। গভীর রাত পর্যন্ত দুজনের মধ্যে নানা বিষয়ে আলোচনা হত। মাঝে মাঝে কবি গান গেয়ে শুনাতেন। কর্ণেল মহিম চন্দ্র ঠাকুর এ বিষয়ের একটা বিবরণ দেশীয় রাজ্য -

গ্রন্থের **'ত্রিপুর দরবারে রবীন্দ্রনাথ'** প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করেছেন। মহারাজা রাধা কিশোরের দার্জিলিং অবস্থান কালেও রবীন্দ্রনাথকে সঙ্গী হিসেবে পেয়ে মহারাজা গভীর আনন্দ লাভ করেছিলেন। দুজনের মধ্যে নানা বিষয়ে আন্তরিক আলাপ আলোচনায় ও কবির পরামর্শে মহারাজা উপকৃত হয়েছিলেন। মহিম চন্দ্রের চিঠিতে তার উল্লেখ পাওয়া যায়।

দীর্ঘকাল ধরে নানা জটিল বিষয়ে কবির সঙ্গে ত্রিপুরার রাজাদের বহু জটিল বিষয়ে পত্রযোগে আদান প্রদান হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের বহু মূল্যবান পত্র উপযুক্ত সংরক্ষনের অভাবে হারিয়ে গেছে। কবির নিজের লিখিত বর্ণনা অনুযায়ী রাজাদের বহু মূল্যবান চিঠি কবি যত্ন সহকারে সংরক্ষণ করেছেন। ত্রিপুরার আধুনিক যুগের চারজন রাজার সঙ্গে পত্রালাপের মূল্যবান স্মৃতি জড়িত চিঠিগুলো আধুনিক ইতিহাস রচনায় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।

# রাজন্যযুগে সামরিক ব্যবস্থা

প্রাচীন যুগের ইতিহাসে পৃথিবীর সর্বত্র শুধু বীরদের গাঁথা খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু রাজাদের ধারাবাহিক সামরিক ব্যবস্থায় ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যায়না।

ত্রিপুরা রাজ্যেরও সামরিক ইতিহাস খুঁজে পাওয়া কঠিন। ভারতের জাতীয় ইতিহাসেও ত্রিপুরার সামরিক ব্যবস্থা সম্পর্কে বিশেষ কিছু উল্লেখ নেই।

সামরিক ইতিহাসে একটা রাজ্যের যুদ্ধকৌশল, যুদ্ধরীতি এবং প্রশাসনিক দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়।

আদিম সমাজে সামরিক বাহিনীর কোন প্রয়োজন ছিলনা। সমাজ যখন বড় হয়েছে। নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়েছে এবং স্থায়ী বসবাসের আঞ্চলিক সীমা রক্ষনা-বেক্ষনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের সর্দারদের নেতৃত্বে বহিরাগত আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করা যাচ্ছে না, তখনই একজন রাজা ও সেনাপতির প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। পৃথিবীর সর্বত্র এরূপ প্রয়োজন থেকেই রাজতন্ত্রের জন্ম হয়েছে। রাজ্যের অভ্যন্তরে শান্তি শৃংখলা রক্ষা করা, এবং বহিরাগত শত্রুর হাত থেকে রাজ্য রক্ষা করার জন্যই সামরিক শক্তির প্রয়োজন হয়েছে।

ত্রিপুরায় গভীর জঙ্গল এবং ছোট বড় পাহাড়ের বাধা প্রাকৃতিক প্রতিরোধ সৃষ্টি করার পক্ষে খুবই সুবিধা জনক। অল্প সংখ্যক সেনার সাহায্যে এরূপ রাজ্যে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়।

প্রতিবেশী বাংলায় যখন মুসলমান সুলতান ও নবাবরা খুব সহজেই অসংখ্য রাজাদের

উৎখাত করে সমগ্র বাংলায় শাসন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করেছিল ঠিক তখনও ত্রিপুরার রাজারা নিজেদের রাজ্য রক্ষা করা এবং সুযোগ বুঝে সীমানা বৃদ্ধি করার প্রচেষ্টা চালিয়ে গিয়েছিলেন। যোগাযোগ ব্যবস্থা না থাকায় গেরিলাযুদ্ধের কৌশল এ রাজ্যে কার্যকর হয়েছিল।

বর্ষাকালে ত্রিপুরার নদীগুলো অতিক্রম করা কঠিন হয়। কিন্তু অন্য সময় নৌকা চলাচলের উপযোগী থাকেনা। প্রাচীন ও মধ্যযুগে ত্রিপুরার সীমানা কখনো বেড়েছে আবার কখনো কমেছে। কিন্তু ১৮৫৪ সালে ইংরেজ সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের সীমানা নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। মুসলমান শাসনকালে কয়েকটি যুদ্ধের ঘটনা রাজমালায় উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু বেশীরভাগ যুদ্ধ হয়েছে রাজপরিবারের সিংহাসনের দাবীদার প্রতিদ্বন্দ্বীদের আহবানে। মুসলমান শাসকরা রাজ্যের সমতল ভূমি দখল করার লক্ষ্যে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম দখল করার লক্ষ্যে যুদ্ধ করেছে। একবার মোগলরা পার্বত্য ত্রিপুরা দখল করেও মহামারীর আক্রমণে আড়াই বছর পর ফিরে গেছে। আরাকানের মগদের একটি শাখা লিকা বংশীয় মগদের হাত থেকে রাঙ্গামাটি দখল করে ত্রিপুরা রাজ্য গড়ে উঠেছিল। আরাকানদের সঙ্গে কয়েকটি যুদ্ধে ত্রিপুরার রাজারা পরাজিত হয়েছে। আরাকানের মগরা রাজধানী লুণ্ঠণ করে ফিরে গেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম দখল করেছে আবার ত্রিপুরার রাজারাও চট্টগ্রাম উদ্ধার করেছে। শেষ পর্যন্ত মুসলমান শাসকদের কাছে পরাজিত হয়ে চট্টগ্রামের অধিকার ছেড়ে দিতে হয়েছে।

সমগ্র বাংলায় মুসলমান শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ত্রিপুরার রাজারা সুযোগ বুঝে রাজ্যের সীমানা বৃদ্ধি করেছেন। কিন্তু মুসলমান শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হবার পর ত্রিপুরা রাজ্যে রাজ পরিবারের কলহের সুযোগ নিয়ে সেনা সাহায্য দিয়ে নবাবেরা সমতল ভূমির দখল নিয়েছে এবং ত্রিপুরার কিং মেকারের ভূমিকা পালন করেছে। প্রতিটি আক্রমণে মুসলমান শাসকরা লাভবান হয়েছে। ইংরেজ অধিকারের পর ত্রিপুরা রাজ্যে আর কোন যুদ্ধ হয়নি। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সামন্ত রাজা হিসেবে অর্থ ও সেনা দিয়ে ইংরেজ সরকারকে সাহায্য করতে হয়েছে।

সপ্তদশ শতাব্দীর শুরুতে ১৬১৮ খ্রীষ্টাব্দে মোগলরা ত্রিপুরার রাজধানী উদয়পুর দখল করে আড়াই বছর রাজ্য শাসন করেছিল। মোগল শাসনের স্মৃতিচিহ্ন এখনো বর্তমান আছে। প্রচন্ড মহামারীতে বহু মোগল সেনা মারা যায় এবং অনেকে পালিয়ে যায়। সেই সময় ত্রিপুরা রাজ্যে লোক বসতি ছিল খুবই কম। রাজ্যের আয় দিয়ে রাজ্যশাসন ব্যয় চলতো না। ফলে পার্বত্য ত্রিপুরার প্রতি মোগলদের আকর্ষণ কমে যায়। নতুবা মোগলদের কাছ থেকে রাজ্য উদ্ধার করা ত্রিপুরার রাজাদের পক্ষে সম্ভব হতো না।

মোগলদের আগে ১৫৮৪ খ্রীষ্টাব্দে আরাকান রাজ সিকান্দর শাহ্ উদয়পুর দখল করেন। মোগলদের বৈশ্যতা স্বীকার করে ত্রিপুরা রাজ্যে স্থায়ীভাবে শাসন করার সুযোগ ছিল। তাহলে ত্রিপুরার রাজবংশের পক্ষে তখন থেকেই রাজ্য উদ্ধার করা কঠিন হত।

পরবর্তী কালে ১৭৪৮ সালে ত্রিপুরার রাজাদেব অধীনস্থ ক্ষুদ্র জমিদার সমসেব গাজী উদয়পুর দখল করে ১২ বছর রাজ্য শাসন করেন। মোগলদের রাজস্ব এবং প্রজাদের জন্য কিছু সুযোগ সুবিধা দানের লক্ষে অর্থ সংগ্রহের জন্য জমিদার ও বিত্তবানদের গৃহে ডাকাতি শুরু করেন। এই ডাকাতিই সমসের গাজীর পতন ডেকে এনেছিল। নতুবা মোগল নবাবদের নিয়মিত রাজস্ব দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্য স্থায়ীভাবে শাসন করতে পারতেন।

এই তিনটি ঘটনাতেই দেখা যাচ্ছে ত্রিপুরার রাজাদের সামরিক ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত দুর্বল। রাজ্য রক্ষার উপযুক্ত সামরিক শক্তি রাজাদের ছিল না। মুসলমান শাসন বাংলায় সুপ্রতিষ্ঠিত হবার সন্ধিক্ষণে সমতলের যেসব অঞ্চল রাজারা দখল করেছিলেন তখন তাদেরকে বাধা দেবার মত কোন রাজ শক্তির অস্তিত্ব ছিলনা। সোনারগাঁও দখল করার সময় ও মোগল দের সঙ্গে যুদ্ধ হয়নি। রাজার সেনারা লুণ্ঠণ করে ধনরত্ন নিয়ে ফিরে এসেছে। মোগলরা যখন সুসংহত শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তখন মোগলদের বৈশ্যতা স্বীকার করে বার্ষিক কর প্রদান এবং সমতল অঞ্চলের জমিদারী লাভ করেই খুশী থাকতে হয়েছে। ইংরেজ সরকার মোগল অধিকার আয়ত্ত করেই সন্তুষ্ট থেকেছে। নতুবা ত্রিপুরা রাজ্য ব্রিটিশ ভারত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য কোন যুদ্ধেরও প্রয়োজন হতো না। ভারত সরকারের একটি আদেশই যথেষ্ট ছিল।

ত্রিপুরার রাজারা নিজেদের গৌরব বৃদ্ধির জন্য মহাসমর বিজয়ী কথাটি শীল মোহরে ব্যবহার করতেন। ঐতিহাসিক বিচারে এর কোন গুরুত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না।

ত্রিপুরার নদীগুলো প্রশস্থ নয়, গভীরতাও নেই। বর্ষার কিছু সময় ছাড়া নৌকা চলা চলের উপযুক্তও থাকেনা। কাজেই ত্রিপুরার রাজারা যুদ্ধে নৌবহর ব্যবহার করেছেন বলে যারা উল্লেখ করেছেন তার যথার্থতা বুঝা যায় না।

হান্টার সাহেব লিখেছেন ত্রিপুরায় যুদ্ধ উপকরণ নিয়ে চলাচলের উপযুক্ত একটি রাস্তাও ছিলনা। তিনটি যুদ্ধে হাতির ব্যবহার দেখা যায়।

১) ছত্র মাণিক্য এবং গোবিন্দ মাণিক্য ,

২) নরেন্দ্র মাণিক্য এবং চম্পক রায় ,

৩) দ্বিতীয় রত্ন মাণিক্য এবং ঘনশ্যাম বড় ঠাকুর।

তিতুন প্রথায় রাজ্যের প্রজারা জঙ্গল কেটে চলাচলের রাস্তা করে দিত এবং মালপত্র

বহন করে এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে পৌঁছে দিতে বাধ্য থাকতো।

যুদ্ধের খবর রাজ্যের সর্বত্র পৌছে দেবার জন্য মহারাজার বিনন্দিয়া মারফত প্রেরিত আদেশ সর্দারগণ প্রজাদের সাহায্যে অতিক্রুত গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে দিত। পারস্য শব্দ ফুরাই (সংবাদ বাহক) ছিল এই প্রথার নাম।

যুদ্ধের খবর পাওয়া মাত্র রাজ্যের সমস্ত সক্ষম পুরুষেরা সর্দারদের নেতৃত্বে যার যার অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধে যোগদান বাধ্যতামূলক ছিল। এ যাবত প্রাপ্ত দলিল পত্র থেকে জানা যায় পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত ত্রিপুরার রাজারা শুধুমাত্র পদাতিক বাহিনীর সাহায্যে যুদ্ধ করেছেন। প্রাচীন যুগের কোন যুদ্ধের খবর জানা নেই। রাজমালায় শুধুমাত্র ত্রিলোচন পুত্র দক্ষিণ ও দৃকপতির যুদ্ধের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

মধ্যযুগেও ত্রিপুরার রাজাদের পদাতিক বাহিনীতে কতজন সৈন্য যুদ্ধে অংশ নিত তার কোন সঠিক বিবরণ জানা যায়নি। মহাভারতের ত্রিপুর বাহিনী মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুর শহরের নিকটবর্তী প্রাচীন ত্রিপুর রাজ্যের বাহিনী ছিল। একথা ঐতিহাসিক দীনেশ চন্দ্র সরকার প্রমাণ করেছেন। তখন পূর্বাঞ্চলে কিরাত রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল। ত্রিপুরা রাজ্যের অস্তিত্ব ছিলনা। মধ্যপ্রদেশের প্রাচীন ত্রিপুর রাজ্যের আধুনিক নাম তেওয়ার। যাযাবব জুমিয়া জনগোষ্ঠীর মধ্যে একটি রাজবংশের কিভাবে উদ্ভব ঘটেছিল তা রহস্যাবৃত। চন্দ্রবংশীয় রাজা যাযাতির কোনও বংশ ধরের প্রভাব ছিল কিনা তাও জানার কোন উপায় নেই।

রাজকীয় রিপোর্ট থেকে জানা যায় রাজ্যের সমস্ত সক্ষম পুরুষকে রাজার সৈন্য বলে গণ্য করা হতো। কিন্তু স্থায়ী বসতি যারা গড়েছিল তাদের সংখ্যা ছিল নগন্য। যাযাবর জুমিয়াদের সংখ্যা সঠিক ভাবে নির্ণয় করা সম্ভব ছিল না।

অষ্টাদশ শতাব্দীর আগে ত্রিপুরায় সেনা বাহিনীর জন্য কোন রকম প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ছিলনা। রাজা নিজের পছন্দমত সেনাপতি নিয়োগ করতেন। সাধারণত রাজার নিকট আত্মীয়দের মধ্য থেকে সেনাপতি নিয়োগ করা হতো। যুদ্ধের জন্য কোন প্রশিক্ষণ দরকার মনে করা হতোনা। পরবর্তী কালে সেনাপতিরা নানা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়ায় অন্যান্য সম্প্রদায় থেকে বিশ্বস্ত লোকদের সেনাপতি পদে নিয়োগ শুরু হয়।

ধন্যমাণিক্যের সময় হিন্দু অনুকরণে সেনাপতিদের উপাধি হয় নারায়ণ। পরবর্তীকালে আফগানদের অনুকরণে সেনাপতির উপাধি হয় খান। গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব প্রাপ্ত সেনাপতিকে বলা হত বড়ুয়া অর্থাৎ বড়। শিবাজীর অনুকরণে একহাজার সৈন্যের সেনাপতিকে বলা হত হাজারী। নগর রক্ষার জন্য রাজার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়কে দায়িত্ব দেওয়া হত। এই নগরপালকে বলা হত নাজির। সমস্ত বিনন্দিয়ার তিনি হলেন সেনাপতি। সাধারণ

সেনাদের কোন উপাধি ছিলনা। সমাজের সমস্ত স্তর থেকে গুপ্তচর নিয়োগ করা হতো। কিন্তু সামরিক বাহিনীর জন্য কোন গুপ্তচর নিয়োগ করা হতো কিনা তার কোন উল্লেখ পাওয়া যায়না। এমন কি যুদ্ধের সময়ও সামরিক গোয়েন্দার অস্তিত্ব ছিল কিনা তা জানা যায়নি।

সামরিক শিক্ষার জন্য কোন প্রতিষ্ঠান ত্রিপুরায় ছিলনা। যে হেতু রাজার অধীনে স্থায়ী কোন সামরিক বাহিনী ছিল না, সেহেতু সেনা নিয়োগের কোন নিয়ম বা আইনও ছিলনা। রাজার ব্যক্তিগত ইচ্ছা এবং নির্দেশই ছিল আইন।

প্রাচীন যুগে পৃথিবীর সর্বত্রই একমাত্র পদাতিক বাহিনীই ছিল সামরিক শক্তি। তলোয়ার, বর্শা, গদা এবং তীর - ধনুক ছিল প্রধান অস্ত্র । যুদ্ধের নীতি ছিল হয় মারো নয় মরো । শেষদিকে রথ, অশ্ব এবং হস্তীর ব্যবহার শুরু হয়। ত্রিপুরায় রথের ব্যবহার ছিল না।

মধ্যযুগে অশ্বারোহী বাহিনী ও পদাতিক বাহিনী বিভিন্ন কৌশলে যুদ্ধে অংশ নিত। প্রাচীন যুগে শুধু ক্ষত্রিয়রাই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে থাকতো। মধ্যযুগে যে কোন যোগ্য ব্যক্তি যে কোন উচ্চপদ লাভে কোন বাধা হতো না। মুসলমান ক্রীতদাস কুতবুদ্দিন ভারতে দাসবংশ প্রতিষ্ঠা করে দীর্ঘকাল রাজত্ব করেছেন।

পূর্বভারতে অশ্ব পাওয়া যেতনা। আর্যদের আগে ভারতে ভাল অশ্ব কোথাও পাওয়া যেতনা।

ষোড়শ শতাব্দীতে বিজয় মাণিক্য ত্রিপুরায় প্রথম অশ্বারোহী বাহিনী সৃষ্টি করেন। কিন্তু ভাড়াটে আফগান সেনাদের হাতে ছিল অশ্বারোহী বাহিনী। স্থানীয় কোন সেনাকে এই বিভাগে নিয়োগ করা হয়নি। আফগানরা প্রায়ই বিশ্বাসঘাতকতা করে রাজার পরাজয় ঘটাতো। এমনকি রাজাকে সিংহাসন থেকে হঠাবার ষড়যন্ত্রেও যোগ দিত । ত্রিপুরার পাহাড়- পর্বত -নদী, অতি বর্ষা এবং রাস্তা ঘাটের অভাব অশ্বারোহী বাহিনীর উপযুক্ত ছিল না। এই অবস্থার জন্য আসামেও অশ্বারোহী বাহিনী টিকেনি। ত্রিপুরায়ও টিকেনি।

ত্রিপুরায় প্রচুর হাতি পাওয়া যেত । কিন্তু হস্তী বাহিনীকে শিক্ষিত করার কোন ব্যবস্থা ছিল না। রাজাদের হাতিশালে চারটি হাতি এবং অশ্বশালে একশ অশ্ব ছিল। ক্রমশ অশ্বের সংখ্যা কমে যায়। অমর মাণিক্যের সময় কয়েকজন ভাড়াটে পর্তুগীজ সেনা নিয়োগ করে একটি ক্ষুদ্র সশস্ত্র বাহিনী সৃষ্টি করা হয়। প্রশিক্ষণের কোন সুযোগ না থাকায় স্থানীয় কোন ব্যক্তিকে এই বাহিনীতে নিয়োগ করা সম্ভব হয়নি। ভাড়াটে পর্তুগীজ সেনাদের বিশ্বাস ঘাতকতার ফলে আরাকান বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে রাজার পরাজয় ঘটেছিল। ত্রিপুর সেনারা যুদ্ধের সময় টাক্কল -দা, বর্শা এবং তীর -ধনুক ব্যবহার করতো। রাজমালায় বলা হয়েছে মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধে আতংক সৃষ্টিকারী কামান ব্যবহার করা হতো। শুধু আওয়াজটাই

আতংক সৃষ্টি করতো। প্রকৃত কামানের ব্যবহার ছিল না। ত্রিপুরার উপজাতিরা আসাম এবং বাংলায় তৈরী টাক্কাল, দা, বর্শা ব্যবহার করতো। খড়গও ব্যবহার করা হতো।

মুসলমান আগমণের আগে ত্রিপুরার রাজাদের কোন উল্লেখ যোগ্য যুদ্ধে লিপ্ত হবার ঘটনা নেই। ত্রিপুরায় কোন প্রকার অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণের ব্যবস্থা ছিলনা। গ্রামের কর্মকাররাই টাক্কল - দা - খড়গ - বর্শা ইত্যাদি তৈরী করে বাজারে বিক্রী করতো। আক্রমণ এবং আত্মরক্ষার অস্ত্র দিয়েই সেনা বাহিনীর শক্তি নির্ণয় করা হয়। শিবাজীর সৈন্যরাও নিজের অস্ত্র নিজেই সংগ্রহ করতো। ত্রিপুরায়ও এই রীতি ছিল। তবে শিবাজীর শক্তিশালী দূর্গগুলোই ছিল শিবাজীর মূল শক্তি। প্রাচীনকাল থেকে ভারতে দূর্গ তৈরী করার রীতি প্রচলিত। মনু বলেছেন দুর্গে অবস্থিত একশজন সৈন্য একহাজার শত্রুর মোকাবিলা করতে পারে।

ত্রিপুরায় কিছু দুর্গের উল্লেখ আছে। চণ্ডীগড়, কলমীগড়, বিশালগড়, কৈলাগড়,জামিরগড়। এগুলিকে প্রকৃত দূর্গ বলা যায়না। নদীর তীরে বা পাহাড় চূড়ায় থেকে যুদ্ধের সময় পাহারা দেবার মত অবস্থান নেবার জন্য এসব গড় তৈরী করা হতো। হঠাৎ আক্রমণের সময় বাধা দেবার ব্যবস্থা থাকতো।

অর্থনৈতিক দুর্বলতার কারণে ত্রিপুরায় স্থায়ী সামরিক বাহিনী গঠন করা সম্ভব ছিল না। শিবাজীর সেনাবাহিনীও আর্থিক কারণেই দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। বাংলার নবাব সেনাদের বেতন দিতে না পারায় সেনা বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। মারাঠী সেনারা অর্থের জন্য ডাকাতি করতো।

বিংশ শতাব্দীর আগে ত্রিপুরায় প্রতিরক্ষা খাতে কোন বরাদ্দের কথা কোথাও উল্লেখ নেই। রাজাদের গার্ড অব অনার অনুষ্ঠানেরও কোন উল্লেখ নেই।

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ সরকারের নির্দেশে প্রতিবছর বাজেট তৈরী হয়। ১৯০১ সাল থেকে বাজেটে প্রতিরক্ষা খাতে দেড় শতাংশ বরাদ্দ হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময় প্রতিরক্ষা বাজেট বৃদ্ধি করতে হয়। প্রজাদের উপর কর বসিয়ে অর্থ সংগ্রহ করা হয়। দুটি বিশ্বযুদ্ধে ত্রিপুর সেনারা ত্রিপুরার স্বার্থে নয় ইংরেজদের স্বার্থে যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে ত্রিপুরার বাজেটে প্রতিরক্ষা খাতে বরাদ্দ হয়েছিল বার্ষিক ত্রিশহাজার দুইশ আটাশ টাকা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বার্ষিক বরাদ্দ বেড়ে দেড়লক্ষ টাকা হয়। হান্টার সাহেবের রিপোর্ট থেকে জানা যায়। ১৮৭৪ সালে ত্রিপুরায় প্রথম একটি সেনা বাহিনী গঠন করা হয়। ৪৩ জন অফিসার ২৩০ জন সিপাই এবং চার জন রনসিঙ্গা বাদক নিয়ে এই বাহিনী গঠন করা হয়। কোন অভিযানে গেলে বাড়তি ভাতা দেওয়া হত। একজন মাত্র মেজর ছিলেন। মাসিক বেতন ছিল ৫০ টাকা। জমাদার, হাবিলদার এবং আমলাদারদের মাসিক বেতন ছিল ৬ টাকা থেকে ১০ টাকা পর্যন্ত।

১৮৯১ সালে কর্ণেলের পদ সৃষ্টি করে মাসিক বেতন দেওয়া হয় ৪০ টাকা।

প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যে সব সেনারা যুদ্ধে অংশ নিয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেছিল যুদ্ধ শেষে তাদের সাবাইকে বিকল্প কোন কাজ না দিয়ে ছাঁটাই করা হয়। ফলে রাইফেল কাঁধে নিয়ে ঘরে ফেরা সেনারা বিদ্রোহ করে। গণমুক্তি পরিষদ এই সব সেনাদের ঐক্যবদ্ধ করে সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে তুলেছিল।

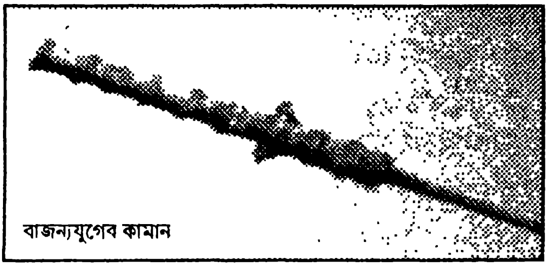
প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্য যুদ্ধ ফান্ডে এক লক্ষ টাকা দান করেন। ২২৪ জন পদাতিক সেনা দিয়ে সাহায্য করেন। অনিচ্ছুক উপজাতিদের উৎসাহ দেবার জন্য প্রত্যেককে ছয় কানি নিস্কর জমি দান করেন। ত্রিপুর সেনাদের হাতে কোন বন্দুক দেওয়া হয়নি। প্রহরীর কাজে নিয়োগ করা হয়।

১৯২৫ সালে ত্রিপুরায় ব্রিটিশ মেজর জেনারেল ওয়াটসনের সঙ্গে আলোচনা ক্রমে এক ব্যাটেলিয়ান নিরাপত্তা বাহিনী নিয়োগের প্রস্তাব পাঠানো হয় ভারত সরকারেব কাছে. জরুরী প্রয়োজনে রাজ্যের বাইরে ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীর সঙ্গে কাজ করতে বাধ্য থাকবে এবং ভাবতীয় সামরিক বাহিনীর অনুকরণে রাজ্যে সামরিক আইন তৈরী হবে এই শর্তে ত্রিপুরায় প্রথম একটি ব্যাটেলিয়ন গঠন করার অনুমতি দেওয়া হয়। ২৭৬ জন যুবক এই বিভাগে নিযুক্ত হয়। শিলং এ ট্রেনিং এব ব্যবস্থা হয়। ত্রিপুর সেনার হাতে প্রথম রাইফেল আসে।

দ্বিতীয় বিশ্বধুদ্ধের সময় মহাবাজা বীরবিক্রম কিশোরকে সাম্মানিক লে. কর্ণেল উপাধি দেওয়া হয়। ১৯২৮ সালে আভ্যন্তরীন নিরাপত্তার জন্য এক কোম্পানী সেনা নিয়োগের অনুমতি দিয়েছিল ইংরেজ সরকার। ইংরেজ সরকারের জরুরী প্রয়োজনে রাজ্যের বাইরে বৃটিশ সামরিক বাহিনীর অধীনে কাজ করতে বাধ্য ছিল এই বাহিনী। রাজ্যের স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্ব ব্রিটিশ সরকারের উপর নির্ভরশীল ছিল এই ঘটনাই তার প্রমাণ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় দেশীয় রাজারা সর্বতোভাবে সাহায্য দিয়ে প্রমাণ কবেছিলেন যে তারা ব্রিটিশ সরকারের অত্যন্ত বিশ্বস্ত সহযোগী।

রাজ্যরক্ষার তাগিদে ব্রিটিশ সরকারকে ক্ষমতার অতিরিক্ত সাহায্য দেবার ফলে ত্রিপুরা রাজ্যের অর্থনীতি প্রায় ভেঙ্গে পড়েছিল। ১৯৪৩ সালে বাংলার মত ত্রিপুরাতেও ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। অন্যান্য দেশীয় রাজ্যেও একই অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল। সেনা বাহিনীর জন্য খাদ্য মজুত করার ফলেই দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। সেনাবাহিনীর বেতন, ভাতা ও অন্যান্য খরচ, রাস্তা-ঘাট নির্মাণ ও প্রতিবছর যুদ্ধ তহবিলে ৫০ হাজার টাকা প্রদান এবং যুদ্ধ বন্ড খরিদ ইত্যাদি খাতে রাজ্যের ব্যয়ভার বহনের ক্ষমতা শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছিল। এজন্যই যুদ্ধ ফেরত সেনারা রাজ্যে ফিরে আসামাত্রই ছাঁটাই করতে হয়েছিল। সেনারা রাইফেল কাঁধে নিজে নিজ নিজ বাড়ীতে ফিবে গিয়েছিল। যুদ্ধের পর রাজনৈতিক

আন্দোলনের ঢেউ মোকাবিলা করার সাধ্য দেশীয় রাজাদের ছিল না।



বাজন্যযুগেব কামান

# ইতিহাসের পর্যালোচনা

রাজমালায় বলা হয়েছে চন্দ্র বংশীয় রাজা যযাতির পুত্র দ্রুহ্য কিরাত রাজ্যের একাংশ দখল করে ত্রিবেগ নামে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এই বংশের চল্লিশতম রাজা ত্রিপুরের নামানুসারে ত্রিবেগ রাজ্যের নাম ত্রিপুরা হয়েছে। অত্যাচারী মহারাজা ত্রিপুর নিঃসন্তান অবস্থায় শিবের ত্রিশূলের আঘাতে নিহত হন।

নিঃসন্তান বিধবা রাণীর গর্ভে ত্রিলোচন নামে সর্বগুন সম্পন্ন রাজকুমার শিবের বরে জন্ম গ্রহন করেন। হয়তো কোন কিরাত সর্দার বিধবা রাণীকে বিবাহ করে নতুন রাজ বংশের প্রতিষ্ঠা করে থাকতে পারেন। যযাতির বংশধরদের ফা উপাধি ধারনের রহস্য আবিষ্কৃত হলে হয়তো প্রাচীন ইতিহাসের নতুন অধ্যায় লিখিত হবে।

অনেক ঐতিহাসিকের মতে ত্রিপুরার রাজবংশ শৈব ধর্মাবলম্বী হওয়ায় প্রাচীন কালে ত্রিপুরায় মহাদেবের পূজা বিশেষভাবে প্রচলিত হয়েছিল। ত্রিপুরারী নাম থেকে ত্রিপুরা নামের উৎপত্তি হতে পারে । ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির অনেক পরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কাজেই ত্রিপুরেশ্বরী থেকে ত্রিপুরা নাম আসেনি বরং ত্রিপুরার অধিশ্বরী দেবী হিসেবে ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে।

কৈলাসচন্দ্র সিংহের মতে তিপরা শব্দ তুই অর্থাৎ জল এর সঙ্গে প্রা যুক্ত হয়ে তুইপ্রা এবং বহু ব্যবহারে তিপরা শব্দটি পরবর্তী কালে সংস্কৃত প্রভাবে ত্রিপুরা শব্দে রূপান্তরিত হয়েছে।

অন্য একটি মত হল তিন পুরের রাজা হিসেবে ত্রিপুর রাজ নাম হয়েছে। রাজা দক্ষিণ ত্রিবেগ, কাছাড় এবং বরাক তিনটি পুরের অধিপতি হয়েছিলেন। ত্রিপুরা নামের উৎপত্তি সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্তে যাওয়া কঠিন হলেও ত্রিপুরা রাজ্যটি যে খুব প্রাচীন নয় এবিষয়ে ঐতিহাসিকরা একমত হয়েছেন। ধন্য মাণিক্যের সময় প্রথম একটি মুদ্রায় ত্রিপুরেন্দ্র শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়।

রাজমালায় ত্রিপুর রাজবংশের যে তালিকা দেওয়া আছে তাতে ১৩৯ তম রাজা

মহামাণিক্য থেকে চল্লিশজন রাজার রাজত্বকালকে ঐতিহাসিক যুগ বলা হয়। কাজেই প্রাচীন যুগের ১৩৮ জন রাজার ইতিহাস অনুসন্ধান সাপেক্ষ। ভবিষ্যতে কোন নিদর্শণ আবিষ্কারের দ্বারা নতুন অধ্যায় রচিত হতেও পারে।

চল্লিশজন মাণিক্য রাজার মধ্যে অধিকাংশই উত্তরাধিকার প্রশ্নে কোন না কোন প্রকার ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছেন। মুসলমান শাসনকালে ত্রিশ জন রাজার মধ্যে নয় জনই মুসলমান সেনার সাহায্য নিয়ে রাজ্য লাভ করেছেন। দুইজন প্রখ্যাত রাজা অমর মাণিক্য ও মুকুট মাণিক্য বিষপান করে আত্মহত্যা করেছেন। অনন্ত মাণিক্য এবং উদয়মাণিক্য ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে বিষাক্ত মদপান করে মারা যান। চারজন রাজা বন্দী অবস্থায় মারা যান। ছয়জন রাজা সেনাপতিদের হাতে নিহত হন। তিনজন দুর্ঘটনায় নিহত হন। দুইজন বসন্ত রোগে মারা যান। চারজন রাজা অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে অকালে প্রাণ হারান।

আট জন রাজা বিশ থেকে ত্রিশ বছর রাজত্ব করেছেন। বাকীরা এক থেকে দশ বছর রাজত্ব করেছেন। কল্যাণ মাণিক্য এবং বীরচন্দ্র মাণিক্য ৩৪ বছর রাজত্ব করেছেন।

বিংশ শতাব্দীর তিন রাজা রাধা কিশোর মাণিক্য ১২ বছর, বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্য ১৪ বছর এবং বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য ২৪ বছর রাজত্ব করেছেন।

আধুনিক যুগের চারজন রাজাই ইংরেজ সরকারের পরামর্শ মেনে নিয়ে প্রজা কল্যাণ মূলক কাজকর্ম শুরু করেছিলেন। পূর্ববর্তী কোন রাজা প্রাজাদের জন্য কিছু করা কর্তব্য এরূপ ধারনা পোযন করতেন বলে উল্লেখ নেই।

পূর্ববর্তী রাজাদের প্রধান কাজ ছিল ব্রাহ্মণদের জন্য নিষ্কর ভূমিদান এবং দীঘি ও মন্দির নির্মাণ করে পুণ্য অর্জন করা। যেখানে রাজধানী ছিল সেখানেই কয়েকটা মন্দির নির্মাণ করা এবং দীঘিখনন করা হয়েছে। উৎসর্গ অনুষ্ঠানে ভূমিদান কার হয়েছে। সাড়ে পাঁচশত বছরের মাণিক্য শাসনে ত্রিপুরার প্রজারা পেয়েছে শুধু বঞ্চনা এবং নিপীড়ন। ঘরে বাইরে আক্রমণ ও লুন্ঠন প্রতিরোধ করাই ছিল রাজাদের একমাত্র কর্তব্য। কিন্তু প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত দুর্বল। বার বার রাজধানী লুণ্ঠিত হয়েছে। প্রজারা নিহত হয়েছে। আক্রান্ত রাজারা পালিয়ে গিয়ে বিভিন্ন জায়গায় অস্থায়ী রাজধানী নির্মাণ করেছেন। সেখানেও রাজপ্রাসাদ ও মন্দ্রি নির্মাণ এবং দীখি খনন করেছেন। দুইজন রাজা পরাজয়ের গ্লানিতে আত্মহত্যা করেছেন। চারজন রাজা বন্দী অবস্থায় মারা গেছেন।

প্রাচীনকাল থেকেই রাজপরিবারে সিংহাসনের দাবীতে কলহ বিবাদ ষড়যন্ত্র ও যুদ্ধ হয়েছে। মধ্যযুগে মুসলমান শাসকদের বশ্যতা স্বীকার করে মুসলিম সেনার সাহায্যে সিংহাসন দখলের জন্য নয়জন রাজপরিবারের সদস্য যুদ্ধ করেছেন।

ইংরেজ শাসনের দুইশ বছরের মধ্যে রাজ্যে কোন যুদ্ধ হয়নি। সিংহাসনের দাবীদাররা প্রজাদের উত্তেজিত করে বিদ্রোহ ঘটিয়েছেন। অনেকের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ আদালতে মামলা হয়েছে। ব্রিটিশ প্রজাদের আদালতে মামলা হয়েছে। ব্রিটিশ প্রজাদের মতই আদালতের রায়ে রাজ্যের প্রকৃত রাজা ঠিক করা হয়েছে। বৃটিশ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়া রাজার অভিষেক হতে পারতনা। অভিষেকের সময় ব্রিটিশ সরকারকে নজরানা দিতে হতো। স্বাধীন ত্রিপুরার পরিবর্তে পার্বত্য ত্রিপুরা নামাকরন করা হয় ব্রিটিশ সরকারের নির্দেশে। বীরেন্দ্র কিশোরের সময় পার্বত্য ত্রিপুরার পরিবর্তে শুধু ত্রিপুরা রাজ্য লেখার অনুমোদন পাওয়া গেছে। কাজেই ব্রিটিশ শাসনে ত্রিপুরার প্রকৃত সার্বভৌমত্ব ছিলনা।

## তৃতীয় অধ্যায়

# স্বাধীন ত্রিপুরায় প্রজাদের অবস্থা

উত্তর পূর্বাঞ্চলের প্রতিটি রাজ্যের উপজাতি জনগোষ্ঠীর প্রায় সকলেই নৃতাত্বিক বিচারে মঙ্গোলয়েড মহাজাতিব অন্তর্ভুক্ত। প্রাচীনকাল থেকে চীন-বার্মা-তিব্বতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যে বসবাস করছে। দীর্ঘ দিন একটি অঞ্চলে বসবাসের ফলে ভাষা ও সামাজিক রীতিনীতিতে কিছু পার্থক্য দেখা দিয়েছে।

রাজমালার বর্ণনা অনুযায়ী রাঙ্গামাটিতে লিকা বংশীয় মগ রাজাদের রাজত্ব ছিল। কবে থেকে এই রাজত্ব শুরু হয়েছিল তা জানা যায়নি। মগরাজাকে পরাজিত করে তিপ্‌রা রাজারা রাঙ্গামাটিতে রাজ্য স্থাপন করেন। ইতিহাসের বিচারে সাড়ে তিন শতাধিক বছর রাঙ্গামাটি ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী ছিল। ১৫৬৭ খ্রীষ্টাব্দে সেনাপতি গোপীপ্রসাদ জামাতা অনন্ত মাণিক্যকে হত্যা করে উদয় মাণিক্য নাম নিয়ে রাজা হন। তখন থেকে রাঙ্গামাটির নাম হয় উদয়পুর। বিভিন্ন রাজারা উদয়পুরের বিভিন্ন অঞ্চলে রাজপ্রাসাদ তৈরী করেছিলেন। উদয মাণিক্যের রাজপ্রাসাদ ছিল বর্তমান চন্দ্রপুরে। অমর মাণিক্যের রাজপ্রাসাদ ছিল অমবপুরে। রত্নমাণিক্যের রাজপ্রাসাদ ছিল রত্ন পুরে। বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্য রত্নপুরের নাম পরিবর্তন করে রাধাকিশোরপুর নাম দেন।

রাজ্য স্থাপন কালে সাড়ে পাঁচশত বছর আগে তিপ্‌রা জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বেশী ছিলনা। মগেরাও সংখ্যায় বেশী ছিলনা। মগদের একটা অংশ দক্ষিণ ত্রিপুরার বিভিন্ন অঞ্চলে এবং অন্য একটি অংশ পার্বত্য চট্টগ্রামে সরে গেছে। অন্যান্য উপজাতি গোষ্ঠীর লোকেরা পরে এসেছে। মগদের আগে এই পার্বত্য অঞ্চলে অস্ট্রিক গোষ্ঠীর কিছু ছোট ছোট সম্প্রদায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। কালক্রমে তারা সম্ভবত অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে মিশে গেছে।

ঐতিহাসিক যুগে রত্নমাণিক্য দশ হাজার বাঙ্গালী নানা পেশার হিন্দু-মুসলমানকে ত্রিপুরায় এনে পুনর্বাসন দিয়েছিলেন। তখন থেকে বাঙ্গালীরা উপজাতিদের সঙ্গে পাশাপাশি বসবাস করছে। স্বাধীন ত্রিপুরায় কোন কালেই বাঙ্গালী পাহাড়ী দাঙ্গা বা কোন প্রকার সংঘাতের ঘটনা ঘটেনি।

তিপ্‌রা এবং কাছাড়ীরা কিরাত জনগোষ্ঠীরই দুটি শাখা। তিব্বতে আবিষ্কৃত চিত্রপট

থেকে জানা গেছে তিব্বত ছিল কিরাত জন গোষ্ঠীর আদি বাসভূমি। সেখান থেকে বিভিন্ন শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে আসাম, কাছাড়, ত্রিপুরায় একটি শাখা ছড়িয়ে পড়েছে আরেকটি শাখা নেপাল, ভূটান হয়ে উত্তর বাংলায় ছড়িয়ে পড়েছে। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে সমতল 'ত্রিপুরা জেলা' গঠন করার পর রাজ্যের নাম হয় পার্বত্য ত্রিপুরা। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজা বীরেন্দ্র কিশোরের অনুরোধে পার্বত্য ত্রিপুরা নামের পরিবর্তে স্বাধীন ত্রিপুরা রাখা হয়। মুসলমান আমলে 'সরকার উদয়পুর' নামে রাজস্ব এলাকা ঘোষিত হয়েছিল।

স্বাধীন ত্রিপুরার আয়তন ১০৪৫১ কি.মি. এর ৬০ ভাগ পাহাড় পর্বত, বাকি ৪০ ভাগ সমতল। সমতল অঞ্চলের অধিকাংশ ঘন জঙ্গলে ঢাকা ছিল। লোঙ্গা ও উপত্যকা এর অন্তর্ভুক্ত। ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন উপজাতি গোষ্ঠী ত্রিপুরায় প্রবেশ করে। জুম চাষে অভ্যস্ত উপজাতিরা সমতল চাষে কোন আকর্ষণ বোধ করেনি। আধুনিক যুগের মহারাজারা বহুরকম সুযোগ সুবিধা দিয়েও সমতল চাষে আকৃষ্ট করতে পারেননি।

ত্রিপুরায় জুমচাষের উপযুক্ত প্রচুর টিলাভূমি থাকায় এবং অল্প সময়ের পরিশ্রমে সারা বছর ধরে নানা রকম ফসল তোলার সুবিধা থাকায় জুমচাষ ছেড়ে সমতল চাষে কারো কোন আগ্রহ ছিলনা। অতি অনাড়ম্বর সরল জীবন যাপনে অভ্যস্ত উপজাতি সমাজে চাহিদা ছিল খুবই সামান্য। নিজেদের তৈরী পোষাক এবং বাঁশ বেতের তৈরী প্রয়োজনীয় বাসন পত্র ও আসবাবপত্র তাদের চাহিদা মেটাতে যথেষ্ট ছিল।

আধুনিক শিক্ষা এবং আধুনিক জীবনযাত্রার সঙ্গে পরিচয়ের অভাব উপজাতি সমাজকে শান্ত ও নিরীহ জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত করে তুলেছিল। এর ফলে সৃষ্টিশীল প্রতিভা বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি হয়নি।

মধ্যযুগীয় সামন্ততন্ত্রের যে অর্থনীতি নানা ধরনের কারিগর ও শিল্পীদের জন্ম দিয়েছিল ত্রিপুরায় তাও গড়ে উঠেনি। কামার-কুমার-রাজমিস্ত্রী-কাঠমিস্ত্রী-দরজী-ইট তৈরীর কারিগর ইত্যাদি পেশার মানুষ প্রাচীন কালের সাতহাজার বছর পূর্বেকার সিন্ধু সভ্যতায়, চীন, মিশর ও অন্যান্য সভ্যতার গড়ে উঠেছিল। মাটি, পাথর, কাঠ ও ধাতুর তৈরী বাসনপত্র, যন্ত্রপাতি, অস্ত্র-শস্ত্র ও অলংকার শিল্প উপজাতি সমাজে সৃষ্টি হয়নি।

এসবের মূল কারণ উপজাতি সমাজে চির দারিদ্র্য বর্তমান ছিল। উদ্বৃত্ত কৃষি উৎপাদন থাকলে ব্যবসা বাণিজ্য গড়ে উঠতো। বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত হবার সুযোগ সৃষ্টি হতো। মানুষের প্রয়োজন থেকেই চাহিদার জন্ম হয় চাহিদা অনুযায়ী পেশা সৃষ্টি হয়। সুদীর্ঘকালের রাজন্য শাসনে এসব কিছুই গড়ে উঠতে পারেনি। তিব্বত বার্মা গোষ্ঠীর উপজাতিরা ত্রিপুরায় প্রধানত দশটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত। প্রত্যেক গোষ্ঠীর অনেকগুলো

শাখা-প্রশাখা বা দফা রয়েছে।

তিপ্‌রা বা ত্রিপুরী জনগোষ্ঠী উপজাতিদের মধ্যে সংখ্যা গরিষ্ঠ। ত্রিপুরী, জমাতিয়া, নোয়াতিয়া, রিয়াং, জনগোষ্ঠী ক্ষত্রিয় হিসেবে পরিচিত।

দেববর্মা জনগোষ্ঠী ভারত-চীন মিশ্র জাতি বলে দাবী করে। রাজ মালায় বর্ণিত চন্দ্র বংশীয় যযাতির বংশধর হিসেবে ত্রিপুরী ক্ষত্রিয়দের পরিচয় এবং এই জনগোষ্ঠী থেকেই ত্রিপুরার রাজবংশ উদ্ভুত হয়েছে বলে দাবী করা হয়। কল্যাণ মাণিক্যের সময় থেকে মহারাজা ত্রিলোচনের ১২ জন পুত্রের বংশধররা ঠাকুর নামে পরিচিত হয়েছে। ঠাকুর লোকদের শিক্ষা সংস্কৃতি ও জীবন ধারা ভারতের যে কোন অভিজাত সমাজের সমকক্ষ।

রাজধানীবাসীদের সঙ্গে পাহাড় অঞ্চলের জীবনধারার কোন মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না।

ত্রিপুরী এবং পুরান ত্রিপুরীরা ১২ টি দফায় বিভক্ত। বিভিন্ন দফার জন্য রাজার প্রতি দায়িত্ব নির্দিষ্ট করা আছে। এই সব দফা আবার নানা শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়েছে।

ত্রিপুরার সমস্ত উপজাতিদের প্রধান জীবিকা জুমচাষ। চাষের পদ্ধতি সকলেরই একরকম। ক্রমে ক্রমে ত্রিপুরীরা সমতল চাষে অভ্যস্ত হয়ে উন্নত হয়েছে। জুমচাষীরা পশু শিকার মৎস্য শিকার এবং বনের ফলমূল সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে জুমের ক্ষতি হলে চরম দুর্ভোগ শুরু হয়। দুর্দিনে রাজার সাহায্য পাওয়ার ব্যবস্থা নেই। সুযোগ বুঝে ভূঁইফোড় মহাজনের দল নানা কৌশলে উপজাতি সমাজের দুস্থ মানুষদের নিঃস্ব করে সর্বস্ব শোষন করে নেয়। জমি বন্ধক রেখে সামান্য ঋণ দিয়ে সারা বছর উর্দ্ধহারে সুদ আদায় করার পরেও আসল ঋণ পরিশোধ হয়না। সরল মানুষেরা বন্ধক দেওয়া জমি স্বত্ত্যাগ করে মহাজনের হাতে তুলে দেয়। জুমের ফসল পেতে যে সময় লাগে ঐ ফাঁকে অভাবী মানুষকে দাদন দিয়ে ফসল আসা মাত্রই এক মনের দাম দিয়ে তিন মন বা চার মন তিল, সরিষা, কার্পাস ইত্যাদি আদায় করে নেয়। অধিকাংশ পাহাড়ী মানুষ এভাবে মহাজনের দ্বারা শোষিত হয়েছে। মহারাজারা কখনো এসব শোষণের হাত থেকে প্রজাদের রক্ষা করতে এগিয়ে আসেননি। ক্রমশ উপজাতিদের মধ্যেও কিছু সংখ্যক মহাজন সৃষ্টি হয়েছে।

মগ-চাকমা-গারো-কুকি-হালাম-উচই-কলই-রূপিনী-বাংখল-ডার্লং ইত্যাদি জনগোষ্ঠীর জীবন জীবিকা প্রায় একই ধারায় প্রবাহিত হয়েছে। চরম দুঃখেও মহারাজাদের প্রতি গভীর আনুগত্য এবং রাজভক্তি অটুট ছিল। কারণ সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিরোধ বন্ধ করতে এবং স্বাধীনভাবে জুম চাষের জমি নির্বাচন করতে মহারাজারা সহযোগিতা

করেছেন।

বিভিন্ন কাহিনী থেকে জানা যায় নরমুন্ড শিকারী কুকী ও লুসাইরা জুমের ফসল ঘরে তোলার পর হঠাৎ করে আক্রমণ করে সর্বস্ব লুণ্ঠণ করে নিত। যারা সামনে বাধা দিতে আসতো তাদের সকলের মুন্ড কেটে নিত। লুণ্ঠণে বাধা পেলে গ্রামের বাড়ীঘর জ্বালিয়ে দিত। কুকীদের দমন করতে ত্রিপুরার রাজাদেরও যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে। কুকী রাজাকে বন্দী করে বৈশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করার পর পাহাড়ী মানুষের মধ্যে রাজভক্তি বেড়েছে।

ত্রিপুরায় রাজাদের সঙ্গে প্রজাদের কোন যোগাযোগ ছিলনা। প্রতিবছর একবার প্রত্যেক সম্প্রদায়ের সর্দাররা মহারাজার হসম ভোজনে মিলিত হয়ে আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে কর প্রদান করতো। দুর্গাপূজা উপলক্ষে এই হসম ভোজনের আয়োজন করা হতো। সাতদিন ধরে আদান প্রদান চলতো।

উপজাতি সম্প্রদায়ে সামাজিক রীতি অনুযায়ী সকলে মিলে সর্দার নির্বাচন করতো। আধুনিক পৃথিবীর যে কোন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার তুলনায় এটা ছিল অতি উত্তম ব্যবস্থা। সবাই মিলে তৈরী করা নিয়ম অনুযায়ী সামাজিক কাজকর্ম ও বিচার ব্যবস্থা চলতো।

কিন্তু সর্দাররা অনেক সময় রাজার স্বার্থ না দেখে সমাজের স্বার্থ দেখতো। সেজন্য রাজা নিজের পছন্দ মত সর্দার নিয়োগ করতে থাকেন। রাজার নির্বাচিত সর্দার রাজার স্বার্থকে সব চেয়ে বেশী গুরুত্ব দিতেন এবং রাজার মতই সম্মান দাবী করতেন। সর্দারের প্রতি অবহেলা রাজাকে অপমান করার মত অপরাধ বলে গণ্য হতো। পাহাড়ী প্রজাদের বিচারের জন্য 'পার্বত্য আদালত' গঠন করা হয়েছিল।

সমতল কৃষিতে যারা অভ্যস্ত হয়নি এমন সব উপজাতিরা পাহাড়ের উপর টংঘর তৈরী করে বাস করে। সমতল বাসীরা বাঙ্গালীদের মত ঘর তৈরী করে বাস করে। টংঘর উঁচু মাচার উপর তৈরী হয়। নীচে গৃহপালিত পশু পাখীদের রাখা হয়।

## পুরাতন ত্রিপুরা

প্রাচীনকালে রাজার সঙ্গে যে সব ত্রিপুরী জনগোষ্ঠীর লোকেরা এ রাজ্যে এসেছে তাদের কে পুরান ত্রিপুরা বলা হয়। ১৯৩০ সালে মহারাজার এক সার্কুলার অনুযায়ী রাজ্যের (১) পুরাতন ত্রিপুরা, (২) দেশী ত্রিপুরা, (৩) নোয়াতিয়া,(৪) জমাতিয়া, (৫) রিয়াং এই পাঁচটি সম্প্রদায়কে ত্রিপুরী শ্রেণীর ক্ষত্রিয় গণ্য করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

ত্রিপুরার পিতৃতান্ত্রিক উপজাতি সমাজে সর্বত্র পুরুষের প্রাধান্য। কয়েকটি পরিবার নিয়ে একটি গোষ্ঠী। প্রত্যেক গোষ্ঠী একটি গ্রামে বা পাড়ায় বাসকরে। গোষ্ঠীব সর্দারের নামে অথবা নিকটবর্তী নদী বা ছড়ার নামে পাড়া বা গ্রামের নামকরণ হয়। ত্রিপুরার রাজারা সর্দারদের মাধ্যমে গ্রাম শাসন করতেন এবং রাজস্ব আদায় করতেন।

হান্টার সাহেবের এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, ত্রিপুরার উপজাতিরা খুবই দরিদ্র এবং অদূরদর্শী। হিসেব করে চলতো না বলে অভাবের সময় খুব কষ্ট হতো। সারা রাজ্যে মাত্র একুশটি ছোট ছোট বাজার ছিল। সপ্তাহে এক দিন বা দুদিন বাজার বসত। দূর দূরান্ত থেকে নিজেদের পিঠে করে জুমের পণ্যাদি বিক্রয়ের জন্য বয়ে আনতে হতো। মেয়েরা বুকে বা পিঠে শিশু সন্তানও বয়ে আনতো।



## দেশী ত্রিপুরা

ত্রিপুরী এবং বাঙ্গালী মিশ্রণে দেশী ত্রিপুরী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছে বলা হয়। এরা জুমচাষ ছেড়েবাঙ্গালীদের মত সমতল চাষে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। এরা সমতল কৃষিকাজ ছাড়াও পশুপালন এবং ছোট খাট ব্যবসার কাজে অভ্যস্ত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ত্রিপুরী সম্প্রদায়ের সকলেই একই সংস্কৃতি ও ভাষা গোষ্ঠী ভুক্ত।



## রিয়াং

রিয়াং সম্প্রদায় খুব সম্ভবত বার্মার শান বংশীয় রাজ্য থেকে মহারাজা ধন্য মাণিক্যের রাজত্ব কালে ত্রিপুরায় এসেছে। দুই জন রিয়াং সেনাপতি খুব বিখ্যাত হয়েছিলেন লুসাই পাহাড়ে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামেও রিয়াং বসতি রয়েছে। ত্রিপুরায় ধর্মনগর, কৈলাশহর, অমর পুর, বিলনীয়া ও খোয়াই বিভাগে রিয়াং বসতি গড়ে উঠেছে। ভাষার দিক থেকে ত্রিপুরীদের সঙ্গে সামান্য পার্থক্য আছে। মূলত মঙ্গোলয়েড গোষ্ঠীর লোক। রিয়াংরা দুইভাগে বিভক্ত মেসকা এবং মালসই। তারা আবার ১৪ টি দফায় বিভক্ত। প্রত্যেক দফায় পৃথক সর্দার আছে। সর্দারের উপাধি হল- 'রায়'। প্রত্যেক দফা আবার নানা প্রশাখায় বিভক্ত। জুমচাষের পদ্ধতি এবং জীবন ধারা অন্য উপজাতিদের মত।এরা যুদ্ধকার্যে খুবই সাহসী। সর্দারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে দ্বিধা করেনি।

জনসংখ্যার দিক দিয়ে ত্রিপুরীদের পরেই দ্বিতীয় স্থানে আছে রিয়াংরা। সামাজিক রীতিতে ত্রিপুরীদের সঙ্গে কিছু পার্থক্য আছে। রিয়াং সমাজে বর্ণভেদ নেই। জামাই খাটা বাধ্যতামূলক।

## জমাতিয়া

জমাতিয়া সম্প্রদায় বিভিন্ন উপজাতির মিশ্রণে গড়ে উঠেছে মনে করা হয়। যুদ্ধের ডাক পেলে দ্রুত জমায়েত হতো বলে জমাতিয়া নাম হয়েছে বলা হয়। সোনামুড়া এবং উদয়পুর অঞ্চলেই তাদের প্রধান বসতি গড়ে উঠেছিল। ক্রমে বিভিন্ন বিভাগে ছড়িয়ে পড়েছে। জমাতিয়ারা জুমচাষ ছেড়ে সমতল চাষে অভ্যস্ত হয়েছে। টংঘরের পরিবর্তে সমতল বাড়ীতে বসবাস করে। রাজগুরু বিপিন বিহারী গোস্বামীর কঠোর শাসনে অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে জমাতিযারা বিদ্রোহ করে। কঠোর হস্তে এই বিদ্রোহ দমন করা হয়।

প্রাচীনকালে পশু ও মৎস শিকার এবং ফলমূল আহরণ করত সব উপজাতিরাই। ক্রমে সকলেই জুম চাষে অভ্যস্ত হয়েছে। আধুনিক যুগে সমতল চাষেও অনেকেই অভ্যস্ত হয়েছে। টংঘরের পরিবর্তে সমতলে বাড়ীঘর তৈরী করে। ঘরে ঘরে কোমর তাঁতে রিগনাই (নিম্ন অঙ্গের পোশাক) এবং রিসা (বক্ষ আবরণী) তৈরী করে। জমাতিয়াদের একটাই সমাজ। ভেদাভেদ নেই।

জমাতিয়া সমাজের শাসন পরিষদকে বলে 'হদা'। গ্রামস্তর, আঞ্চলিক স্তর ও উচ্চ পরিষদ তিন ভাগে প্রশাসন চলে। সব রকম সামাজিক বিবাদের মিমাংসা করেন 'হদা'। প্রাচীনকাল থেকেই জমাতিয়ারা রাজার বিশ্বস্ত সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাই রাজধানী উদয়পুরের আসে পাশে তাদের বসতি গড়ে উঠেছে।



## নোয়াতিয়া

নোয়াতিয়া সম্প্রদায় জমাতিয়া সম্প্রদায়ের সমগোত্রীয়। তারা এগারটি দফায় বিভক্ত। জুমচাষ ছেড়ে ক্রমশ সমতল চাষে অভ্যস্ত হচ্ছে। ত্রিপুরায় নোয়াতিয়াদের ছয়টি দফা বসবাস করে। মৃতদেহ সৎকারের বেলায় রিয়াংদের রীতি অনুসরণ করে। শাক্ত ধর্মের অনুরাগী হলেও অনেকেই বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেছে। তাঁতের কাজে দক্ষতা আছে।

## হালাম

হালাম সম্প্রদায় কুকীদের একটি শাখা। ত্রিপুরার রাজাদের বৈশ্যতা স্বীকার করে হালাম নামে পরিচিত হয়েছে। এরা ১৮ টি তফায় বিভক্ত। কিছু অংশ এখনো জুম চাষ করে। ত্রিপুরীদের মতই ঘরবাড়ী তৈরী করে। রিয়াংদের মত রায়-কাচাগ-গালিম উপাধি ব্যবহার করে। বিজয়া দশমীর দিন মহারাজার হসম ভোজনে হালামদের বিশিষ্ট স্থান দেওয়া হতো। লংতরাই-জম্পুই হিল ও লংগাই ছিল তাদের আদি বাসস্থান। তিপ্রাদের আগেই তারা এই অঞ্চলে বসবাস শুরু করেছিল। রাংখল, কাইপেং ,কলই,রূপিণী, মরসুম ইত্যাদি হালাম গোষ্ঠী ভূক্ত বিভিন্ন দফার অন্তর্ভুক্ত। ত্রিপুরার বাইরে হালামদের দেখা যায়না। জীবনযাত্রা ত্রিপুরীদের মতই। তাদের ভাষা তিব্বত-বার্মা গোষ্ঠী ভুক্ত।

## লুসাই

মিজো উপজাতির একটি শাখা হল লুসাই। লুসাই শব্দের অর্থ হল মুন্ড শিকারী। ত্রিপুরায় জম্পুই-হিলে কিছু লুসাই বাস করে। বর্তমানে নতুন অর্থ করা হচ্ছে লম্বা মাথাওয়ালা মানুষ। মিশনারী প্রভাবে এরা খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহন করে রোমান হরফে লেখাপড়া শিখে উন্নত হয়েছে। কুকীরাও এই গোষ্ঠীরই একটি শাখা । সরকারী ভাবে কুকীদের ১৫ টি দফার উল্লেখ আছে। লুসাইদের বাঁশ নৃত্য বিখ্যাত।

## মগ

মগ সম্প্রদায় বার্মা-আরাকান-চীন এই তিন মানব গোষ্ঠীর মিশ্রণে একটি মিশ্র জাতি গোষ্ঠী হিসেবে উদ্ভূত হয়েছে। মগরা দাবী করে ভারতের মগধ রাজ্যের রাজাদের বংশধর তারা। মগধ রাজবংশীয় রাজা সুধর্ম একসময় আরাকানের রাজা ছিলেন। নৃতাত্ত্বিকরা মনে করেন মগরা চীনের তাই বংশজাত। বার্মার নিম্ন অঞ্চলের নাম আরাকান। মগরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। জুম চাষে অভ্যস্ত। সমতল চাষেও নিযুক্ত হয়েছে।

মগরা আরাকান ভাষা ব্যবহার করে। এরা মঙ্গোল জাতিরই বংশধর। বাংলা ও বিহারের সঙ্গে বার্মা ও আরাকানের ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ধর্মীয় সংস্কৃতির আদান-প্রদান প্রাচীন কাল থেকেই ঘটেছে। দশ থেকে পনেরটি পরিবার নিয়ে নদীর ধারে মগদের গ্রাম গড়ে উঠে। ফ্ল্যাটবাড়ীর মত বড় আকারের মাচার-ঘর তৈরী করে। জুমচাষ এবং সমতল চাষে অভ্যস্ত। গ্রামের সর্দার 'চৌধুরী' গ্রাম পরিষদ পরিচালনা করেন।

# চাকমা

চাকমারা পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে ত্রিপুরায় এসেছে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে চাকমারা ছড়িয়ে পড়েছে। কারো মতে চাকমাদের আদি বাসভূমি আরাকান। কিন্তু চাকমারা বলেন বিহারের চম্পকনগরের ক্ষত্রিয় রাজবংশ থেকে চাকমাদের উৎপত্তি হয়েছে। ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরেও চম্পকনগর নামে একটি অঞ্চল রয়েছে। বার্মা এবং চীনেও চম্পাও চম্বা নামে অঞ্চল রয়েছে। প্রকৃত পরিচয় পাওয়া এখন খুবই কঠিন। চাকমা ও মগদের নিজস্ব ভাষা আছে। চট্টগ্রামের কথ্য ভাষার অপভ্রংশ হলো চাকমা ভাষা। চট্টগ্রামের চাকমা সার্কেলের এলাকাকে সামন্ত রাজার মর্যাদা দেয় ইংরেজ সরকার। চাকমারা আগে হিন্দু ছিল পরে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছে।

ত্রিপুরায় ১৯ টি উপজাতি গোষ্ঠীর লোক বাস করে। এছাড়াও বাঙ্গালী এবং মণিপুরীরা যথেষ্ট সংখ্যায় রয়েছে।

ত্রিপুরার রাজারা ত্রিপুরী-মগ-চাকমা-রিয়াং-জমাতিয়া-নোয়াতিয়া জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতিকে রাজকীয় মর্যাদা দেননি। তাদের ভাষারও স্বীকৃতি ছিল না। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ সম্পর্কে কোন ভাবনা-চিন্তা ছিলনা।

বিংশ শতাব্দীর তিন জন মহারাজা প্রজাদের সম্পর্কে কিছুটা ভাবনা-চিন্তা শুরু করেছিলেন। কিন্তু অর্থের অভাব এবং দুটি বিশ্বযুদ্ধ তাদের শুভ চিন্তাকে কার্যে রূপান্তরের পথে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

মণিপুরী নৃত্যশৈলী রাজদরবারে মর্যাদার আসন পেয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ এখানে মণিপুরী নৃত্য দেখে মুগ্ধ হন। মহারাজাকে অনুরোধ করে মণিপুরী নৃত্য শিল্পীকে শান্তি নিকেতনে নিয়ে যান।

শিক্ষা-স্বাস্থ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থা না থাকায় বাঙ্গালীরা স্থায়ীভাবে ত্রিপুরায় বসবাস করতে আগ্রহী হয়নি। কিন্তু এখানকার উর্বর ভূমিতে চাষ করে লাভবান হওয়া যায় বলে অস্থায়ীভাবে খামার বাড়ীতে থেকে চাষবাস করা এবং ফসল নিয়ে বাড়ী ফিরে যাওয়া শুরু হয়। এরূপ প্রজাদের বলা হতো জিরাতিয়া প্রজা। এদের সংখ্যাও কম ছিল না। এদের অধিকাংশই ছিল মুসলিম।

ত্রিপুরার চা বাগানে কর্মরত সাঁওতাল, মুন্ডা, ওরাং প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর লোকেরাও অন্যান্য উপজাতি গোষ্ঠীগুলোর মত নানা দিক থেকে বঞ্চনা ও নিপীড়নের শিকার হয়েছে। চা-বাগানে কাজ করার জন্য তাদেরকে আসাম-বাংলা-বিহার ও উড়িষ্যা থেকে আনা হয়েছিল।

# ত্রিপুরায় প্রজা বিদ্রোহ

প্রাচীন যুগের ত্রিপুরায় প্রজা বিদ্রোহের কোন উল্লেখ নেই। কিন্তু মধ্য যুগে রাজ্যের উত্তরাধিকারের দাবীদাররা মাঝে মাঝে প্রজাদের বিদ্রোহী করে সিংহাসন দখলের চেষ্টা করেছেন। ইংরেজ সরকারের অধীনে ত্রিপুরার সিংহাসনের দাবীদাররা আগের মত মুসলমান সেনার সাহায্য নিয়ে সিংহাসন দখল করার সুযোগ পাননি। আদালতে মামলা করে ব্যর্থ হলে প্রজাদের মধ্যে বিদ্রোহ সৃষ্টি করে সিংহাসন দখলের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কেউ এভাবে সফল হতে পারেননি।

শম্ভুচন্দ্র ঠাকুর রামগঙ্গামাণিক্যের বিরুদ্ধে প্রজা বিদ্রোহের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। সমসের গাজীর বিদ্রোহকে প্রজা বিদ্রোহ বলা হয়। দীর্ঘ ১২ বছর সাফল্যের সঙ্গে বিদ্রোহী প্রজার শাসন চলেছিল। নবাবের রাজস্ব সময়মত প্রদান করে সমর্থন পাওয়া গেছে। রাজস্ব সংগ্রহের জন্য ডাকাতি শুরু করায় সমসের গাজীর পতন ঘটে।

১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে ঈশানচন্দ্র মাণিক্যের রাজত্বকালে তিপ্রা বিদ্রোহ হয়। ঈশানচন্দ্র মাণিক্য পিতামহী চন্দ্রতারার এক দাসীপুত্র বলরাম হাজারীকে রাজ্যের দেওয়ান নিযুক্ত করায় অনেকেই ক্ষুব্ধ হন। বলরাম নিজ ভ্রাতা শ্রীদাম হাজারীর সাহায্যে অর্থ সংগ্রহের জন্য অত্যাচার শুরু করায় রাজপরিবারের পৃষ্ঠপোষকতায় কুকী ও তিপ্রা সম্প্রদায় পরীক্ষিত ও কীর্তিনামে দুই সর্দারের নেতৃত্বে বিদ্রোহ করে। বলরাম হাজারী পালিয়ে প্রাণ রক্ষা করেন। কিন্তু শ্রীদাম হাজারী বিদ্রোহীদের হাতে নিহত হন। রক্ষীদল বিদ্রোহীদের বন্দী করে।

১৮৬০ -৬১ সালে প্রজাদের উপর করের বোঝা বৃদ্ধি করা হয়। বিপিন বিহারী গোস্বামীর শাসনে রাজপরিবারে অনেকেই ক্ষুব্ধ ছিলেন। রিয়াং সম্প্রদায় বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অন্যদিকে রাজার জন্য কুকীদের মধ্য থেকে ক্রীতদাস সংগ্রহ করার জন্য কুকীদের উপর আক্রমণ হয়। কিছুসংখ্যক রাজপুরুষ এই সুযোগে রাজ্যে অরাজকতা সৃষ্টির জন্য রতন পুইয়ার নেতৃত্বে ৫০০ কুকী নিয়ে খন্ডল পরগনায় আক্রমণ শুরু করে। ১৫ টি গ্রাম পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয় ১৮৫ জনকে হত্যা করা হয় শতাধিক মানুষকে বন্দী করা হয়। প্রচুর সম্পদ লুণ্ঠন করা হয়।

বৃটিশ অঞ্চলে এই ঘটনা ঘটার জন্য ইংরেজ সরকার ত্রিপুরার রাজাকে দায়ী করেন। কুকীদের বিরুদ্ধে ইংরেজ সেনা পাঠানো হয়। কুকীরা উদয়পুর আক্রমণ করে হত্যা ও লুণ্ঠণ চালায়। দেড়শ লোক নিহত এবং দুইশ লোক কুকীদের হাতে বন্দী হয়। বৃটিশ সেনাদের সঙ্গে রাজার সেনারাও যোগ দেয়। খন্ডযুদ্ধে বহু কুকী মারা যায়। বাকীরা গভীর জঙ্গলে পালিয়ে যায়। কুকী সর্দার রতন পুইয়াকে প্রতিবছর ৪০০ টাকা ভাতা

দেওয়ার বিনিময়ে শান্তি রক্ষার চুক্তি হয়।

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে বীরচন্দ্র মাণিক্যের সিংহাসন লাভের এক বছরের মধ্যেই **জমাতিয়া বিদ্রোহ** দেখা দেয়। সিংহাসনের দাবীদার নীলকৃষ্ণ ঠাকুরের প্ররোচণায় জমাতিয়ারা কর দেওয়া বন্ধ রাখে। খাজনা আদায়ের জন্য জমাতিয়া প্রতিনিধি ওয়াখিয়ার হাজারীকে পাঠানো হয়। জমাতিয়াদের তৈতুন প্রথা থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু রাজপ্রতিনিধি এই প্রথার সুযোগ নিতে চেষ্টা করায় বিদ্রোহ দেখা দেয়। রাজার সৈন্যরা দুজন জমাতিয়ার মাথা কেটে রাজার দরবারে হাজির করে। বিদ্রোহীরা রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করে। রক্ষীবাহিনী পরাজিত হয়। রাজা তখন ৬০০ কুকীকে বিদ্রোহ দমনের কাজে নিয়োগ করেন। কুকীরা জমাতিয়া গ্রাম ঘিরে ফেলে। দুইশ বিদ্রোহীকে হত্যা করে তাদের মাথা কেটে বর্শায় গেঁথে আগরতলায় এনে ভীতি সঞ্চারের জন্য গাছে ঝুলিয়ে রাখা হয়। বন্দীদের বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা দিয়ে মুক্তি দেওয়া হয়।

১৮৭০ সালে বীরচন্দ্র মাণিক্যের সময় আরেকটি কৃষক বিদ্রোহ হয়। আলাপ আলোচনার মাধমে তার মীমাংসা হয়।

স্বাধীন ত্রিপুরার শেষ রাজা বীর বিক্রম মাণিক্যের সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে রিয়াং সর্দারদের অত্যাচারের প্রতিবাদে রতনমণির নেতৃত্বে **রিয়াং বিদ্রোহ** হয়। রাজার পারিষদরা এই ঘটনাকে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বলে বর্ণনা দিয়ে রাজাকে উত্তেজিত করেন। রাজা অনুসন্ধান না করেই বিদ্রোহ দমনের নির্দেশ দেন। রিয়াং সর্দাররা রতন মণিকে দস্যু-সর্দার বলে রিপোর্ট পাঠান। রাজার সৈন্যরা খন্ডযুদ্ধে বহু বিদ্রোহীকে হত্যা করে, ৫০ টি গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়। তিন হাজার বন্দী হয়। এই ঘটনা রাজার শাসনের শেষ কলংক চিহ্ন হয়ে রইল। রতনমণিকে বন্দী অবস্থায় হত্যা করা হয়। রতনমণির বিদ্রোহের সঙ্গে কোন রাজনীতির সম্পর্ক ছিল না। পরবর্তী তদন্তে রিপোর্টে জানা গেছে রিয়াং বিদ্রোহ রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে নয়, রাজার নিযুক্ত সর্দারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছিল।

# লুণ্ঠিত রাজধানী উদয়পুর

রাজমালার বর্ণনা অনুসারে লিকা বংশীয় মগ রাজাকে পরাজিত করে ত্রিপুরার রাজবংশ রাজধানী রাঙ্গামাটি দখল করেন। সেকালের যুদ্ধের অনিবার্য একটি অঙ্গ হল নির্বিচারে হত্যা ও লুণ্ঠণ। প্রাচীন এবং মধ্য যুগে লুণ্ঠনের স্বাধীনতা দেওয়া হতো সেনা

বাহিনীকে। লুণ্ঠিত মূল্যবান ধনরত্ন রাজা এবং সেনাপতিদের মধ্যে বন্টন করা হত। সাধারণ সৈনিকেরা সাধারণ সম্পদ যে যেমন পারে সংগ্রহ করত। বন্দীদের ক্রীতদাস রূপে বিক্রী করা হত।

প্রথমবার রাঙ্গামাটি লুণ্ঠিত হল ত্রিপুর সেনাদের দ্বারা। লিকা বংশীয় মগেরা কি ভাবে রাজ্য স্থাপণ করেছিল তার কোন ইতিহাস জানা নেই। তবে মগরাজার আগমনের আগে এ সব অঞ্চলে খুব সম্ভবত জনবসতি ছিলনা।

রত্নমাণিক্য মুসলমান সেনার সাহায্যে রাজধানী দখল করেছিলেন। তখনও হত্যা এবং লুণ্ঠন চলেছিল।

অমর মাণিক্যের রাজত্বকালে আরাকান রাজের মগবাহিনী রাজধানী দখল করে ১৫ দিন ধরে লুণ্ঠন চালিয়েছিল। রাজা পারিষদসহ বনাঞ্চলে পালিয়ে যান। কিন্তু প্রজারা সবাই নিহত হয়। চতুর্দশ দেবতার দুজন সেবক পালাবার সময় ধরা পড়ে। তাদের কাছ থেকে খবর জেনে রাজার গুপ্তধন লুণ্ঠন করা হয়। রাজা বিষপান করে আত্মহত্যা করেন।

যশোধর মাণিক্যের সময় মোগল বাহিনী রাজধানী দখল করে হত্যা ও লুণ্ঠন চালায়। রাজা পালিয়ে গিয়েও পরে ধরা পড়ে বন্দী হন। নজর বন্দী অবস্থায় রাজার মৃত্যু হয়।

নক্ষত্ররায় ছত্র মাণিক্য নাম নিয়ে মুসলমান সেনার সাহায্যে রাজধানী দখল করার সময়ও হত্যা এবং লুণ্ঠন চলে নির্বিচারে। মহারাজা গোবিন্দ মাণিক্য পালিয়ে যান। ছত্র মাণিক্যের মৃত্যুর পরে রাজ্য ফিরে পান।

পরবর্তী সময়ে গোবিন্দ মাণিক্যের পুত্র রামদেব মাণিক্য মুসলমান সেনার সাহায্যে রাজধানী দখল করেন। তখনও হত্যা এবং লুণ্ঠন চলে।

ছত্র মাণিক্যের বংশধর জগৎমাণিক্য মীর হাবিবের সাহায্যে রাজধানী দখল করেন। তখনও হত্যা এবং লুণ্ঠন চলে নির্বিচারে। অতর্কিত আক্রমণে দিশেহারা হয়ে মহারাজা দ্বিতীয় ধর্ম মাণিক্য পালিয়ে যান। তিন দিকের আক্রমণে ধর্মমাণিক্য বন্দী হন। প্রচুর ধনরত্নসহ বন্দী রাজাকে নবাবের কাছে পেশ করা হয়। প্রচুর হাতি উপহার দিয়ে রাজা মুক্তি পান। মুকুন্দ মাণিক্যের পুত্র ইন্দ্র মাণিক্য নবাবের সেনার সাহায্য নিয়ে জয়মাণিক্যকে হটিয়ে রাজা হন। এই সময় ও উদয়পুর লুণ্ঠিত হয়। রাজধানী উদয়পুরে সর্বশেষ লুণ্ঠন চলে সমসের গাজীর আক্রমণে। মহারাজা কৃষ্ণ মাণিক্য পালিয়ে গিয়ে পুরাতন আগরতলায় আশ্রয় নেন। সমসের গাজীর ১২ বছর শাসনের পর ডাকাতির অভিযোগে সমসের গাজীর মৃত্যু দন্ড দেন বাংলার নবাব। কৃষ্ণ মাণিক্য রাজ্য ফিরে পান কিন্তু উদয়পুর থেকে রাজধানী স্থায়ীভাবে সরিয়ে আনা হয় পুরাতন আগরতলায়।

তারপরেও ১৮৬১ সালে বিদ্রোহী কুকীরা উদয়পুর আক্রমণ করে চন্দ্রপুরের বাজার

ধ্বংস করে। নির্বিচারে লুণ্ঠন চালিয়ে দেড়শ লোক হত্যা করে এবং দুইশ লোক বন্দী করে নিয়ে যায়। এভাবে বন্দীদের ক্রীতদাস রূপে বিক্রী করা হতো।

এই নয়টি ঘটনায় প্রমাণ হয় যে, রাজ্যের রাজধানীর নিরাপত্তা ও সুরক্ষার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা এরাজ্যে ছিলনা। স্থায়ী বাহিনী রাখার মত আর্থিক সামর্থ্যও ছিলনা। ইংরেজ অধীনে রাজ্যের নিরাপত্তার দায়িত্ব ইংরেজ সরকারের উপর বর্তে ছিল। ফলে ইংরেজ অধীনে রাজ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ত্রিপুর সেনাদের হাতে কোন আগ্নেয়াস্ত্র দেওয়া হয়নি। শিবিরের বিভিন্ন কাজে তাদের নিযুক্ত করা হয়।

১৯২২ সালে বীরেন্দ্র কিশোর ইংরেজ সেনাপতি ওয়াটসন সাহেবকে ত্রিপুরার আভ্যন্তরীন নিরাপত্তার জন্য এক ব্যাটেলিয়ান সশস্ত্র সেনা নিয়োগের অনুমতি দিতে অনুরোধ করেন। ব্রিটিশ সরকারের সামরিক আইন অনুযায়ী রাজ্যে আইন তৈরী করা হবে এবং জরুরী প্রয়োজনে রাজ্যের বাইরে ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীর অধীনে কাজ করতে বাধ্য থাকবে, এই শর্তে একটি নিরাপত্তা ব্যাটেলিয়ন গঠন করার অনুমোদন পাওয়া যায়। ২৭৬ জন যুবককে সেনা বাহিনীতে নিয়োগ করে শিলংএ ট্রেনিং দেবার ব্যবস্থা হয়। ত্রিপুরায় এই প্রথম সেনারা আধুনিক রাইফেল ব্যবহার করার সুযোগ পায়। এর এক বছর পরই মহারাজা বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্যের অকাল মৃত্যু হয়।

রাজ্যের শেষ মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর বৃটিশ সরকারের প্রতি গভীব আনুগত্য স্বীকার করায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সাম্মানিক লে. কর্ণেল উপাধি লাভ করেন। যুদ্ধের শেষে অর্থের অভাবে যুদ্ধ ফেরত বাহিনী ভেঙ্গে দেন। এর ফলে রাজ্যে সশস্ত্র বিদ্রোহের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

# ত্রিপুরার শিক্ষা-স্বাস্থ্য-যোগাযোগ ব্যবস্থা

বিংশ শতাব্দীর আগে ত্রিপুরার মহারাজারা শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারত সাম্রাজ্যের দায়িত্বভার গ্রহণের পর দেশীয় রাজ্য সহ ভারত সাম্রাজ্যের সর্বত্র প্রজাদের শিক্ষা স্বাস্থ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য উদ্যোগী হতে নির্দেশ জারি করেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী শেষ মুহূর্তে দেশীয় রাজ্যগুলোর অস্তিত্ব বিলোপ করে দিয়ে সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য উদ্যোগ নিয়েছিল। সিপাহী বিদ্রোহ না ঘটলে এই উদ্যোগ কার্যকর হতো। হয়তো কোম্পানীর

শাসনও অব্যাহত থাকতো। ভারতে সিপাহী বিদ্রোহ বৃটিশ সরকারকে ভীষন চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল। সেই সময় ভারতে গণতান্ত্রিক চেতনার বিকাশ ঘটেনি। প্রাক্তন মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহকে সিংহাসনে বসিয়ে সিপাহীরা ইংরেজ শাসনের উচ্ছেদ ঘটাবার জন্যে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল। বহু প্রাক্তন দেশীয় রাজা, যাদের রাজ্য ইংরেজ কোম্পানী নানা অজুহাতে দখল করে নিয়েছিল, তারা সর্বশক্তি নিয়ে সিপাহীদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল।

অন্যদিকে অধিকাংশ দেশীয় রাজা ইংরেজ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের জন্য সিপাহী বিদ্রোহ দমনে সাহায্য করেছিল। এই ঘটনায় ইংরেজ সরকারের নতুন অভিজ্ঞতা হয়। ভারত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় বহুযুদ্ধে ভারতীয় সৈন্যরাই ছিল ইংরেজদের মূল শক্তি। সেই শক্তি বিদ্রোহ করায় দ্বিতীয় শক্তি হিসেবে দেশীয় রাজাদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। তবে বৃটিশ সরকার বুঝতে পেরেছিল ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসন ভারত সাম্রাজ্য রক্ষার ক্ষেত্রে বিপজ্জনক হতে পারে । সে জনাই কোম্পানীর শাসন বাতিল করে সরাসরি বৃটিশ সরকারের শাসন চালু করা হয়।

মহারাণী ভিক্টোরিয়া দেশীয় রাজাদের আশ্বস্ত করে ঘোষণা করেন যে, বৃটিশ সরকার পূর্ববর্তী সরকারের চুক্তির মর্যাদা দেবে এবং দেশীয় রাজাদের স্বার্থ রক্ষায় সর্ব প্রকার যত্ন নেবে। যতক্ষণ পর্যন্ত রাজা ও রাজার বংশধরগণ বৃটিশ সরকারের প্রতি অনুগত থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত কোন বিপর্যয় ঘটবেনা। এই ঘটনার পর থেকে দেশীয় রাজ্যগুলিতে নিযুক্ত পলিটিক্যাল এজেন্টের মাধ্যমে দেশীয় রাজ্যের শাসন কাঠামোর সংস্কার, শিক্ষা-স্বাস্থ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ইত্যাদি বিষয়ে ইংরেজ সরকারের হস্তক্ষেপ শুরু হয়।

## রাজন্য যুগে শিক্ষা ব্যবস্থা

মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের সময় বৃটিশ সরকারের নীতি অনুযায়ী আধুনিক যুগের সূত্রপাত হয়। এই সময় রাজ্যে একটি মাত্র বেসরকারী পাঠশালার উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে স্কুলটি সরকারী বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্যের শাসনকালে এই বিদ্যালয়টি উমাকান্ত একাডেমী নামে পরিচিত হয়। রাজার শাসনে একজন মন্ত্রীর নামে স্কুল প্রতিষ্ঠা করা মহারাজার উদার মানসিকতার পরিচয় বহন করে। মন্ত্রী হিসেবে উমাকান্ত দাসের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতি ও রাজকার্যে দক্ষ পরিচালনার পুরস্কার হিসেবে বিদ্যালয়ের নামকরণ করা হয়।

ত্রিপুরা রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে ইংরেজ প্রতিনিধির রিপোর্টে বলা হয়েছে ত্রিপুরা রাজ্যে প্রজাদের শিক্ষাতো দূরের কথা রাজ্যের ভাবী রাজা যুবরাজ ও অন্যান্য কুমারদের জন্যও প্রাতিষ্ঠানিক কোন শিক্ষা ব্যবস্থা ছিলনা। রাজার নিযুক্ত গৃহশিক্ষকই ছিলেন শিক্ষার একমাত্র উৎস। রাজপরিবারের লোকদের কি কি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হতো এবং কোন পাঠ্যক্রম অনুসরণ করা হতো কিনা জানা যায়নি।

পৃথিবীর সবদেশে প্রাচীন ও মধ্যযুগে রাজা, মহারাজা ও নবাব এবং বাদশারা প্রজাদের শিক্ষার ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। পুরোহিত সম্প্রদায় সাধারণ প্রজাদের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের বিরোধী ছিল। প্রজারা শিক্ষিত হলে রাজশক্তির প্রতি অন্ধ ভক্তি ও আনুগত্য থাকবেনা এরূপ ভীতি ছিল।

ইউরোপেও ফরাসী বিপ্লবের আগে এরূপ অবস্থা ছিল। বিপ্লবের পরেও নারী শিক্ষার ব্যাপারে সব সমাজই ছিল রক্ষণশীল এবং নারী শিক্ষার বিরোধী। রুশ বিপ্লবের পরই নারী পুরুষ নির্বিশেষে সব মানুষের শিক্ষার দাবী সারা বিশ্বে গণআন্দোলনের প্রধান দাবী হয়ে উঠে। রুশ বিপ্লবের পর রবীন্দ্রনাথ সে দেশের গণশিক্ষার আয়োজন দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। কবি যৌবনে নিজের জমিদারীর প্রজাদের অজ্ঞতা ও দুর্দশা দেখে সারাদেশের সাধারণ মানুষের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেবার দাবী জানিয়ে বহু প্রবন্ধ লিখেছেন। কবির এই দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে কবি-বন্ধু রাধাকিশোর মাণিক্য বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। কর্ণেল মহিমচন্দ্রও কবির এই দৃষ্টিভঙ্গীর সমর্থক ছিলেন। ফলে বিংশ শতাব্দীর শুরুতে মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্যের সময় প্রকৃত শিক্ষা প্রসারের উদ্যোগ শুরু হয়।

পলিটিক্যাল এজেন্টের রিপোর্টে বলা হয়েছে মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের সময় রাজধানীর আশে পাশে ষোলটি পাঠশালা স্থাপণ করা হয়েছিল। মোট ছাত্র সংখ্যা ছিল ৪৬৭ জন। তাদের মধ্যে বেশীর ভাগই বাঙ্গালী এবং মণিপুরি।

মহারাজা রাধাকিশোর সিংহাসনে বসার এক বছরের মধ্যেই ভূমিকম্পে রাজপ্রাসাদের ভয়ানক ক্ষতি হয়েছিল। অবিলম্বে রাজপ্রাসাদ তৈরী করার জন্য দশ লক্ষ টাকা ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েছিলেন। চাকলা রোশনাবাদের জমিদারী থেকে কর বৃদ্ধি করে সুদসহ এই ঋণ পরিশোধ করা হয়েছিল। মহারাজা ইচ্ছে করলে শিক্ষা প্রসারের জন্যও এরূপ ঋণ নিতে পারতেন। সে যুগে মাসিক ১০ টাকা বেতনে শিক্ষক নিয়োগ করা যেত। প্রতিটি সম্প্রদায়ের সর্দারদের নির্দেশ দিলে প্রতিটি পাড়ায় স্কুল গৃহ নির্মাণ করতে রাজার কোন খরচই লাগতনা। কিন্তু মহারাজা হয়তো পারিষদদের পরামর্শে গ্রামীণ প্রজাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে তেমন কোন উৎসাহ দেখান নি। রবীন্দ্রনাথকে এক

চিঠিতে মহারাজা লিখেছেন "রাজ্যের উন্নতি কল্পে কয়েকটি কার্য করিব বলিয়া মনে করিয়াছিলাম কিন্তু ভূমিকম্প হেতু আমার সকাল অভিপ্রায় পন্ড হইয়াছে। অর্থের অভাবে নিম্নলিখিত কতিপয় কার্য সম্পূর্ণ করিতে না পারিলেও অন্ততঃ আরম্ভ করিয়া রাখিতে ইচ্ছা করি।" যথা ঃ-

১) বালিকা বিদ্যালয়,

২) আখাউড়ার রাস্তা

৩) টেকনিক্যাল স্কুল

৪) আইন প্রণয়ন

৫) রাজধানী হইতে খোয়াই পর্যন্ত রাস্তা

৬) হাওড়ার পুল।

এই চিঠি থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় মহারাজা রাধাকিশোর গ্রামীণ প্রজাদের শিক্ষার বিষয়ে কিছুই ভাবেন নি। মহারাজা রাধা কিশোরের সময়ও রাজধানী এবং বিভাগীয় শহরের আশেপাশে কিছু পাঠশালা ও প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। ছাত্রদের অধিকাংশই ছিল বাঙ্গালী, হিন্দু - মুসলমান এবং মণিপুরী। সারা রাজ্যে একটি মাত্র হাই স্কুল ছিল উমাকান্ত একাডেমী। কৈলাশহর এবং বিলনীয়ার এম. ই. স্কুল উমাকান্ত একাডেমীর ব্রাঞ্চ হিসেবে কাজ শুরু করে। এই সময় উমাকান্ত একাডেমীর বিল্ডিং নির্মাণ করা হয়েছিল, চল্লিশ হাজার টাকা খরচ করে। এই স্কুলের দুটি বোর্ডিং ছিল। একটিতে পার্বত্য এলাকার ছাত্ররা মাসিক ৫ টাকা বৃত্তি পেয়ে পড়াশোনা করতো। অন্যটিতে নিজেদের খরচে বাঙ্গালী ও মণিপুরী ছাত্ররা থাকতো।

রাজধানীর ঠাকুর লোকেরা যাতে উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করে রাজকর্মচারী হিসেবে নিযুক্ত হতে পারে তার জন্য ঠাকুর বোর্ডিং এ সরকারী খরচে ছাত্রদের পড়ার ব্যবস্থা করা হয়। দুজন সর্বক্ষণের শিক্ষক বোর্ডিংএ বিশেষ ভাবে প্রাইভেট কোচিং দিতেন। ছাত্ররা উমাকান্ত একাডেমীতেই পড়ত।

রাজকুমার ও কুমারীদের বিশিষ্ট গৃহশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার পর কুমারদের কুমিল্লায় উচ্চশিক্ষার জন্য পাঠাবার ব্যবস্থা করা হয়। এই জন্য কুমিল্লায় কুমার-বোর্ডিং প্রতিষ্ঠা করা হয়।

যুবরাজ বীরেন্দ্র কিশোরের জন্য রবীন্দ্রনাথের সাহায্যে বিলেত থেকে একজন উদার দৃষ্টি সম্পন্ন ইংরেজ গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করা হয়। এই সময় বৃটিশ সরকার দেশীয় রাজ্যের যুবরাজদের বিশেষ পাঠ্যক্রমসহ বিশেষ বিদ্যালয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা করে। কিন্তু

রাধাকিশোর মাণিক্য নানা অজুহাতে যুবরাজকে শিক্ষার জন্য বাইরে পাঠাতে অস্বীকার করেন।

আগরতলায় একটি কারিগরী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে লোহার কাজ - পিতলের কাজ এবং কারু শিল্পের কাজ শিক্ষার আয়োজন করেন। পরে ফিটার এবং তাঁতের কাজ শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। মোট ১৮ জন ছাত্রের মধ্যে উপজাতি ছাত্র সংখ্যা ছিল পাঁচজন। পার্বত্য অঞ্চলের উপজাতিদের মধ্যে তখনও শিক্ষার কোন প্রয়োজন সম্পর্কে উপলব্ধি ছিলনা। স্বয়ং সম্পূর্ণ অনাড়ম্বর জীবন যাপনের সুযোগের ফলেই এরূপ মনোভব গড়ে উঠেছিল।

আগরতলায় উচ্চ শিক্ষার জন্য মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্য একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কলেজে প্রথম বর্ষে ৯ জন ছাত্র এবং দ্বিতীয় বর্ষে মাত্র ৮ জন ছাত্র ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন না পেয়ে কলেজটি বন্ধ হয়ে যায়।

রাধাকিশোর মাণিক্য বৃত্তি দিয়ে প্রতি বছর কিছু ছাত্রকে শান্তিনিকেতন পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। ঠাকুর পরিবারের ছাত্রদের প্রশাসনিক প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করেন। শিক্ষকদের বেতন বা বিদ্যালয় পরিদর্শন বিষয়ে কিছুই জানা যায়নি।

মহারাজা বীরেন্দ্র কিশোরের সময়ও শিক্ষা প্রসারের তেমন কোন উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায়নি। রাজ্যলাভের পর পাঁচ বছরের মধ্যেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। যুদ্ধ শেষ হবার পর পাঁচ বছরের মধ্যেই মহারাজার মৃত্যু হয়। এই সময়ের মধ্যে রাজকার্য পরিচালনায় আধুনিক রীতিনীতি প্রচলন করার দিকেই বেশী মনোযোগ দিয়েছিলেন।

মহারাজা বীর বিক্রম কিশোরই রাজ্যের প্রথম এবং শেষ মহারাজা যিনি আধুনিক শিক্ষার সুযোগ লাভ করে এবং ইউরোপ-আমেরিকা ভ্রমন করে এক আধুনিক মনের অধিকারী হয়েছিলেন। তিনি প্রকৃতই প্রজা কল্যাণ মূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করে রাজ্যের সমস্ত প্রজাদের উন্নতির পথ প্রশস্ত করতে আন্তরিক উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

১৯২৮ সালে মহারাজার অভিষেক হয়। মাত্র তিন বছরের মধ্যেই ১৯৩১ সালে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা প্রসার বিল পাশ করেন। রাজধানীতে একটি কলেজ ও গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে উদ্যোগী হন। বিদ্যাপত্তন পরিকল্পনায় রাজ্যে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ মহারাজার সব পরিকল্পনায় বড় রকমের বাধা হয়ে দাঁড়ায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জনশিক্ষা আন্দোলনের নেতারা যখন মহারাজার কাছে সাড়ে চারশ প্রাথমিক বিদ্যালয় অনুমোদনের প্রার্থনা নিয়ে দেখা করেন মহারাজা অত্যন্ত খুশী হয়ে সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয়গুলোর অনুমোদন দেন। রাজ্যের অস্থির অবস্থায় মহারাজার মানসিক বিপর্যয়ের মধ্যেও বিভিন্ন বিভাগে উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

আগরতলায় এম.বি বি. কলেজটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভ করে।

মহারাণী কাঞ্চনপ্রভা দেবীর ১৯৪৭ সালের ১৫ ই আগষ্টে ভারতের স্বাধীনতা দিবস পালন উপলক্ষে প্রদত্ত ভাষণে জানা যায়, রাজন্য যুগের শেষ পর্বে ত্রিপুরায় একটি বালিকা বিদ্যালয় সহ মোট ৯ টি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়, ২৫ টি মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয় এবং ২৫০ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় চালু ছিল।

জনশিক্ষা আন্দোলনের সময় অনুমোদিত সব বিদ্যালয় চালু রাখা যায়নি। প্রকৃত পক্ষে কতগুলো স্কুল চালু হয়েছিল, কতজন শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছিল, কয়টি স্কুল ঘর তৈরী হয়েছিল, শিক্ষকদের বেতন কত ছিল ইত্যাদি তথ্য কারো কোন লেখাতেই পরিষ্কার ভাবে জানা যায়নি। মুক্তি পরিষদের সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলনে জনশিক্ষা প্রসারের গতি স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। মহারাণী কাঞ্চন প্রভা দেবীর ভাষণে তারই প্রতিফলন ঘটেছে।

## রাজন্য যুগে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা

ত্রিপুরা রাজ্যে বৃটিশ সরকারের পরামর্শে প্রথম দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হয় ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের শাসন কালে।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম বছর মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রতি সন্মান প্রর্দশনের প্রতীক হিসাবে ত্রিপুরা রাজ্যের প্রথম হাসপাতাল - ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হাসপাতাল (ভি.এম. হাসপাতাল) প্রতিষ্ঠিত হয়, মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্যের শাসন কালে। কিন্তু হাসপাতালে চিকিৎসার সুযোগ ছিল খুবই সীমিত।

১৯৩৪ সালে রাজ্যের শেষ মহারাজা বীর বিক্রমের সময় শেয়াল-কুকুরে কামড়ের চিকিৎসা শুরু হয়। এর আগে চিকিৎসার জন্য যেতে হতো শিলং।

১৯৩৮ সালে প্রথম ভি.এম হাসপাতালে মল মূত্র পরীক্ষার ব্যবস্থা চালু হয়।

১৯৪৫ সাল পর্যন্ত রাজ্যের কোথাও কোন প্রাইভেট ডাক্তার ছিলনা।

রাজ পরিবারে চিকিৎসার জন্য কলকাতা বা ঢাকা থেকে ডাক্তার কবিরাজ আনা হতো। রাজকর্মচারীরা কুমিল্লা বা পার্শ্ববর্তী বৃটিশ এলাকায় গিয়ে চিকিৎসার সুযোগ নিতেন। পার্বত্য প্রজাদের একমাত্র ভরসা ছিল বনজ ঔষধ এবং গ্রামীন ওঝা।

ত্রিপুরার আবহাওয়া ছিল অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। কঠিন রোগে আক্রান্ত হলে চিকিৎসার অভাবে অকালে প্রাণ যেত। রাজ্যের তিনজন মহারাজা বসন্ত রোগে আক্রান্ত

হয়ে মারা গেছেন। মোগল সেনারা মহামারীর আক্রমণে অধিকাংশ প্রাণ হারিয়েছে বাকীরা পালিয়ে গেছে। বাঙ্গালী প্রজারা স্থায়ীভাবে বসবাসে উৎসাহ বোধ করেনি।

আগরতলায় রাজধানী স্থানান্তর হবার পরেও স্বাস্থ্য বিষয়ে উল্লেখ যোগ্য কোন উন্নতি হয়নি। কয়েকজন কবিরাজ ও হোমিওপ্যাথি ডাক্তার রাজার পৃষ্ঠ পোষকতায় চিকিৎসা করতেন। ভি.এম হাসপাতালে কয়েকজন ডাক্তার ছিলেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর নোয়াখালীর দাঙ্গায় উদ্বাস্তু হয়ে কিছু কিছু ডাক্তার স্থায়ী ভাবে ত্রিপুরায় এসেছেন। দেশ ভাগের পর আগরতলায় প্রথম আসেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তীর বড়ভাই ডাঃ নন্দলাল চক্রবর্তী। তার পর আসেন ডাঃ রাখাল ঘোষ এবং ডাঃ জোতিষ চক্রবর্তী। এরাই হলেন রাজন্য যুগের শেষ প্রতিনিধি।

## রাজন্য যুগে যোগাযোগ ব্যবস্থা

রাজন্য যুগে ত্রিপুরায় রাস্তা-ঘাট ছিলনা। গ্রামীণ রাস্তা দূরের কথা রাজকার্য পরিচালনার জন্য মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের সময় ত্রিপুরা রাজ্যকে উত্তর-দক্ষিণ ও মধ্য তিনটি বিভাগে ভাগ করার পরও যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য কোন উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। রাজা বা রাজপ্রতিনিধি বিভাগ পরিদর্শনে যেতে হলে একমাস আগে থেকে প্রস্তুতি নিয়ে তৈতুন প্রথায় বেগার-খাটা প্রজাদের সাহায্যে জঙ্গল কেটে হাতি চলাচলের উপযুক্ত রাস্তা তৈরী করা হতো। কিছুকাল পর আবার জঙ্গলে আবৃত হতো এসব রাস্তা। পরে বৃটিশ এলাকায় রেলপথ তৈরী হবার পর প্রথমে নৌকাযোগে মোগরা ষ্টেশান থেকে, পরে আখাউড়া স্টেশান হবার পর আখাউড়া স্টেশন থেকে বিভিন্ন বিভাগে বা কলকাতা ও ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে যাতায়াত করা হতো। বৃটিশ সাম্রাজ্যের যে কোন অঞ্চলে যাতায়াতে কোন প্রকার বাধা নিষেধ ছিলনা। দেশ বিভাগের পর যাতায়াতে বাধা নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। বিভাগীয় দপ্তরগুলো বৃটিশ সীমান্তে স্থাপন করা হয়েছিল যাতায়াতের সুবিধার জন্য।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ও ত্রিপুরায় রাস্তাঘাট নির্মাণের প্রয়োজন অনুভূত হয়নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানীরা বার্মা দখল করে মণিপুর সীমান্তে চলে আসায় উদ্বিগ্ন বৃটিশ কর্তৃপক্ষ সামরিক প্রয়োজনে কুমিল্লা থেকে আগরতলা যোগাযোগের রাস্তাঘাট নির্মানে জরুরী উদ্যোগ গ্রহণ করে। আগরতলা বিমান বন্দরটিও যুদ্ধের প্রয়োজনে তৈরী হয়।

ত্রিপুরায় বিভিন্ন নদীতে ছোট ছোট নৌকায় যাত্রী ও মাল চলাচলের ব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছিল। বাঙ্গালী মাঝীরা এসব নৌকা চালাতো। নদীপথে বাঁশ বিক্রীর জন্য চালান হতো। বাঁশের ভাড়ে ছন-কার্পাসও চালান হতো।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে প্রকৃত রাস্তাঘাট তৈরী হয়নি। মুসলমান আক্রমণের সময় সোনামুড়া উদয়পুর এবং কসবা উদয়পুর চলাচলের পায়ে হাঁটা পথ ছিল। আগরতলা থেকে পুরাতন আগরতলা যাতায়াতের একটা পথ ছিল। মটর চলাচলের রাস্তা হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময়।

## রাজন্য যুগে রাজ্যের অর্থনীতি

ত্রিপুরার প্রধান সম্পদ হল বনজ সম্পদ। কিন্তু ইংরেজ আগমনের আগে বনজ সম্পদের কোন মূল্য ছিলনা। ত্রিপুরার সীমান্তে সিলেট-ত্রিপুরা-নোয়াখালী, চট্টগ্রাম চারটি জেলা ইংরেজ আমলে প্রতিষ্ঠিত হয়। আগে এ সব সমতল অঞ্চলও জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। জেলাশহরে এবং গ্রামাঞ্চলে দ্রুত জনবসতি গড়ে উঠায় ত্রিপুরার বনজ সম্পদের একটি ভাল বাজার সৃষ্টি হয়। প্রচুর বাঁশছনের রপ্তানী হতে থাকে। স্থানীয় উপজাতিরা নগদ অর্থ পেতে থাকে। রাজকোষেও আয় বৃদ্ধি হয়। তিল-সরিষা-কার্পাস প্রভৃতি জুমের ফসল ও নগদ টাকায় বিক্রী হতে থাকে। কিন্তু রাজ্যে উন্নত বাজার অর্থনীতি না থাকায় মহাজনের শোষণ তীব্র আকার ধারণ করে। সারা রাজ্যে মাত্র একুশটি ছোট ছোট বাজার ছিল। বহু দূর থেকে দূর্গম পথে পিঠে বোঝা নিয়ে বাজারে আসতে হতো।

ইংরেজদের পরামর্শে ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের সময় প্রথম বনজ সম্পদ সম্পর্কীয় বনআইন তৈরী হয় এবং মহারাজার আয়ের একটি উৎস হিসেবে চিহ্নিত হয়। ১৯১৩ সালে ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট গঠন করে ৩২ টি মূল্যবান গাছ কাটা নিষিদ্ধ হয়। একজন অফিসার নিযুক্ত করে মূল্যবান গাছের বাগান করা শুরু হয়। ভারত ভুক্তির পূর্ব পর্যন্ত মাত্র ৯৩ একর জমিতে শাল, কড়ই, গামাই ,জারুল ইত্যাদির বাগান তৈরী হয়।

ব্যাপক জুমচাষের ফলে রাজ্যের বিপুল পরিমান বাঁশ ধ্বংস হয়েছে। উপযুক্ত যত্ন ও নজরদারীর অভাবে মূল্যবান গাছ কেটে জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। অবিবেচক শিকারীদের হাতে প্রাণী সম্পদ ও ধ্বংস হয়েছে। এতে রাজকোষের বিরাট ক্ষতি হয়েছে।

ত্রিপুরায় বহুজাতের ঔষধী গাছ ও লতা পাতা পাওয়া যায়। কিন্তু রাজন্য আমলে এসবের অনুসন্ধান বা গবেষণার কোন সুযোগ ছিলনা। বন থেকে যারা সংগ্রহ করে নিয়েছে তাদের কাছ থেকে রাজকোষে কিছুই আসেনি।

রাজন্য যুগে ত্রিপুরায় কৃষিক্ষেত্রে উন্নতি সামান্যই হয়েছে। অধিকাংশ প্রজা জুমচাষের উপর নির্ভরশীল থাকায় সমতল চাষের অগ্রগতি ঘটেছে খুবই ধীর গতিতে। খাদ্যের চাহিদা ছিল খুবই কম। বেকার সমস্যা ও ছিলনা। কাজেই আর্থিক উন্নতি লক্ষনীয় না হলেও আধা সামন্ততান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় কোন সংকট সৃষ্টি হয়নি।

খুব অল্পপরিমান সমতল জমিতে লাঙ্গল চাষ হতো। একর প্রতি উৎপাদনও খুবই কম ছিল। আধুনিক খামার সম্পর্কে প্রজাদের মধ্যে কোন ধারণাই ছিল না। বাঙ্গালী কৃষকরাও ছিল নিরক্ষর বা অর্ধশিক্ষিত । অধিকাংশ জমিতে একবার মাত্র ফসল পাওয়া যেত। ফলের বাগিচা করার মত প্রচুর সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কোথাও তেমন উদ্যোগ দেখা যায়নি।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইংরেজদের পরামর্শে মহারাজা বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্য চা-বাগান প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হন। কৈলাশহরে প্রথম চা-বাগান গড়ে উঠে। কিন্তু ত্রিপুরার উপজাতিরা চা-বাগানে শ্রমিকের কাজ করতে রাজী ছিলনা। ফলে আসাম, বাংলা, বিহার ও উড়িষা থেকে ভীল, ওরাও, সাওঁতাল, মুন্ডা ইত্যাদি নানা সম্প্রদায়ের উপজাতিদের চা-বাগানে কাজের জন্য বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে ডেকে আনতে হয়েছে। মহারাজা বীবেন্দ্র কিশোর চাকলা রোশনাবাদের বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের ত্রিপুরায় চা-বাগান করার জন্য আমন্ত্রণ জানান। তাদের উদ্যোগে সদর বিভাগে ও ধর্মনগরে কয়েকটি চা-বাগান গড়ে উঠে। মহারাজার অনুমতি ছাড়া চা-বাগান করা যাবে না এরূপ ঘোষনা ছিল। ইউরোপীয় বা ইংরেজ বণিকদের বাধা দেবার উদ্দেশ্যে এরূপ ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল।

চা-বাগান থেকে নজরানা ও শুল্ক বাবত রাজার আয় বেড়েছিল। কিন্তু উপজাতি প্রজাদের একাজে আকৃষ্ট করা যায়নি। ঘন জঙ্গল কেটে চা-বাগান করতে প্রচুর শ্রমিকের দরকার হয়। সারাবছর গাছের ও বাগানের যত্নকরা এবং চা-পাতা সংগ্রহ করার জন্য স্থায়ী শ্রমিকের দরকার হয়। এজন্য রাজন্য আমলে চা-বাগানের আয় সীমিত হয়েছিল।

ত্রিপুরায় উল্লেখযোগ্য কুটির শিল্পের অস্তিত্ব ছিল না। উপজাতিরা বাজারে বিক্রীর জন্য কোন দ্রব্য তৈরী করতো না। বাঁশের তৈরী কিছু পণ্য বাজারে বিক্রী করা হতো। কিন্তু রপ্তানী করার মত কোন পণ্য ছিল না।

ত্রিপুরায় কোন ধাতু আবিষ্কৃত হয়নি। সোনা-রূপা - তামা-লোহা-সীসা-ব্রোঞ্জ

ইত্যাদির ব্যবহার পাঁচ হাজার বছর আগেই মানব সমাজে প্রচলিত হয়েছে। কিন্তু ত্রিপুরায় কোন ধাতু শিল্পের অস্তিত্ব ছিল না। ব্যবহারও ছিল খুবই সীমিত ছিল।

ত্রিপুরায় রাজাদের আয়ব্যয়ের কোন বাজেট ছিল না। যখন যা দরকার রাজার আদেশ মত সংগ্রহ করা হত। বছরে একবার কর আদায় হত। প্রজাদের বেলায় দেখা যায় জুমের ফসল ভাল হলে আমোদ প্রমোদে প্রচুর খরচ করা হতো। আবার অভাবের দিনে বনের ফলমূল ও পশু শিকার, মাছ শিকার একমাত্র অবলম্বন হয়ে উঠতো। ব্রিটিশ সরকারের নির্দেশে প্রথম বাজেট প্রথা চালু হয় ত্রিপুরায়। রাজ্যের অর্থনীতি চাকলা-রোশনাবাদ জমিদারীর আয়ের উপর নির্ভরশীল ছিল।

রোগে মহামারীতে বনজ ঔষধ এবং ওঝার মন্ত্র বাঁচা মরার একমাত্র উৎস ছিল।

রাজ্যের রাজা এবং প্রজা কারো অবস্থাই সচ্ছল ছিল না। তবে মনের মধ্যে উদারতা ছিল। অতিথি বৎসল রাজা ও প্রজার মানসিকতা ইতিহাসে অমূল্য সম্পদ হয়ে রইল।

## রাজ্যের সংস্কৃতি-সংস্কার ও কুসংস্কার

ত্রিপুরা রাজ্যের সংস্কৃতি দুইভাগে বিভক্ত। প্রথমভাগে রয়েছে রাজপরিবার এবং রাজধানীতে বসবাসকারী রাজ পরিবারের আত্মীয়স্বজন ও রাজকর্মচারীদের সংস্কৃতি। দ্বিতীয় ভাগে রয়েছে ত্রিপুরার উপজাতি ও অন্যান্য প্রজাদের সংস্কৃতি। একটিকে বলা যায় রাজকীয় সংস্কৃতি দ্বিতীয়টিকে বলা যায় প্রজা সংস্কৃতি।

## রাজকীয় সংস্কৃতি

রাজমালায় বলা হয়েছে প্রাচীনযুগে মহারাজা ত্রিলোচন চতুর্দ্দশ দেবতার পূজা প্রচলন করেছেন। গবেষক শান্তিময় চক্রবর্তী 'ককবরকের উৎস সন্ধান' নামক গ্রন্থে চতুর্দ্দশ দেবতার মন্ত্র ও চল্লিশটি প্রাচীন শ্লোক বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, প্রাচীনযুগ থেকেই রাজবংশে সংস্কৃত, পালি, চর্যাপদ ও স্থানীয় বড়ো ভাষার মিশ্রণ ঘটেছে। কাজেই রাজকীয় সংস্কৃতি প্রধানত আর্য সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। ঋকবেদের সুর মন্ত্রগুলিতে ধ্বনিত হয়েছে। পূর্বপুরুষের আচরিত রীতি, প্রথা, ধর্ম ও কর্মের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। বড়ো ভাষায় কক শব্দের ব্যবহার নেই। কক শব্দটিও সংস্কৃত ক প্রত্যয় যোগে সৃষ্টি হয়েছে।

ধর্মীয় আচার রীতি ও সামাজিক আচরণে এবং সাহিত্য শিল্প ও সঙ্গীত চর্চায় রাজকীয় সংস্কৃতি আর্য সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। মধ্যযুগে শিল্প ও ভাস্কর্যে মুসলিম ও বৌদ্ধ প্রভাব পড়েছে। রাজপরিবারে মণিপুরী সংস্কৃতি গুরুত্ব পেয়েছে। বাংলা ভাষা রাজভাষার মর্যাদা পাওয়ায় বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রভাব পড়েছে সবচেয়ে বেশী।

আধুনিক যুগে মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য ভারতীয় সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ গুণীজনদের আমন্ত্রণ করে রাজ্যে এক উন্নত সংস্কৃতির জন্ম দেন। বিংশ শতাব্দীর রাজারা ইউরোপীয় সংস্কৃতির ধারাকেও অভ্যর্থনা জানান। মোগল প্রভাব মুক্ত হয়ে এই সময় রাজাদের পোষাক পরিচ্ছদ, আচার-আচরণ ও চিন্তাধারায় প্রাশ্চাত্য প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়।

## প্রজা সংস্কৃতি

ত্রিপুরায় বিভিন্ন উপজাতি গোষ্ঠীর ভাষায় রীতিনীতিতে সামান্য পার্থক্য থাকলেও জুমচাষ ভিত্তিক সংস্কৃতির মধ্যে ঐক্য লক্ষ্য করা যায়। জুমকে কেন্দ্র করে নানা সামাজিক অনুষ্ঠান এবং ধর্মীয় আচরণ, নৃত্যে, সঙ্গীতে, খেলাধূলায়, রূপকথায়, ধাঁধায়, মিল খুঁজে পাওয়া যায়। একটু গভীর ভাবে বিশ্লেষণ করলেই উপজাতি সংস্কৃতির সর্ব বিভাগে আর্য সংস্কৃতির এক রূপান্তরিত আত্মীকরনের আভাস আবিষ্কার করা যায়।

হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতিকে উপজাতিরা নিজেদের মত করে রূপান্তর ঘটিয়েছেন। সামাজিক ও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠাণে নিজেদের প্রাচীন ঐতিহ্য বজায় রেখে নিজেদের অজ্ঞাতসারেই অনেক কিছু গ্রহণ করেছেন।

ত্রিপুরা রাজ্যে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান চারটি প্রধান ধর্মের মানুষ পাশাপাশি বসবাস করছে। সুদীর্ঘকাল ধরে পরস্পরের মধ্যে সমন্বয় প্রক্রিয়া বিকাশ লাভ করছে। চিন্তায়, আচরণে, পোষাকে, সংঙ্গীতে এর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। হস্তশিল্পে-গৃহনির্মাণ ও গৃহসজ্জায় সংস্কৃতির রূপ প্রকাশ পায়।

শিক্ষার অভাব এবং আর্থিক দীনতা সংস্কৃতির বিকাশে একটা বড় বাধা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিল্প বাণিজ্যের কেন্দ্রগুলো মিশ্র সংস্কৃতির বিকাশে খুবই সহায়ক হয়। ত্রিপুরায় রাজন্য যুগে এ সুযোগ গড়ে উঠে নি। উপযুক্ত সামাজিক পরিবেশ ছাড়া সুস্থ সবল সংস্কৃতি গড়ে উঠতে পারেনা। আবার একটা জাতির সংস্কৃতির মধ্যে সমন্বয়ের পরেও একটা আঞ্চলিকতার ছাপ থাকে। ত্রিপুরায় মিশ্র সংস্কৃতির মধ্যে সেই বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

# সংস্কার

পৃথিবীর সব সমাজেই আদিমকাল থেকে নানা সংস্কার বাসা বেঁধেছে। শিক্ষা-দীক্ষা ও বিজ্ঞান চর্চার মাধ্যমে বহু সংস্কার বিলুপ্ত হয়ে যায়। আবার কিছু নতুন সংস্কার জন্ম নেয়। যে সব সংস্কার কারো ক্ষতি করেনা বরং বিপদে আপদে সুখে-দুঃখে শান্তি ও সান্ত্বনা যোগায় সেগুলি মানুষ সহজে ছাড়তে পারেনা।

ত্রিপুরার উপজাতি, বাঙ্গালী ও মণিপুরী সমাজে এরকম বহু সংস্কার প্রচলিত আছে। জন্ম-মৃত্যু-বিবাহের অনুষ্ঠানে এরকম বহু সংস্কার নির্বিবাদে সবাই মেনে চলে। যুক্তিহীন আচার অনুষ্ঠান ও রীতিনীতি শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হয়ে যায়। নবজাত শিশুর নামকরণে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সংস্কারের কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায। বিবাহ সংক্রান্ত আচার অনুষ্ঠানে নানা সংস্কার রয়েছে। মৃতদেহ সৎকারের আগে পরে নানা সংস্কার প্রচলিত রয়েছে। জুমচাষের আগে দেখা স্বপ্নকে সত্য বলে মনে করা এবং চাষ শুরু করার আগে কিছু রীতি নীতি অনুসরণ করা এরকম বহু সংস্কার আধুনিক শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বদলে যাচ্ছে। বিধবাদের একবৎসর ধরে অপবিত্র জ্ঞান করা একটা অযৌক্তিক সংস্কার।

উপজাতি সমাজে বাল্য বিবাহ নিষিদ্ধ হয়েছে এবং বিধবা বিবাহ অনুমোদিত হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে বিধবা বিবাহ শুধুমাত্র বিপত্নীক পুরুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। আধুনিক বহু সভ্য সমাজের সামনে এটা একটা চমৎকার অনুকরণ যোগ্য সংস্কার। সব সমাজের কাছেই অনেক কিছু শেখার আছে। এই আদান প্রদানের মধ্য দিয়েই সভ্যতার বিকাশ ঘটে।

প্রজাদের মধ্যে বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধ থাকলেও রাজপরিবারে তা মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের সময় পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। বীরচন্দ্র মাণিক্যের দুই কন্যা আট বছরের কুমুদিনী এবং পাঁচ বছরের মৃণালিনীর একই দিনে বিয়ে হয়, রাধা মোহন ঠাকুরের দুই পুত্র ষোল বছরের হৃদয় রঞ্জন এবং চৌদ্দ বছরের রেবতী মোহনের সঙ্গে। যৌবন উদ্‌গমের পরই বালিকা বধুরা শ্বশুর বাড়ী গিয়েছিলেন। কিছু কিছু প্রভাবশালী পরিবারে এরূপ বাল্য বিবাহের প্রচলন দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল।

# কুসংস্কার

যে সব সংস্কার মানুষ এবং সমাজের প্রচন্ড ক্ষতিসাধন করে তাকেই বলা যেতে পারে কুসংস্কার। ধর্মের নামে পৃথিবীর সব দেশেই নানা ধরণের কুসংস্কার জন্ম নিয়েছে। সমাজের সর্দার, মোড়ল, রাজা, মহারাজারা নিজেদের স্বার্থে ধর্মীয় কুসংস্কারকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বলে সমাজের উপর চাপিয়ে দিয়েছে।

**নরবলি প্রথা, ক্রীতদাস প্রথা, সতীদাহ প্রথা,** রাজসেবার নামে **তৈতুন প্রথা,** ত্রিপুরায় বহু প্রাচীনকালে থেকেই প্রচলিত ছিল। চতুর্দশ দেবতার মন্দিরে, ভুবনেশ্বরী ও ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে প্রতিবছর একহাজার নরবলি দেওয়া হতো। আসামে কামাখ্যা মন্দিরে, কলকাতার কালীমন্দিরে ও বহুকাল নরবলি প্রথা প্রচলিত ছিল। বিংশ শতাব্দীর আবিষ্কৃত বহু প্রাচীন সভ্যতার ক্ষেত্রেও নরবলি প্রথার প্রচলনের ইতিহাস জানা গেছে। আদিম সমাজে পৃথিবীর প্রায় সবদেশে কৃষি দেবতাকে খুশী করার জন্য জমিতে চাষ দেবার আগে পূজা ও নরবলি দেওয়া হতো। জমিতে মানুষের রক্ত ছিটিয়ে দিলে বেশী ফসল পাওয়া যাবে এই অন্ধ বিশ্বাসে পুরোহিতের নির্দেশে নরবলি দেওয়া হতো। মানুষ বর্বর অবস্থায় যে কোন পশুর মাংস খেতো। মানুষের মাংসও খেতো। যুদ্ধ বন্দীদের হত্যা করে সমাজের সবাই মিলে মানুষের মাংস খেত।

ত্রিপুরায় মহারাজা ধন্যমাণিক্য **নরবলি প্রথা** বন্ধ করেন। কিন্তু যুদ্ধ বন্দী বা দেশদ্রোহী এবং অপরাধীদের ক্ষেত্রে মন্দিরে বলি দেওয়ার ব্যবস্থা বহাল রাখেন। মহারাজা গোবিন্দ মাণিক্যকে রবীন্দ্রনাথ রাজর্ষিরূপে কল্পনা করে বিসর্জন নাটকে মহৎ আদর্শ রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কিন্তু ইতিহাস বলে, রিয়াং সর্দাররা, রিয়াং রাজার অত্যাচারে বিরক্ত হয়ে ত্রিপুরা রাজের সাহায্য ও আশ্রয় লাভের জন্য নদীপথে আসার সময় গঙ্গা পূজায় বাধা সৃষ্টি করার অপরাধে দুজন সর্দারকে মস্তক মুন্ডন করে গঙ্গা পূজায় বলি দেবার নির্দেশ দেন গোবিন্দ মাণিক্য। এই ঘটনায় রিয়াংদের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দেওয়ায় মহারাজা সেনা পাঠিয়ে সব সর্দারদের বন্দী করে মৃত্যু দন্ডের আদেশ দেন। মহারাণী গুণবতী রাজ্যের অমঙ্গল আশংকা করে নিজে রিয়াং সর্দারদের সঙ্গে কারাগারে মিলিত হয়ে রাজার প্রতি আনুগত্য স্বীকারের বিনিময়ে মৃত্যুদন্ড রদ করার ব্যবস্থা করেন। নিঃসন্তান মহারাণী স্তনদুগ্ধ পান করিয়ে বিদ্রোহী রিয়াংদের সন্তান রূপে বরণ করে নেন। পরবর্তী কালে কবে কি ভাবে নরবলি প্রথা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়েছিল তা জানা যায়নি।

**ক্রীতদাস প্রথার** সূত্রপাত হয়েছে প্রাচীন যুগে। কৃষি বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে কৃষি কাজে ব্যবহারের জন্য যুদ্ধ বন্দীদের ক্রীতদাস রূপে ব্যবহার করা হতো। প্রকাশ্যে

বাজারে পশুদের মত বন্দী ক্রীতদাসদের বিক্রী করা হতো। আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপনের পর ক্রীতদাসদের আন্তর্জাতিক বাজার সৃষ্টি হয়।ইউরোপীয় ব্যবসায়ীরা দেশীয় দালালদের সাহায্যে হাজার হাজার ক্রীতদাস - ক্রীতদাসী সংগ্রহ করে জাহাজ ভর্তি করে চালান দিত। শুধু আমেরিকায় ক্রীতদাস ব্যবসার জন্য ৪০ টি স্টীমার ব্যবহার করা হতো। আফ্রিকা থেকে জোর করে মানুষদের বন্দী করে পশুর মতো শৃংখলে বেঁধে আমেরিকায় চালান দিত। মধ্যযুগে ভারতে বিদেশী আক্রমণ কারীরা লুণ্ঠিত মাল বহনের জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষকে বন্দী করে নিয়ে যেতো। আমেরিকায় ক্রীতদাস বিদ্রোহের পর আধুনিক যুগের চিন্তা বিদরা এই বর্বর ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করেন।ইউরোপের বহুদেশে আন্দোলন সৃষ্টি হয়। তারই প্রভাবে ইংরেজরা উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতে ক্রীতদাস প্রথা নিষিদ্ধ করে। ত্রিপুরার মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য ইংরেজদের নির্দেশে ক্রীতদাস প্রথা নিষিদ্ধ করেন। ১৮৭৪ সালে ক্রীতদাস প্রথা নিষিদ্ধ হয়।

ত্রিপুরায় খুব সম্ভবত ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাবে **সতীদাহ প্রথা** প্রচলিত হয়। রাজপরিবারে এই প্রথায় রাজার সঙ্গে বহু রাণীকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হতো।সর্দারদের মধ্যে রাজকীয় মর্যাদা বোধ থাকায় সর্দারদের মৃতদেহের সঙ্গেও বহু পত্নীকে চিতায় তুলে সতী বানানো হতো। এই ভয়ংকর প্রথায় প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ নারীকে সারা ভারতে মৃত স্বামীর চিতায় জোর করে পুড়িয়ে মারা হতো। রামমোহন রায় এই প্রথার বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলেন। ব্রাহ্মণ সমাজ ভয়ানক ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে । লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক রামমোহনের পাশে এসে ১৮২৯ সালে সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করে আইন জারি করেন।আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে শাস্তির ব্যবস্থা করেন। ত্রিপুরায় মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য অত্যন্ত রক্ষণশীল ছিলেন। সতীদাহ প্রথাকে ধর্মীয় আচরণ বলে মনে করতেন। তাই বার বার নানা অজুহাতে তিনি ইংরেজ সরকারের নির্দেশকে স্থগিত রাখেন। শেষ পর্যন্ত ইংরেজ সরকার কঠোর ব্যবস্থা নেবার হুমকী দেওয়ায় ১৮৮৯ সালে সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করতে বাধ্য হন।

কোন কোন উপজাতি সমাজে **বাল্য বিবাহ প্রথা** প্রচলিত হয়েছিল। রক্ষণশীল গোঁড়া ব্রাহ্মণদের প্রভাবে একসময় সারা ভারতে দশ বছর বয়স পূর্ণ হবার আগেই কন্যার বিবাহ দেবার ধর্মীয় নির্দেশ ছিল। কন্যাদায় থেকে মুক্ত হবার জন্য বহু অসহায় মা-বাবা বৃদ্ধের সঙ্গে বালিকা কন্যার বিয়ে দিতেন। বহু বিবাহ প্রচলিত থাকায় একজন বৃদ্ধ মারা গেলে বহুবালিকা বধূ একসঙ্গে বিধবা হতো। সম্পদ ভাগাভাগি রোধ করতে বালিকা বধূদের চিতার আগুনে জোর করে পুড়িয়ে মারা হত। ত্রিপুরায় এমন ঘটনার উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায়নি। বিধবা বিবাহের রীতিও সব উপজাতি সমাজে প্রচলিত

রয়েছে। তবে কিছু কিছু বালিকা বিবাহ ঘটেছে। জনশিক্ষা আন্দোলনের সময় বালিকা বিবাহ নিষিদ্ধ করার দাবী থেকে তা বুঝা যায়। প্রজাদের মধ্যে বাল্য বিবাহ বন্ধ হবার পরেও রাজপরিবারেও প্রভাবশালী ঠাকুর পরিবারে বাল্য বিবাহ প্রথা মহারাজা বীরচন্দ্রের আমল পর্যন্ত প্রচলিত ছিল।

আরেকটি মারাত্মক কুসংস্কার ভারতের সব উপজাতি সমাজে দেখা যায়। তা হল ডাইনী সন্দেহ করে অসহায় নারীকে পিটিয়ে বা পুড়িয়ে হত্যা করা। অজ্ঞতা এবং অন্ধ বিশ্বাস থেকে এসব কুসংস্কার জন্ম নিয়েছে। এসব বন্ধ করার জন্য বৈজ্ঞানিক শিক্ষা এবং আইনের শাসন দুটি'ই দরকার। রাজন্য শাসনে ত্রিপুরায় মহারাজারা প্রজাদের এসব সংস্কার বা কুসংস্কার নিয়ে কখনো মাথা ঘামিয়েছেন বলে মনে হয় না। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের সর্দারদের বিচার বিবেচনাই এক্ষেত্রে শেষ কথা ছিল। সর্দারের আদেশ অমাণ্য করলে রাজা সৈন্য পাঠিয়ে সর্দারের আদেশ কে কার্যকর করতেন।

ওঝা দিয়ে ভুত ছাড়ানো বা অপদেবতা বা অজানা রোগ দূর করার রীতিও একটা কুসংস্কার । আধুনিক শিক্ষায় এসব রীতি বাতিল হচ্ছে।

লুসাইদের মধ্যে একটা কুসংস্কার হল গৃহনির্মানের সময় ঘরের জানালা থাকলে জানালা দিয়ে অপদেবতা প্রবেশ করে বলে তারা বিশ্বাস করে। খৃষ্টান প্রভাবে এই কুসংস্কার দূর হচ্ছে।



মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের দুই বালিকা কন্যা কুমুদিনী ও মৃণালিনী।

চতুর্থ অধ্যায়

# রাজন্য যুগে রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ

বিংশ শতাব্দীর আগে ত্রিপুরায় যে সব প্রজা বিদ্রোহ ঘটেছে তার মধ্যে প্রজাদের রাজনৈতিক চেতনার কোন প্রকাশ ঘটেনি। রাজকর্মচারীদের অমানুষিক ব্যবহার ও অত্যাচারে ক্ষুব্ধ প্রজারা বিদ্রোহ করেছে। কারণ রাজার কাছে প্রজাদের পৌঁছার কোন পথ খোলা ছিল না। রাজার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের মধ্য থেকে প্রত্যেক উপজাতি সম্প্রদায়ের জন্য একজন করে মিসিপ নিযুক্ত করা হতো। সর্দারদের উপর তাদের কর্তৃত্ব ছিল। মিসিপের সঙ্গেই শুধু মহারাজার যোগাযোগ ছিল।

প্রতি বছর শুধু একবার হসম-ভোজনের সময় মহারাজার সঙ্গে সর্দারদের মিলিত হবার সুযোগ ঘটতো। প্রজাদের সঙ্গে রাজার কোন যোগাযোগ ছিলনা।

মধ্যযুগে মুসলমান সুলতান বা নবাবের সাহায্যে সিংহাসন দখলের চেষ্টা চলতো। কিন্তু ইংরেজ আমলে সে সুযোগ না থাকায় রাজ্যলোভী রাজ পরিবারের বিশিষ্ট ব্যক্তিরাই নানা অজুহাতে প্রজাদের মধ্যে বিদ্রোহ সৃষ্টি করে সিংহাসন লাভের চেষ্টা করতেন।

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে বাংলার বিপ্লবীরা রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে খামার বাড়ীর আড়ালে বিপ্লবীদেব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তুলেন। তাদের লক্ষ্য ছিল ইংরেজ সরকার উচ্ছেদ করা। স্বাধীন রাজ্যের মহারাজার বিরুদ্ধে তাদের কোন রাজনৈতিক বক্তব্য ছিলনা।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে রাজ্যের শিক্ষিত যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে ইংরেজ বিরোধী মনোভাব দেখা দেয়। মহারাজার নির্দেশে যে সব উপজাতি যুবকরা বৃটিশ বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল তারা আধুনিক যুদ্ধের চেহারা দেখেছে কিন্তু কোন অস্ত্র ব্যবহারের সুযোগ পায়নি। তাদেরকে সেবা মূলক কাজে ব্যবহার করা হয়েছে । প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের পরে মহাত্মাগান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সারা দেশে যুব সমাজের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা বিকাশের যে ঢেউ সৃষ্টি হয়েছিল, ত্রিপুরা রাজ্যেও তার প্রভাব এসে পড়েছে। ফলে প্রকৃত রাজনৈতিক চেতনার সূত্রপাত ঘটেছে এই সময় থেকে। বৃটিশ বিরোধী মানসিকতার মধ্যেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত এই চেতনা সীমাবদ্ধ ছিল। তারপর ক্রমশ গণতান্ত্রিক শাসন কায়েম করার লক্ষ্যে রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটেছে।

বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাব ত্রিপুরার

রাজপরিবারেও লক্ষ্য করা গেছে। মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্য নিজেকে বাঙ্গালী হিন্দু রাজা বলে পরিচয় দিয়ে গর্ববোধ করতেন। ভারতীয় দেশীয় রাজাদের মধ্যে রাধাকিশোর মাণিক্যের পরিচয় ছিল বাঙ্গালী হিন্দু রাজা হিসেবে। বাংলার শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ব্যক্তিরা রাধাকিশোর মাণিক্যের বন্ধুত্ব লাভ করে ধন্য বোধ করতেন। বিদ্যাসাগর হেমচন্দ্র, জগদীশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ সর্বত্র মহারাজার প্রশংসা করেছেন।

বৃটিশ বিরোধী মনোভাব মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্য বিভিন্ন ভাবে প্রকাশ করেছেন। সরকারী কাজে অনাবশ্যক কারনে ইংরেজীর ব্যবহার সম্পর্কে রাজকর্মচারীদের সতর্ক করে দেন। বাংলা ভাষার মর্যাদা যাতে সুরক্ষিত থাকে সে দিকে দৃষ্টি রাখতে নির্দেশ দেন।

বৃটিশ সরকার রাধাকিশোর মাণিক্যকে মহারাজা উপাধি দেয়নি। কলকাতায় সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুরের বাড়ীতে বাংলার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা মিলিত হয়ে রাধাকিশোর মাণিক্যকে মহারাজা হিসাবে সম্বর্ধনা জানান। কাশীর পন্ডিতরা মহারাজা উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন। বাঙ্গালী সমাজে রাধাকিশোর মাণিক্য ছিলেন প্রকৃত রাজর্ষি।

ক্ষুদিরামের ফাঁসির দিন রাজ অন্তঃপুরে সারা দিন কীর্তণের অনুষ্ঠান হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের ডাকে সারা দিয়ে রাজপরিবারে রাখী বন্ধন অনুষ্ঠানও হতো। রাজ্যে বিপ্লবীদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালনা করা মহারাজার সহানুভূতি ছাড়া সম্ভব ছিলনা। বৃটিশ সরকার বারবার মহারাজাকে সতর্ক করেছে এবং নিষিদ্ধ প্রচার পুস্তিকার তালিকা পাঠিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু মহারাজা রাধাকিশোর নির্বিকার ছিলেন।

১৯২১ সালে বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্যে র সময় অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাব ত্রিপুরার শহরাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল । কৈলাশহর, ধর্মনগর ও বিলনীয়ায় বিচার বিভাগ বয়কটের ঘটনাও ঘটেছিল।

১৯২২ সালে চট্টগ্রামে বিপ্লবীদের এক সম্মেলন হয়। অস্ত্র সংগ্রহের জন্য বিপ্লবীরা সচেষ্ট হয়। ত্রিপুরায় উমেশলাল সিংহের সহায়তায় পিসতুতো ভাই অনন্ত সিং মহারাজার অস্ত্রাগার থেকে কিছু পিস্তল সংগ্রহ করেছিলেন। শচীন্দ্রলাল সিংহ এই ঘটনায় যুক্ত ছিলেন। বিপ্লবী কার্য কলাপ বৃদ্ধি পাওয়ায় মহারাজা কিছু নেতাকে বন্দী করতে বাধ্য হন।

১৯২৭ সালে ছাত্র সংঘ স্থাপিত হয়। ১৯২৮ সালে ভ্রাতৃসংঘ স্থাপিত হয়। খেলাধুলাও শরীর চর্চার মাধ্যমে বিপ্লবী দলের কর্মী সংগ্রহের কাজ শুরু হয়। ১৯৩০ সালে ভ্রাতৃসংঘের সদস্যরা ২৬ জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবস পালন করে গ্রেপ্তার হন।

যুবসমাজে রাজনৈতিক চেতনা ক্রমশ সংগ্রামের রূপ নিতে থাকে।

## গণ আন্দোলনের বিভিন্ন ধারা

ভারতীয় গণআন্দোলনের বিভিন্ন ধারা ত্রিপুরাতেও লক্ষ্য করা যায় । তবে রাজন্য যুগে প্রকাশ্যে রাজনৈতিক আন্দোলন ও প্রচার সম্ভব ছিলনা । ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন বৃটিশ পার্লামেন্টে পাশ হওয়ায় এবং ভারতের সমস্ত দেশীয় রাজ্য সহ ভারত সাম্রাজ্যে সীমাবদ্ধ গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা চালু করার নির্দেশ থাকায় ত্রিপুরাতেও তার প্রভাব পড়েছে । এর আগে ত্রিপুরায় প্রকাশ্যে কোন রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে উঠেনি । রাজন্য যুগের গণআন্দোলনের প্রধান ধারাগুলো হল ঃ-

১) স্বতঃস্ফূর্ত প্রজা বিদ্রোহের ধারা।

২) সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী ধারা।

৩) জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক ধারা ।

৪) ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক ধারা ।

৫) বামপন্থী প্রগতিশীল আন্দোলনের ধারা ।

৬) রক্ষণশীল প্রতি বিপ্লবী ধারা।

ত্রিপুরায় এসব গণআন্দোলনের প্রকাশ যে ভাবে ঘটেছে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ-

## ১-স্বতঃস্ফূর্ত প্রজা বিদ্রোহ

পৃথিবীর সর্বত্র সব দেশেই অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহের বহু ঘটনা ঘটেছে। কোন রাজনৈতিক চেতনা বা লক্ষ্য ছাড়াই সাময়িক ক্ষোভ বিদ্রোহের রূপ নিয়েছে। এরূপ বিদ্রোহ সর্বত্র প্রচন্ড দমননীতির সাহায্যে ধ্বংস করা হয়েছে। বিদ্রোহীদের চরম শাস্তি ভোগ করতে হয়েছে।

ত্রিপুরায় অষ্টাদশ শতক থেকে বিংশ শতাব্দীর রাজন্য যুগের শেষ পর্ব পর্যন্ত বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিদ্রোহের ঘটনা ঘটেছে। রাজকর্মচারী বা রাজপ্রতিনিধি সর্দারদের অন্যায় জুলুম ও অত্যাচারের প্রতিবাদে এসব বিদ্রোহ ঘটেছে। ত্রিপুরায় অত্যাচারীকে শাস্তি দেওয়াই ছিল এসব বিদ্রোহের মূল লক্ষ্য। রাজতন্ত্র উচ্ছেদের কোন দাবী তারা করেনি। উল্লেখযোগ্য বিদ্রোহগুলো হল সমসের গাজির নেতৃত্বে কৃষক বিদ্রোহ, ত্রিপ্রা

বিদ্রোহ, জমাতিয়া বিদ্রোহ, রিয়াং বিদ্রোহ ও কুকী বিদ্রোহ ।এসব বিদ্রোহ সম্পর্কেপৃথক অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে ।

## ২- সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী ধারা

ভারতে বাংলা, পাঞ্জাব ও মাহারাষ্ট্রের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত যুবকেরা ইউরোপের বিভিন্ন বিপ্লবী গোষ্ঠীর অনুকরণে অত্যাচারী ইংরেজ রাজকর্মচারীদের হত্যা করে আতংক সৃষ্টি করার মাধ্যমে ইংরেজ শাসকদের এদেশ থেকে তাড়াবার উদ্দেশ্যে সশস্ত্র সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন শুরু করে।

বৃটিশ সরকার এসব গোষ্ঠীকে সন্ত্রাসবাদী বলে প্রচার করে দমন করতে উদ্যোগী হলেও ভারতীয় রাজনৈতিক নেতারা এদের বিপ্লবী বলে সম্মান জানিয়েছেন। কারণ গণচেতনা বিকাশের ক্ষেত্রে তাদের অবদান কম নয়।দেশের স্বার্থে নির্ভিক চিত্তে মৃত্যুবরণ করার খবর জনমনে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল ।

বিপ্লবী দলের একটা আদর্শ এবং কর্মসূচী থাকে। কিন্তু সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলোর নির্দিষ্ট কোন কর্মসূচী ছিলনা, বা রাজনৈতিক কোন আদর্শও ছিলনা।

১৯০২ সালে বিখ্যাত ব্যারিষ্টার প্রমথনাথ মিত্র, অরবিন্দ ঘোষ, চিত্তরঞ্জন দাস ও সুরেন্দ্র নাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে বঙ্কিম চন্দ্রের অনুশীলন তত্ত্বের প্রভাবে অনুশীলন সমিতি গঠিত হয়। প্রকাশ্যে লাঠিখেলা, শরীর চর্চা, খেলাধুলা, নীতিশিক্ষা ও চরিত্র গঠন ইত্যাদি কার্যকলাপের মাধ্যমে একটি বিপ্লবী গোষ্ঠী তৈরী করাই ছিল মূল লক্ষ্য। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় তাদের রাজনৈতিক কার্য কলাপ বৃটিশ সরকারের দৃষ্টিতে আসে। ফলে ১৯০৯ সালে অনুশীলন সমিতি নিষিদ্ধ হয় । সাধারণ মানুষের সঙ্গে এই সমিতির কোন সম্পর্ক ছিল না। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় ঢাকায় অনুশীলন সমিতির শক্তিশালী কেন্দ্র গড়ে উঠে। ৫০০ শাখা সক্রিয় ভাবে কাজ শুরু করে। ত্রিপুরায় উদয়পুর ও বিলনীয়া বিভাগে খামার বাড়ীর আড়ালে দুটি শাখা বিপ্লবীদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রূপে কাজ করতে থাকে। তাদের মূল লক্ষ্য ছিল ইংরেজ বিতাড়ন ।তাই তাদের প্রতি রাজাদেব একটা নীরব সহানুভূতি ও সমর্থন ছিল ।নতুবা এরাজ্যে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালনা করা সম্ভব হতোনা ।মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্য থেকে বীর বিক্রমের সময় পর্যন্ত তাদের সক্রিয় ভূমিকা ছিল ।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে বাংলার বিপ্লবী কর্মীরা ত্রিপুরায় এসে প্রশিক্ষণ নিত । দিনের বেলায় কৃষিকাজ এবং রাতের বেলায় অস্ত্র ও লাঠি চালনা শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে ত্রিপুরার কিছু শিক্ষিত যুবককে নিয়ে একটি শাখা গঠন করা হয়। শচীন্দ্র লাল সিংহ, উমেশ লাল সিংহ, কুমার শচীন দেববর্মণের বড় ভাই প্রশান্ত দেববর্মণ, কুঞ্জেশ্বর দেববর্মা এবং নারায়ণ ব্যানার্জি সমিতির সদস্য হন। বৃটিশ ভারত থেকে বিতাড়িত বিপ্লবীদের সাময়িক আশ্রয়ের ব্যবস্থা করাই ছিল তাদের প্রধান কাজ।

১৯২২ সালে চট্টগ্রামে বিপ্লবীদের এক গোপন সম্মেলনে বিপ্লবী কার্যকলাপের এক কর্মসূচী তৈরী হয় এবং অস্ত্র সংগ্রহের জন্য উদ্যোগ নেবার সিদ্ধান্ত হয়। অর্থ ও অস্ত্র সংগ্রহের জন্য ডাকাতি করার সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়। উমেশলাল সিংহ এবং শচীন্দ্রলাল সিংহ ত্রিপুরার রাজপ্রাসাদের অস্ত্রাগারে কর্মরত এক আত্মীয়ের সাহায্যে কিছু পিস্তল সংগ্রহ করে অনন্ত সিংহের হাতে তুলে দেন। উমেশ লাল সিংহ ছিলেন বিপ্লবী অনন্ত সিংহের মামাতো ভাই।

ত্রিপুরার যে সব ছাত্ররা কুমিল্লা কলেজে বা অন্যত্র উচ্চশিক্ষার জন্য যেতেন তারাই বিপ্লবীদলের সংস্পর্শে এসে রাজ্যে ফিরে গোপন সংগঠন গড়ায় উদ্যোগী হতেন। বীরেন দত্ত, গোপাল দত্ত, জীতেন দত্ত, সুকুমার ভৌমিক, অনন্ত দে, কান্তি দেববর্মা প্রভৃতি অনুশীলণ সমিতির কর্মীরা বিভিন্ন অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়ে জেলে আটক থাকা অবস্থায় মার্কসবাদ ও রুশবিপ্লবের আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণীত হন।

## ছাত্র সংঘ ও ভ্রাতৃ সংঘ

১৯২৭ সালে অনুশীলন সমিতির সমর্থকরা ছাত্র সংঘ নামে একটি সংগঠন গড়ে তুলেন। পরের বছরই যুগান্তর দলের সমর্থকরা ভ্রাতৃসংঘ নামে আরেকটি সংগঠন গড়ে তুলেন। শরীর চর্চা ও সামাজসেবা মূলক কাজ কর্মে লিপ্ত থাকায় তাদের প্রতি মহারাজার কোন সন্দেহ দেখা দেয়নি। বরং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যুব সমাজকে এরূপ কাজকর্মের জন্য মহারাজা বীরবিক্রম উৎসাহ দেন এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুরস্কার দেবার ব্যবস্থা করেন। এই সময় নক্ষত্র রায়ের বংশধর প্রভাত রায় কুমিল্লা কলেজে পড়তে গিয়ে বিপ্লবী আন্দোলনে যুক্ত হন এবং ছাত্র সংঘের সক্রিয় সদস্য হন।

## স্বাধীনতা দিবস পালন

১৯৩০ সালে ২৬ শে জানুয়ারী ভ্রাতৃসংঘের উদ্যোগে ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন স্কুলে স্বাধীনতা দিবস পালনের ডাক দেওয়া হয়। প্রশাসন সতর্ক হয়ে উঠে। কিছু ছাত্রকে বহিষ্কার করা হয়। অভিভাবকদের চাকুরী ও পেনসানের ব্যাপারে হুশিয়ারী দেওয়া হয়। কারণ রাজকর্মচারীদের ছেলেরাই এসব কাজে যুক্ত ছিল।

## ডাকাতি

১৯৩২ সালে আগরতলায় অমর ভট্টাচার্যের দোকানে অনুশীলন সমিতির একদল কর্মী ডাকাতি করে কিছু টাকা ও গয়না লুঠ করে নেয়। মেলার মাঠে এক বাড়ী ঘেরাও করে কিছুক্ষণ গুলি বিনিময়ের পর মহারাজার পুলিশ বাহিনী শচীন দত্ত, পবিত্র পাল ও কৃষ্ণচন্দ্র চক্রবর্তীকে গ্রেপ্তার করে। বাকী কয়েকজন পালিয়ে যায়। কৃষ্ণচন্দ্র চক্রবর্তী ছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তীর ভাই। বিশেষ আদালতের বিচারে কৃষ্ণচন্দ্র চক্রবর্তীর নয় বছর এবং বাকী দুই জনের সাত বছর করে জেল হয়। দেবপ্রসাদ সেন গুপ্ত আত্মগোপন করেন । কিন্তু পরে টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলায় বন্দী হয়ে কারাদন্ড ভোগ করেন ।

আগরতলায় পুলিশ অফিসারের এবং সোনামুড়ায় ম্যাজিষ্টেটের পিস্তল চুরির ঘটনায় প্রভাত রায়কে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। অর্থ ও অস্ত্র সংগ্রহের বিভিন্ন উদ্যোগে উমেশ লাল সিংহ, নলিনী সেনগুপ্ত কালকাতায় পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। শচীন্দ্রলাল সিংহ এবং হরিগঙ্গা বসাকও বন্দী হন। প্রভাত রায় নিজের মামাতো বোন অমিয়াদেবীর সাহায্যে সোনা মুড়ার ম্যাজিষ্ট্রেট মামা, ললিত মোহন দেববর্মার পিস্তলটি চুরি করে কান্তি দেববর্মা ও অনন্ত দের হাতে তুলে দেন, যাতে ডাকাতির মামলায় আটক বন্দীদের মুক্ত করা যায়। কিন্তু পুলিশের হাতে সবাই ধরা পড়ে জেল খাটেন।

## মাতৃসংঘ

কিছু মহিলা গোপন পাঠচক্র ও অস্ত্র প্রশিক্ষণে অংশ নিয়ে ছিলেন। তাদের মধ্যে রীনা দত্ত ও পানু দত্তের নাম উল্লেখযোগ্য ।

১৯৩০ সালে মাতৃসংঘ নামে একটি সংগঠনের নাম পাওয়া যায়। ব্যায়াম শিক্ষা, চরকা ও সূতাকাটার কাজ শিক্ষা দেওয়া হতো। এই সময় যুবক যুবতীদের মধ্যে গান্ধীবাদের প্রভাব পড়তে শুরু করেছিল।

## মিলন সংঘ

বনমালীপুরে কিছু যুবক মিলন সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন । সুকুমার ভৌমিক, প্রভাত রায়, দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত, অনন্ত দে এই সংঘের সদস্য ছিলেন। তিন সুকিয়া মেলে স্বদেশী ডাকাতির ঘটনায় ব্যবহৃত বন্দুক এই সংঘের কর্মীরা ত্রিপুরার রাজপরিবারের

এক ব্যক্তির হেফাজত থেকে অপহরণ করেছিলেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায়।

এভাবে বিভিন্ন গুপ্ত সংগঠন প্রকাশ্যে শরীর চর্চা ও সংস্কৃতি চর্চা এবং রাতে অস্ত্র শিক্ষা, লাঠি খেলা ইত্যাদি রোমাঞ্চকর কার্যকলাপে লিপ্ত থেকে ইংরেজ সরকার উচ্ছেদের লক্ষ্যে কাজ করেছে। ত্রিপুরার রাজতন্ত্রের বিষয়ে তাদের কোন বক্তব্য বা কর্মসূচী ছিলনা। তবু বৃটিশ স্বার্থে আঘাত পড়ে এমন সব কাজের জন্য মহারাজা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের নেতাদের মধ্যে নানা বিষয়ে মতবিরোধ ছিল। ফলে রেষারেষী বাড়তে থাকে এবং পাড়ায় পাড়ায় নতুন নতুন সংঘ গড়ে উঠতে থাকে।

ছাত্র সংঘ অনুশীলন সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিল। প্রতিষ্ঠার এক বছর পর দুভাগ হয়ে একটি অংশ আলাদাভাবে "ভ্রাতৃ সংঘ" নামে যুগান্তর দলের অধীনে চলে যায়। যুগান্তর দল ডাকাতি ও ব্যক্তিহত্যার নীতি সমর্থন করতো না। দেশ জুড়ে সামরিক কায়দায় শিক্ষিত একদল সাহসী যুবকদের সশস্ত্র বিদ্রোহের দ্বারা স্বাধীনতা অর্জন করা ছিল যুগান্তর দলের লক্ষ্য। বিপ্লবী যুবকদের মধ্যে রোমান্টিক আবেগ ছিল। আনন্দমঠের আদর্শে কোন প্রশ্ন না করে বিপ্লবী কাজে ঝাঁপিয়ে পড়াই তাদের একমাত্র কর্তব্য বলে বিশ্বাস করতো। ফলে অনেক সময় ছেলে মানুষী চমক সৃষ্টি করার কাজ করে বিপদ ডেকে আনতো। বিপ্লবীদের বয়স ছিল বিশ থেকে পঁচিশ বছর।

বিপ্লবী দলে পুলিশের গুপ্তচরেরা ঢুকে বিপ্লবীদের সব গোপন খবর পুলিশ কর্তাদের কাছে জমা দিয়ে যথাসময়ে আক্রমণ চালিয়ে বিপ্লবী পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দিত এবং নেতাদের গ্রেপ্তার করে সরকারের কাছ থেকে পুরস্কার পেত। বিপ্লবী দলের কর্মী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে কঠোর ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও পুলিশের গুপ্তচর দের অনুপ্রবেশ বন্ধ করা যায়নি। অনেক সময় নানা প্রলোভন দেখিয়ে বিপ্লবী দলের সদস্যদের মধ্য থেকেও গুপ্তচর সংগ্রহ করা হতো। এদেশে কোন কালেই বিশ্বাসঘাতকদের অভাব দেখা দেয়নি।

ত্রিপুরায় সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের কোন কাজই রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে ছিলনা। জনগণের সঙ্গেও এর কোন যোগ ছিলনা। তবে যেসব নেতারা জেল খেটেছেন তারা জেল থেকে বিশেষ শিক্ষা নিয়ে আদর্শভিত্তিক রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে জেল থেকে ফিরে এসেই জনগণকে নিয়ে রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে গণআন্দোলনে যোগ্য নেতৃত্ব দিতে পেরেছেন। সাহসী ও প্রকৃত দেশপ্রেমিক নেতৃত্ব পেয়ে গণসংগঠন গুলো শুরুতেই শক্তিশালী পদক্ষেপ নিতে পেরেছিল।

১৯৩৮ সালে জেল- ফেরত বিপ্লবীরা দুটি আদর্শে বিভক্ত হয়ে যান। গান্ধীজীর

নেতৃত্বে তখন জাতীয় কংগ্রেস দল আবেদন নিবেদনের স্তর পার হয়ে অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনের মাধ্যমে সারা দেশে ব্যাপক গণসমর্থন পুষ্ট একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক দল হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । আন্দোলনের চাপে বৃটিশ সরকার ১৯৩৫ সালে বৃটিশ পার্লামেন্টে ভারত শাসন আইন পাশ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু এই আইনে নির্বাচিত সরকারের উপর গভর্ণরদের প্রাধান্য থাকায় কংগ্রেস প্রথমে বিরোধীতা করলেও আইনের অসারতা প্রমাণ করার জন্য ১৯৩৭ সালে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে। ভারতের অধিকাংশ রাজ্যে বিপুল ভোটে জয়লাভ করে জাতীয় কংগ্রেস দল প্রাদেশিক সরকার গঠন করে। এই ঘটনা ভারতীয় বিপ্লবীদের মধ্যে বিপুল অনুপ্রেরণা জাগিয়ে দেয়। জেল থেকে মুক্ত হয়ে অধিকাংশ বিপ্লবী কংগ্রেস দলে যোগ দেয়।

অন্য একটি অংশ আপোস নীতিতে প্রকৃত স্বাধীনতা আসবেনা, এই বিশ্বাসে এবং সোভিয়েত সরকারের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগ দেয়। কমিউনিষ্ট পার্টি তখনও বেআইনী থাকায় ভিন্ন নামে গণআন্দোলন সংগঠিত করতে উদ্যোগ নেওয়া হয় ।

## ৩- জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক ধারা

### ত্রিপুরা রাজ্য জন মঙ্গল সমিতি

জেলখানায় কমিউনিষ্ট আদর্শে দীক্ষিত ত্রিপুরার প্রথম কমিউনিষ্ট নেতা বীরেন দত্তের মতে ১৯৩৭ সালে কয়েকজন কমিউনিষ্ট সমর্থকের উদ্যোগে জনমঙ্গল সমিতি গঠিত হয়। ত্রিপুর সেনের মতে ১৯৩৮ সালে এই সমিতি গঠিত হয়। আবার কারো মতে ১৯৩৫ সালে পন্ডিত গঙ্গাপ্রসাদ শর্মার সভাপতিত্বে এক সভায় **"জনমঙ্গল সমিতি"** প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে এটাই ত্রিপুরার প্রথম রাজনৈতিক চেতনা সম্পন্ন গণ সংগঠন।


বীরেন দত্ত


গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা


প্রভাত রায়


বীরচন্দ্র দেববর্মা


বংশী ঠাকুর

বীরেন দত্ত, বংশী ঠাকুর, প্রভাত রায়, সুকুমার ভৌমিক ও কীর্তি সিংহ প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নেতৃত্বে এই সংগঠন সারা রাজ্যে রাজার অধীনে দায়িত্বশীল শাসনের দাবীতে প্রচার আন্দোলন শুরু করে আলোড়ন সৃষ্টি করে। একমাত্র বীরেন দত্ত ছাড়া আর কেউ কমিউনিষ্ট ছিলেন না। কিন্তু নেতারা সকলেই রাজবন্দী হয়ে কারারুদ্ধ হন । ১৯৩৮ সালে কুমিল্লা জেলা কমিটির অধীনে ত্রিপুরায় একটি গোপন কমিউনিষ্ট সেল গঠন করা হয়। দশ-বার জনের এই ছোট্ট সেলটি গোপনে মার্কসবাদী পুস্তকাদি পাঠের ব্যবস্থা করেন । এই সেলের সম্পাদক ছিলেন দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত । ক্রমে ক্রমে কিছু বিপ্লবী যুবক এই সেলে যোগ দিতে থাকেন। বীরেন দত্তের পরামর্শে এই সময় সারা ভারত কৃষক সম্মেলনে একটি প্রতিনিধি দল পাঠানো হয় । জিতু দত্ত, অনন্ত লাল দত্ত, বঙ্কিম চক্রবর্তী, নলিনী সেনগুপ্ত, ঊষারঞ্জন দেববর্মা, নিমাই দেববর্মা এই প্রতিনিধি দলে ছিলেন। তখন ত্রিপুরা রাজ্যে প্রকাশ্যে কোন রাজনৈতিক প্রচার চালানো সম্ভব ছিল না। এক বছর পরই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ায় সব রকম সভা-সমিতি ও প্রচার নিষিদ্ধ হয়।

জন মঙ্গল সমিতি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঘোষণার কয়েক মাস আগে ধর্মনগরে এক সম্মেলন থেকে কয়েকটি গণতান্ত্রিক দাবী উত্থাপন করে ।


দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত

১) অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা, ২) বেকারদের জন্য কাজ,

৩) শিল্প কেন্দ্র স্থাপন, ৪) কর হ্রাস করা ।

এ কয়টি দাবী উল্লেখ যোগ্য।

মহারাজা প্রজাদের আশ্বস্ত করার জন্য সংবিধানিক সংস্কার সাধনের ঘোষণা দেন। যুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ায় তা স্থগিত হয়ে যায়। ৫৪ জন সদস্যের আইন সভায় ২৯ জন নির্বাচিত এবং ২৫ জন মনোনীত সদস্য থাকবে বলে ঘোষণা হয়েছিল। রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে 'জনমঙ্গল সমিতির' শাখা গঠন করা হয়েছিল। ত্রিপুরায় এই প্রথম বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কৃষকেরা শাসন ও শোষণ সম্পর্কে সচেতন হতে শুরু করেছিল । কমিউনিষ্টরা সংখ্যায় নগণ্য হলেও রাজনৈতিক চেতনায় যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিল। কমিউনিষ্ট নেতা ধরনী গোস্বামী গোপনে ত্রিপুরায় এসে সংগঠন গড়ার নানা কৌশল সম্পর্কে পবামর্শ দিয়েছিলেন। বীরেন দত্ত বিভিন্ন মতের নেতাদের ঐক্যবদ্ধ রেখে গণতান্ত্রিক আন্দোলন পরিচালনায় ধৈর্য্য ও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। বিশ্বযুদ্ধ ঘোষণা হব্যর সঙ্গে সঙ্গে প্রথম সারির সব নেতাকেই গ্রেপ্তার করা হয়। অনেককে রাজ্যের বাইরে নির্বাসন দেওয়া হয় ।

# ত্রিপুরা রাজ্য গণপরিষদ



সুখময় সেনগুপ্ত

১৯৩৮ সালে জেল ফেরত যে সব বিপ্লবী নেতারা হিংসার পথ ত্যাগ করে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পথে দেশের স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রামে অংশ নেবার সিদ্ধান্ত নেন তারা শচীন্দ্র লাল সিংহ ও উমেশ লাল সিংহের নেতৃত্বে ত্রিপুরা রাজ্য গণপরিষদ নামে একটি সংগঠন গড়ে তুলেন। প্রধানত জাতীয় কংগ্রেসের আদর্শে বিশ্বাসী নেতারাই এই সংগঠনে যোগ দেন। তৎকালে কংগ্রেস সভাপতি সুভাষ চন্দ্রের সঙ্গে দেখা করে ত্রিপুরার নেতারা জাতীয় কংগ্রেস গঠনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু কংগ্রেসের হরিপুরা অধিবেশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কোনও দেশীয় রাজ্যে কংগ্রেস দল গঠন করা নিষিদ্ধ বলে জানান হয়।



শচীন্দ্রলাল সিংহ

জাতীয় কংগ্রেস নেতারা বিশ্বাস করতেন যে, দেশীয় রাজারা শেষ পর্যন্ত বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে সামিল হবেন অথবা সহানুভূতি সম্পন্ন হবেন এবং দেশ স্বাধীন হলে স্বাধীন ভারতে যোগ দেবেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে বেশীর ভাগ দেশীয় রাজা স্বাধীন সত্তা বজায় রাখার জন্য নানা কৌশলে চেষ্টা করেছেন। বৃটিশ সরকার যতক্ষণ টিকে থাকবে ততক্ষণ দেশীয় রাজাদের কোন বিপদ নেই। এই ভাবনা থেকেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বৃটিশ স্বার্থ রক্ষার জন্য দেশীয় রাজারা সর্বতোভাবে চেষ্টা করেছেন। ক্ষমতার অতিরিক্ত অর্থ ও সেনা সাহায্য দিয়ে রাজ্যের অর্থনীতিতে সংকট ডেকে এনেছেন। রাজ্যের অভ্যন্তরে বৃটিশ বিরোধী কার্যকলাপ কঠোর ভাবে দমন করেছেন। এসব দেখে কংগ্রেস নেতারা নতুন কৌশল নিতে বাধ্য হন। জহরলাল নেহেরুর নেতৃত্বে 'দেশীয় রাজ্য প্রজা সম্মেলনী' নাম দিয়ে একটি সর্বভারতীয় সংগঠন গড়ে তোলা হয়। দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের আন্দোলন কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতৃত্বের অধীনে নেওয়া হয়। ১৯৩৯ সালে ত্রিপুরা রাজ্য গণপরিষদ এই কেন্দ্রীয় সংগঠনের অনুমোদন লাভ করে। মহাত্মা গান্ধী রাজ্যের প্রজাদের গঠন মূলক কাজে সংগঠিত করার জন্য পরামর্শ দেন।

'ত্রিপুরা রাজ্য গণ পরিষদ' তাদের প্রথম দলিলে বিশ দফা দাবী উত্থাপন করে। প্রধান দাবীগুলো হলো ঃ-

১) প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটে রাজ্যে দায়িত্বশীল শাসন প্রবর্তন করতে হবে।

২) সাম্প্রদায়িক নির্বাচন প্রথার বদলে যুক্ত নির্বাচন প্রথার প্রবর্তন করতে হবে।

৩) মহাজনী ব্যবস্থার উচ্ছেদ করে সরকারী কৃষি-ব্যাংক স্থাপন এবং অল্পসুদে কৃষিঋণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪) শহর ও গ্রামে রাস্তা ঘাট নির্মাণ করে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করতে হবে।

৫) রাজ্যের সর্বত্র দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপণ করতে হবে।

৬) বন আইন সংশোধন করে প্রজাদের পারিবারিক প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বিনা মাশুলে সংগ্রহের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

৭) তাইতুং প্রথা বাতিল করতে হবে।

৮) বকেয়া খাজনা মকুব করতে হবে।

৯) মহাজনের ঋণের দায়ে যে সব সম্পত্তি হস্তান্তর হয়েছে তা ফেরত দেবার ব্যবস্থা করতে হবে।

১০) সভাসমিতির মাধ্যমে প্রজাদের মতামত গঠনের স্বাধীনতা দিতে হবে।

রাজন্যযুগে যখন রাজার ইচ্ছাই আইন বলে গণ্য হতো, তখন ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের বলে বলীয়ান হয়ে উপরোক্ত দাবীগুলো উত্থাপন করা একটা বৈপ্লবিক ঘটনা বলে গণ্য হবার যোগ্য। এসব দাবী জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক চেতনারই পরিচয় বহন করছে। জনমঙ্গল সমিতি এবং ত্রিপুরা রাজ্য গণপরিষদ দুটি পৃথক মঞ্চ থেকে একই ধারায় গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটিয়েছে।

আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন মহারাজা বীরবিক্রম মাণিক্যের পক্ষে এসব দাবী উপেক্ষা করা বা এর বিরুদ্ধে দমন নীতি চালানো সম্ভব ছিলনা। বিশেষত যেখানে বৃটিশ সরকার প্রজাদের গণতান্ত্রিক অধিকার স্বীকার করে নিয়েছে। মহারাজা রাজ্যে আইন সভা গঠন এবং গ্রামমন্ডলী স্থাপনের ঘোষণা দেন। এই ঘোষণায় আন্দোলন কারীদের মধ্যে নতুন উৎসাহ সৃষ্টি হয়। নানা রকম দাবী দাওয়া আদায়ের জন্য আন্দোলন সংগঠিত রূপ নিতে থাকে।

ত্রিপুরা রাজ্য গণপরিষদ গ্রামে গ্রামে নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন এবং পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করে যুবকদের মধ্যে সংগঠন গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়। শচীন্দ্রলাল সিংহ উত্তেজক বক্তৃতা দেবার অপরাধে রাজ্য থেকে বহিষ্কৃত হন। সুখময় সেনগুপ্ত হরিজন কর্মীদের বেতন বৃদ্ধির দাবীতে ধর্মঘট আন্দোলন সংগঠিত করেন। শহর উন্নয়নের নামে রামনগরের মুসলিম পরিবারগুলোকে উচ্ছেদ করার বিরুদ্ধেও আন্দোলন হয়। ফলে গণ পরিষদের

অধিকাংশ প্রথম সারির নেতা রাজ্য থেকে বহিষ্কৃত হন ।

১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যাবার পর রাজ্যে সব রকম রাজনৈতিক কার্যকলাপ ও সভাসমিতি, মিছিল নিষিদ্ধ হয়। দীর্ঘ ছয় বছর ধরে রাজ্যে নিষেধাজ্ঞা বলবৎ ছিল। সেজন্যই ১৯৪২ সালের ভারত ছাড়ো আন্দোলনের ঢেউ ত্রিপুরায় ছিলনা।

১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পর সারা দেশে স্বাধীনতার দাবীতে তীব্র গণআন্দোলনের সূত্রপাত হয় ।

## ৪ - ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক আন্দোলনের ধারা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যখন বৃটিশ এবং ফ্রান্সের সামরিক বাহিনী জার্মান ও জাপানের সামরিক বাহিনীর আক্রমণে সর্বত্র বিপর্যস্ত হতে থাকে এবং ভারতে কংগ্রেসের নেতৃত্বে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের নেতারা ঘোষণা দেন যে, যুদ্ধের পরে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী পূরণ করার প্রতিশ্রুতি না দিলে বৃটিশ স্বার্থে ভারতের কোন যুবক সামরিক বাহিনীতে যোগ দেবেনা। ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি (সি.পি.আই) শ্লোগান দেয় বৃটিশের স্বার্থে যুদ্ধের জন্য - না একপাই না এক ভাই। অর্থাৎ টাকাও নয় মানুষও নয়। অথচ ভারতীয় বাহিনী হল বৃটিশের মূল শক্তি।

এরকম জটিল পরিস্থিতিতে বৃটিশ কর্তৃপক্ষ ঘোষণা দিতে বাধ্য হয় যে, যুদ্ধ জয়ের পর সমস্ত উপনিবেশিক দেশে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা প্রসারিত করা হবে ।

যুদ্ধের পর ভারতে স্বাধীনতার দাবীতে জনগণ তীব্র আন্দোলনে সামিল হয়। কিন্তু বৃটিশ সরকার কৌশলে আন্দোলনকে দুর্বল ও বৃটিশ স্বার্থে ব্যবহার করার জন্য হিন্দু মুসলমান সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা করে। বৃটিশের মদত পেয়ে মুসলমানরা দারুণ উৎসাহে ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ করে পাকিস্তানের দাবীতে চরম উত্তেজনা সৃষ্টি করে।

এই রকম পরিস্থিতিতে মুসলিম লীগের নির্দেশে ত্রিপুরায় গেঁদু মিয়ার নেতৃত্বে ১৯৪৫ সালে প্রথম একটি ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক দলের উদ্ভব ঘটে । গেঁদু মিয়া ছিলেন রাজার হাতির মাহুত। পরে মটরগাড়ী আসার পর রাজার প্রধান মন্ত্রীর গাড়ীর ড্রাইভার হন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আগরতলা বিমান ঘাটির ঠিকেদারীর কাজ করে প্রচুর

টাকার মালিক হন। রাজপরিবারের একটা অংশের মদত পেয়ে ত্রিপুরায় গণআন্দোলনের বিরুদ্ধে একটি শক্তি হিসেবে - **আঞ্জুমান ইসলামিয়া**-নাম দিয়ে একটি দল গঠন করেন। মুসলিম প্রধান গ্রামগুলোতে দ্রুত শাখা অফিস গঠন করে মুসলিম ঐক্য গড়ে তুলতে সচেষ্ট হন। সে সময় ত্রিপুরায় বাঙ্গালীদের মধ্যে মুসলমানরাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। বিভিন্ন জায়গায় মসজিদ ও মাদ্রাসা গড়ে উঠতে থাকে। ফলে হিন্দুদের একটা অংশের মধ্যেও সাম্প্রদায়িক চিন্তার প্রকাশ ঘটে। **হিন্দুমহাসভার** একটি রাজ্য কমিটিও গঠিত হয়।

এই সময় গণতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসী-ত্রিপুরা রাজ্য-**মুসলিম প্রজা মজলিশ** নামে একটি দল গঠিত হয়। আরমান আলি মুন্সী এবং ফরিদ মিয়ার নেতৃত্বে মুসলিম প্রজাদের মধ্যে সংগঠন গড়ার কাজ শুরু হয়। ধলেশ্বর এলাকায় সিরাজুল ইসলাম এই সংগঠনের সম্পাদক হন।

**দিল্লীর- জমায়েত উলেমা হিন্দের**-একটি শাখাও এ রাজ্যে স্থাপন করা হয়েছিল। প্রিয়নাথ বানার্জীর নেতৃত্বে-**ত্রিপুরা হিন্দু সম্মেলনী**- নামে আরেকটি সংগঠন গড়ে উঠে।

রাজ্যের আবহাওয়া যখন সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে উত্তপ্ত হতে থাকে, ঠিক তখনই ১৯৪৬ এর ভয়াবহ দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত ও নিঃস্ব উদ্বাস্তুর দল ত্রিপুরা রাজ্যে প্রবেশ করতে থাকে। ক্রমে ক্রমে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠে। দেশ বিভাগও অনিবার্য রূপে দেখা দেয়। দেশ বিভাগের মাধ্যমে স্বাধীনতা ঘোষণার পর অধিকাংশ মুসলিম নেতা পাকিস্তানে চলে যাওয়ায় হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাও সাময়িকভাবে চাপা পড়ে যায়। উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল ত্রিপুরায় হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার সময় হিন্দু উপজাতিরা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ছিল। তাদের মধ্যে কোন উত্তেজনা দেখা যায়নি।

## ৫- বাম পন্থী প্রগতিশীল আন্দোলনের ধারা

## জনশিক্ষা সমিতি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ত্রিপুরার ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল শিক্ষিত উপজাতি সমাজের নবীন মধ্যবিত্ত যুবকদের উদ্যোগে সর্বস্তরে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের দাবীতে জনশিক্ষা আন্দোলন। শত শত বছর ধরে ত্রিপুরার পার্বত্য প্রজারা শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত থাকার ফলে আধুনিক সভ্যতা দূরের কথা মধ্যযুগীয় উন্নয়নের ধারায়ও প্রবেশ করতে পারেনি।

রবীন্দ্রনাথ লোকহিত প্রবন্ধে বলেছেন, সারা দেশের নিরক্ষর মানুষের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার আয়োজন করা হবে যথার্থ লোক- কল্যাণমূলক কাজ । সকলের জন্য উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজন নেই। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষা অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত লোক- সাধারণের মনের অন্ধকার দূর করার পক্ষে একটি জীবনদায়ী জানালার মত। বাইরের আলো বাতাস পেলেই ভাল মন্দ বিচার করার শক্তি ও মনুষ্যত্ব বোধ বিকাশের প্রশস্ত পথ খুলে যায় ।



দশরথ দেব

ত্রিপুরার রাজাদের কাছে বিভিন্ন সময়ে রবীন্দ্রনাথ প্রজাকল্যাণের কাজকে সবচেয়ে গুরুত্ব দেবার উপদেশ দিয়ে অনেকগুলো চিঠি লিখেছিলেন। উপযুক্ত সংরক্ষণের অভাবে তার অনেকগুলো হারিয়ে গেছে। যেগুলো পাওয়া গেছে সেগুলোও কম মূল্যবান নয়।



অঘোর দেববর্মা

কবির ঘনিষ্ট বন্ধু মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্য প্রজাদরদী ছিলেন কিন্তু রাজপারিষদদের প্রভাবমুক্ত হতে পারেননি। অর্থের অভাবে অনেক পরিকল্পনা কার্যকর করতে পারছেন না বলে কবিকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করলেও সেটা মহারাজার অন্তরের কথা নয়। তিনি প্রজাকল্যাণের জন্য শিক্ষা- স্বাস্থ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থার কাজ শুরু করে যাবেন বলে কবিকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সে প্রতিশ্রুতি তিনি রক্ষা করার চেষ্টা করেছেন। আকস্মিক দুর্ঘটনায় মহারাজার অকাল মৃত্যু না হলে হয়তো রবীন্দ্রনাথের নির্দেশিত পথে অনেকটা অগ্রসর হবার চেষ্টা করতেন। রাধাকিশোর মাণিক্য যে কাজ শুরু করেছিলেন পরবর্তী দুই মহারাজা সে পথ ধরে চলবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু বীরেন্দ্র কিশোরের সময় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং বীরবিক্রম কিশোরের সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ইতিহাসের অগ্রগতির ধারাকে অবরুদ্ধ করেছিল।

রাজন্য শাসনের শেষ লগ্নে মহারাজা বীরবিক্রমের জীবনের শেষ দুটি বছর রাজ্যের ভবিষ্যত নিয়ে যখন চরম অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা চলছে ঠিক তখনই রাজ্যের প্রথম কমিউনিষ্ট নেতা বীরেন দত্তের অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উমাকান্ত বোর্ডিং এর কতিপয় উপজাতি ছাত্র একত্র হয়ে, আলোচনা ক্রমে উপজাতি সমাজে শিক্ষা প্রসারের জন্য একটি সংগঠন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তাদের উদ্যোগে বোর্ডিং এর প্রাক্তন ছাত্রদের সঙ্গে যোগাযোগ করে দুর্গা চৌধুরী পাড়ায় একটি সম্মেলন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কারণ রাজধানী আগরতলায় সম্মেলন করার মত সঙ্গতি ছিল না। প্রাক্তন সিনিয়র

ছাত্র দশরথ দেবের সঙ্গে যোগাযোগের পর সম্মেলনের তারিখ স্থির করা হয়। সব প্রাক্তন ছাত্রদের নামের তালিকা সংগ্রহ করে চিঠি দিয়ে নিমন্ত্রণ করা হয়। বহু প্রাক্তন ছাত্র বেকার বসে ছিল। রাজ্যে চাকরীর সুযোগ ঘটেনি। তাই হতাশাগ্রস্ত বেকার যুবকরা সম্মেলনে যোগ দেয়নি।

১৯৪৫ সালের ২৭ শে ডিসেম্বর দুর্গা চৌধুরী পাড়ায় কৃষি বিভাগের কর্মচারী হেমন্ত দেববর্মার বাড়ীতে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯ জন উপজাতি ছাত্র এই সম্মেলনে যোগ দেন। হেমন্ত দেববর্মা এত বেশী উৎসাহিত হয়েছিলেন যে সম্মেলনের সব খরচ তিনি একাই বহন করেন। বোর্ডিং এর মনিটর হিসেবে অঘোর দেববর্মার উপর সম্মেলন সংগঠিত করার দায়িত্ব ছিল। নীলমণি দেববর্মা, হরিনাথ দেববর্মা ও হেমন্ত দেব বর্মা সম্মেলন সফল করার জন্য উৎসাহের সঙ্গে কাজ করেন । দশরথ দেব হবিগঞ্জ কলেজ থেকে আসার পথে খোয়াই বোর্ডিং থেকে রামচরণ দেববর্মা, রবীন্দ্র দেববর্মা, ধর্মরায় দেববর্মাকে সঙ্গে নিয়ে আসেন । সুধন্ব্যা দেববর্মা শ্রীকাইল কলেজ থেকে বি.এ. পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে হতাশায় ভুগছিলেন। কিন্তু সম্মেলনে এসে খুব উৎসাহী হয়ে উঠেন ।

এই সম্মেলনে রাজ্যের উপজাতিদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা হলেও শিক্ষামূলক অরাজনৈতিক সংগঠন গড়ার প্রস্তাব অগ্রাধিকার পায় এবং সর্বসম্মতভাবে **'জনশিক্ষা সমিতি'** নামে একটি সংগঠন গড়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

এই সময় সি.পি.আই দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন পি.সি.যোশী। বীরেন দত্তের সঙ্গে গোপন পরামর্শের সময় অনুন্নত উপজাতি সমাজে সমাজ সংস্কার মূলক সংগঠন গড়ার জন্য বিশেষ ভাবে উপদেশ দেন। প্রথমেই রাজনৈতিক সংগঠন গড়ার চেষ্টা ক্ষতিকর হবে বলে হুশিয়ারী দেন।

রাজন্য যুগে ত্রিপুরায় প্রকাশ্যে কমিউনিষ্ট দল গঠন করা সম্ভব ছিল না। ১৯৩৮ সালের আগে কমিউনিষ্ট ভাবধারার সঙ্গে কারো কোন পরিচয় ছিল না। অনুশীলন ও যুগান্তর দলের কর্মিরা জেলখানা থেকে কমিউনিষ্ট আদর্শ এবং রুশ বিপ্লবের ঘটনাবলীর কথা শুনে এবং কিছু মার্কসবাদী পুস্তিকা পাঠ করে দারুণ ভাবে উৎসাহী হন। সোভিয়েত সরকারের জনকল্যাণমূলক কাজ কর্মের ইতিহাস ভীষণ ভাবে অনুপ্রাণিত করে। এরা জেল থেকে মুক্ত হয়ে এসে কমিউনিষ্ট আদর্শে গণসংগঠন গড়ার জন্য সচেষ্ট হন এবং মার্কসবাদী আদর্শ প্রচার শুরু করেন।

অন্য দিকে গান্ধীবাদ বিপ্লবীদের একটি অংশকে অনুপ্রাণিত করে। তারা অহিংস গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে স্বাধীনতা অর্জনের আদর্শে বিশ্বাসী হয়ে গান্ধীবাদী সংগঠন গড়ে

তুলতে সচেষ্ট হন ।

প্রকৃত পক্ষে দুটি আদর্শই জনকল্যাণমূলক কাজকে অগ্রাধিকার দিয়ে জনগণকে স্বাধীনতা সংগ্রামে সামিল করতে উদ্যোগী হয়। কিন্তু হিংসার পথ না অহিংসার পথ সাফল্য আনবে এ নিয়ে প্রচন্ড বিতর্ক ও মতবিরোধ দেখা দেয়। এমন কি শেষ পর্যন্ত দুইটি আদর্শ অনুসরণকারীরা দুইটি পরস্পর বিরোধী শত্রু শিবিরে পরিণত হয়। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে এটা ছিল একটা বড় ট্র্যাজেডি।

লেনিন গান্ধীজীকে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের যোগ্য নেতা হিসেবে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন এবং ভারতের কমিউনিষ্টদের এই মঞ্চে যুক্ত হয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ্য ভূমিকা নিতে উপদেশ দিয়েছিলেন ।

লেনিনের মৃত্যুর পর স্ট্যালিন ক্রমশ লেনিনবাদ থেকে সরে গিয়ে লেনিনের নামেই নিজস্ব একটি মতবাদ, প্রচার করে কমিউনিষ্ট আন্দোলনকে অতি বিপ্লবী সংকীর্ণতাবাদের দিকে ঠেলে দেন। ভারতীয় কমিউনিষ্টরা এই নীতির দ্বারা প্রভাবিত হবার ফলে বারবার বামপন্থী বিচ্যুতির কবলে পড়ে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন ।

ভারতীয় কমিউনিষ্টদের একটা অংশ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তর বলে স্বীকার করতে রাজী হননি । তারা সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি, কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে বিশ্বাসী হয়ে উঠে ছিলেন। ফলে দেশের বাস্তব পরিস্থিতির সঠিক মূল্যায়নে বারবার ভুল করেছেন ।

ত্রিপুরায় 'জনশিক্ষা সমিতি' গঠন করার পর উপজাতি সমাজে জাতীয়তাবাদী চিন্তা ধারার দ্রুত বিকাশ ঘটতে থাকে । শিক্ষা, সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটিয়ে উন্নত সমাজ প্রতিষ্ঠার তীব্র আকাংক্ষা প্রকাশ পেতে থাকে । কমিউনিষ্টদের সম্পর্কে কংগ্রেসের প্রচার উপজাতি নেতাদের মনে গভীর প্রভাব ফেলে। ফলে জনশিক্ষা সমিতির নেতারা বীরেন দত্তের ঘনিষ্ট সম্পর্কে থেকেও কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগ দিতে বার বার অস্বীকার করেন।

দুর্গা চৌধুরী পাড়ার সম্মেলনে গঠিত জনশিক্ষা সমিতির সভাপতি ছিলেন সুধন্বা দেববর্মা, সহসভাপতি ছিলেন দশরথ দেববর্মা, সাধারণ সম্পাদক ছিলেন হেমন্ত দেববর্মা, কার্যকরী সম্পাদক নির্বাচিত হন অঘোর দেববর্মা। হেমন্ত দেববর্মা রাজকর্মচারী হওয়ায় সংগঠন পরিচালনার দায়িত্ব পড়ে অঘোর দেববর্মার উপর। একটি কেন্দ্রীয় কমিটি এবং একটি কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়।

ত্রিপুরা রাজ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় রাজ্যের সর্বত্র প্রকাশ্যে জনসভা মিছিল ও প্রচার নিষিদ্ধ করা হয় । বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পর জনশিক্ষা সমিতি গঠন করার সময়ও এই নিষেধাজ্ঞা বলবৎ ছিল। তবুও জনশিক্ষা সমিতি যেহেতু রাজনৈতিক সংগঠন নয় সেহেতু প্রকাশ্যে জনসভা করে সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তদনুযায়ী আগরতলায় কর্ণেল বাড়ীর মাঠে আইন অমান্য করেই জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রখ্যাত শিল্পী ধীরেন কৃষ্ণ দেববর্মা সভায় সভাপতিত্ব করেন । বক্তাদের মধ্যে দশরথ দেব, সুধন্বা দেববর্মা, অঘোর দেববর্মা এবং বীরচন্দ্র দেববর্মাও ছিলেন। বক্তারা রাজ্যের অজ্ঞ ও নিরক্ষর উপজাতিদের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন। রাজকীয় আইন অমান্য করে এই সভা করার জন্য কারো শাস্তি হয়নি। তখন জনশিক্ষা সমিতির কোন সদস্যই কমিউনিষ্ট ছিলেন না। অঘোর দেববর্মা মানসিক ভাবে প্রস্তুত থাকলেও সমিতির অরাজনৈতিক চরিত্র বজায় রাখার জন্য পার্টির সদস্যপদ গ্রহণ করেননি। পরবর্তী সময়ে বীরেন দত্তের বিশেষ অনুরোধে গোপনে পার্টির সদস্য পদ গ্রহণ করেন।

জনশিক্ষা সমিতির ঐতিহাসিক সম্মেলনে অরাজনৈতিক চরিত্র বজায় রাখার প্রয়োজনেই মূল প্রেরণাদাতা বীরেন দত্ত সহ প্রভাত রায় ও বংশী ঠাকুরকে সম্মেলনে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানান হয়নি। প্রভাত রায় ও বংশী ঠাকুর কমিউনিষ্ট ছিলেন না কিন্তু বীরেন দত্তের ঘনিষ্ঠ ছিলেন।

সমিতির সব সদস্য উৎসাহের সঙ্গে গ্রামে গ্রামে প্রচার ও স্কুল প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করেন । গ্রামের সর্দাররাও খুব উৎসাহের সঙ্গে এই আন্দোলনে যোগ দেন । ফলে অল্পদিনের মধ্যেই খোয়াই, কমলপুর ও সদর বিভাগে ৪৫০ টি এক শিক্ষক বিশিষ্ট প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় ।

৪৫০ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অনুমোদনের আবেদন নিয়ে সমিতির পক্ষে সুধন্বা দেববর্মা, হেমন্ত দেববর্মা, অঘোর দেববর্মা ও নীলমণি দেববর্মা মহারাজা বীর বিক্রমের সঙ্গে এক সাক্ষাতকারে মিলিত হন। সকলের পরিচয় জানার পর মহারাজা শিক্ষা প্রসারের এই উদ্যোগের খুব প্রশংসা করেন এবং আগরতলায় ঠাকুর লোকদের থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দেন। কারণ অভিজাত ঠাকুর লোকেরা পার্বত্য প্রজাদের উন্নতি চায়না । মহারাজা সঙ্গে সঙ্গে ৪৫০ টি বিদ্যালয়ের মঞ্জুরী দিয়ে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাউন সাহেবকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন। এই ঘটনা প্রমাণ করে যে মহারাজা বীরবিক্রম ইউরোপ আমেরিকা ঘুরে আসার পর ১৯৩১ সালে রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের যে বিল প্লাশ করেন তা ছিল মহারাজার আন্তরিক ইচ্ছা। ঐ সময় রাজ্যে কোন রাজনৈতিক দল বা সংগঠনের অস্তিত্ব ছিল না। দশরথ দেবের লেখা থেকে জানা যায় জনশিক্ষা সমিতির

স্কুল সংখ্যা ছিল ৩০০ টি মাত্র। বাকীগুলি চালু করা যায়নি।

জনশিক্ষা সমিতির কার্য কলাপ শুধুমাত্র ত্রিপুরী সম্প্রাদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার কারণ জানা যায়নি। সমিতির নেতাদের কোন লেখাতে বা বক্তব্যে এর কারণ উল্লেখ করা হয়নি। বীরেন দত্তের সবচেয়ে বড় অবদান থাকা সত্বেও তিনিও কোন লেখায় বা বক্তব্যে জনশিক্ষা সমিতির সীমাবদ্ধতার কারণ উল্লেখ করেন নি। একটি কারণ হতে পারে আগরতলা ও খোয়াই বোর্ডিং গুলিতে প্রধানত ত্রিপুরী সম্প্রদায়ের ছাত্ররাই সুযোগ পেত। ত্রিপুরা বোর্ডিং নাম থেকে তা অনুমান করা যায়। বীরেন দত্তের যোগাযোগ বোর্ডিং এর ছাত্রদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

জনশিক্ষা সমিতি গঠিত হবার পর আগরতলার ঠাকুর লোকদের একাংশ পার্বত্য প্রজাদের উপর প্রভুত্ব হারাবার ভয়ে আতংকিত হয়ে 'পার্বত্য উপজাতি সেবা সমিতি' নামে একটি সংগঠন গড়ে তুলেন। মৌখিক নানা প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রজাদের মন জয় করতে চেষ্টা করেন। তারা শেষ পর্যন্ত জনশিক্ষা সমিতির নেতাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে এগিয়ে আসেন। তারা প্রস্তাব দেন দুটি সমিতি একত্র করে পরিচালনার নেতৃত্ব ঠাকুরদের উপর ছেড়ে দিলে আন্দোলন সফল করা সহজ হবে। জনশিক্ষা সমিতি নেতৃত্ব ছেড়ে দিতে রাজী হয়নি ।

সারা রাজ্যের উপজাতি উন্নয়নের স্বার্থে ঐতিহাসিক জনশিক্ষা আন্দোলনে কংগ্রেস নেতারা সহযোগিতার পরিবর্তে জনশিক্ষা সমিতিকে একটি কমিউনিষ্ট সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করে এর বিরুদ্ধে প্রচার করেন । অথচ জনশিক্ষা সমিতির কোন সদস্যই কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য ছিলনা। কংগ্রেস নেতাদের নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গীর জন্যই ক্রমশ জনশিক্ষা সমিতির সদস্যরা কংগ্রেস বিরোধী হয়ে যান । ঠিক একই ভাবে পরবর্তী সময়েও স্থানীয় কংগ্রেস নেতারা ত্রিপুরা রাজ্যের বাস্তব পরিস্থিতির মূল্যায়ন না করে মধ্যবিত্ত অহংবোধের দ্বারা পরিচালিত হওয়ায় রাজ্যের অসংখ্য কংগ্রেস অনুগামী মানুষকে বিরোধী শিবিরে ঠেলে দিয়েছেন ।

জনশিক্ষা সমিতি ক্রমশঃ জনপ্রিয়তা অর্জন করার পর সমাজ সংস্কার মূলক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। উপজাতি সমাজে বিয়ের আগে জামাই খাটা প্রথা প্রচলিত ছিল। যে কোন উৎসব অনুষ্ঠানে ব্যাপক মদ্যপান করার ব্যবস্থা প্রায় বাধ্যতামূলক ছিল, ধর্মের নামে কুলগুরু ও ব্রাহ্মণদের শোষণ করার নানা রীতিনীতি প্রচলিত হয়েছিল। জন্ম-মৃত্যু-বিবাহে পুরোহিতের ভূমিকা এবং সামাজিক নানা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে জনশিক্ষা সমিতি ব্যাপক প্রচার ও সংস্কার মূলক অভিযান শুরু করে।

# ত্রিপুর সংঘ

রাজপারিষদরা এই রকম পরিস্থিতিতে মহারাজাকে বিভিন্ন ভাবে বুঝানোর চেষ্টা করেন যে জনশিক্ষা সমিতির মূল লক্ষ্য শিক্ষার প্রসার নয়। এদের কাজের মূল উদ্দেশ্য রাজনৈতিক। সমিতির পেছনে থেকে কাজ করছে কমিউনিষ্টরা। মহারাজা প্রতিকার হিসাবে একটি বিকল্প সংগঠন গড়ে তোলার ব্যবস্থা করেন। রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রভাবশালী সর্দারদের আগরতলায় নিমন্ত্রণ করে এনে এক সভার আয়োজন করেন। অধিকাংশ সর্দ্দার জনশিক্ষা সমিতির নেতাদের প্রতি সহানুভূতিশীল থাকায় মহারাজার উদ্যোগে গঠিত -"ত্রিপুর সংঘের"- রাজ্য কমিটির নামের তালিকায় জন শিক্ষা সমিতির নেতারাও স্থান পেয়ে যান। এপ্রিল ১৯৪৭ সালে এই কমিটি গঠিত হয়। মহারাজা প্রথমে সুধন্বা দেববর্মা সহ কয়েকজন নেতাকে গ্রেপ্তার করেন। ফলে সর্দারদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ দেখা দেয়। বিশেষ পরিস্থিতি বিবেচনা করে বন্দী নেতাদের মুক্তি দেন। আপোষ রফা হিসেবে জনশিক্ষা সমিতির সদস্য সংখ্যা কমিয়ে দেওয়া হয়। এটাই হল ত্রিপুরায় প্রথম রক্ষণশীল প্রতিক্রিয়া পন্থীদের সংগঠন।

মহারাজা বীর বিক্রমের অকাল মৃত্যুর পর রাজপরিবারের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির উদ্যোগে **"বীর বিক্রম ত্রিপুর সংঘ"** নাম দিয়ে নতুন কমিটি গঠন করা হয় কিন্তু এই সংগঠন জনপ্রিয় হয়নি।

# ত্রিপুরা রাজ্য প্রজা মন্ডল

ত্রিপুর সংঘ গঠন করার সময় প্রগতিশীল নেতাদের প্রতি মহারাজার মনোভাব লক্ষ্য করে ১৯৪৬ সালের মে মাসে 'জনমঙ্গল সমিতি', জনশিক্ষা সমিতি এবং অন্যান্য প্রগতিশীল ব্যক্তিদের নিয়ে **"ত্রিপুরা রাজ্য প্রজা মন্ডল"** নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলা হয়। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে সমস্ত প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক শক্তি গুলোকে ঐক্যবদ্ধ করাই ছিল এই সংগঠনের মূল লক্ষ্য। যোগেশ চন্দ্র দেববর্মা সভাপতি এবং বীরচন্দ্র দেববর্মা সম্পাদক নির্বাচিত হন।

তীব্র হতাশাগ্রস্ত মহারাজা বীরবিক্রম জীবনের শেষ দিকে প্রজাদের আন্দোলন দমনে উদ্যোগী হন। ফলে প্রজাদের মধ্যে একটি গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠনের প্রয়োজন দেখা দেয়। বীরচন্দ্র দেববর্মার মতে-ত্রিপুরা রাজ্য প্রজামন্ডল-গঠন প্রজাদের মধ্যে গতিশীল গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতৃত্ব দানের দাবীরই প্রতিফলন।

ত্রিপুরা রাজ্য প্রজা মন্ডলের প্রচার পুস্তিকায় প্রজাদের প্রধান দাবীগুলো ছিল-

১) প্রজার ভোটে দায়িত্বশীল সরকার চাই ।

২) ভূমিহীনদের জন্য জমি চাই ।

৩) রাস্তাঘাট তৈরী ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি চাই ।

৪) জুমিয়াদের জন্য স্থায়ী পুনর্বাসন চাই ইত্যাদি ।

১৯৪৬ সালের নোয়াখালির দাঙ্গা পীড়িত উদ্বাস্তুরা রাজ্যে আশ্রয় নেওয়ায় তাদের সাহায্য দেবার উদ্দেশ্যে প্রজামন্ডল একটি উদ্বাস্তু পুনর্বাসন কমিটি গঠন করে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে এই কমিটি গঠন করা হয় ।

নহেরুর নেতৃত্বে " **সারা ভারত দেশীয় রাজ্য প্রজা মন্ডলের**" গোয়ালিয়র অধিবেশনে আমন্ত্রিত হয়ে ত্রিপুরা রাজ্য প্রজা মন্ডলের পক্ষে বীরেন দত্ত ও সুধন্বা দেববর্মা, এবং ত্রিপুরা রাজ্য গণপিরষদের পক্ষে তড়িৎ দাসগুপ্ত ও সুখময় সেনগুপ্ত যৌথ ভাবে রাজ্যের প্রতিনিধি হিসেবে দেশীয় রাজ্য প্রজা মন্ডল নাম নিয়ে যোগদান করেন ।সেখান থেকে ফিরে এসে বীরেন দত্ত '**ত্রিপুরা রাজ্যের কথা**' নামে পত্রিকা প্রকাশ করে বিস্তৃত বিবরণ দেন । ১৯৪৮ সালে এই পত্রিকা বন্ধ করে দেওয়া হয়। প্রজামন্ডলকে কমিউনিষ্ট সংগঠন নাম দিয়ে তাদের গোয়ালিয়র অধিবেশনে যোগদানে আপত্তি তোলা হয়েছিল। ফলে তারা ভ্রাতৃত্বমূলক প্রতিনিধি হিসেবে গৃহীত হন ।

ত্রিপুরা রাজ্য প্রজামন্ডলের উদ্যোগে সারা রাজ্যে রাজনৈতিক চিন্তাধারায় একটা পরিবর্তন আসে । সর্বত্র আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। প্রজাদের মধ্যে সাহস এবং উৎসাহ দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

## ত্রিপুরা রাজ্য গণমুক্তি পরিষদ

ত্রিপুরায় জনশিক্ষা সমিতি প্রাথমিক শিক্ষা প্রাসার এবং সমাজ সংস্কার মূলক কাজ শুরু করে দুই বছরের মধ্যে পার্বত্য অঞ্চলে জনপ্রিয় হয়ে উঠায় রাজপরিবার এবং শহরের ঠাকুর লোকদের মধ্যে উদ্বেগ সৃষ্টি হয়। প্রথমে "ত্রিপুর সংঘ" গঠন করে মহারাজা বীর বিক্রম অনুগত সর্দারদের মাধ্যমে প্রচার চালিয়ে জনশিক্ষা সমিতির পরিবর্তে "ত্রিপুর সংঘের" জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির উদোগ নেন।

কিন্তু 'ত্রিপুর সংঘ' গঠনের ঠিক এক বছর পরেই ১৯৪৭ সালের ১৭ই মে মহারাজা বীরবিক্রম কিশোরের অকাল মৃত্যু হওয়ায় 'ত্রিপুর সংঘ' দুর্বল হয়ে পড়ে।

মহারাজার মৃত্যুর পর যুবরাজ কিরীট বিক্রম নাবালক থাকায় মহারাণী কাঞ্চন

প্রভা দেবীকে রাজপ্রতিনিধি করে একটি কাউন্সিল গঠন করা হয়। সারা রাজ্যে চূড়ান্ত অস্থির অবস্থা সৃষ্টি হয়। তিন মাস পরই ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট বিভক্ত ভারত স্বাধীনতা লাভ করে। বৃটিশ সরকার জাতীয় কংগ্রেসের নির্বাচিত প্রধান মন্ত্রী জহরলাল নেহেরুর হাতে ভারতের ক্ষমতা হস্তান্তর করে। পাকিস্তানের ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয় মুসলিম লীগ নেতা জিন্নার হাতে।

মহারাজ বীর বিক্রম হিন্দু প্রজাদের স্বার্থের কথা বিবেচনা করে মৃত্যুর আগেই পারিষদ বর্গের সঙ্গে আলোচনা ক্রমে ভারত রাষ্ট্রে যোগদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। রাজপ্রতিনিধি মহারাণী কাঞ্চন প্রভা দেবী স্বাধীনতা ঘোষণার দুদিন আগে ১৯৪৭ সালের ১৩ই আগষ্ট মহারাজার শেষ ইচ্ছা ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভারত রাষ্ট্রে যোগদানের সিদ্ধান্ত প্রধানমন্ত্রী নেহেরুকে জানিয়ে দেন। প্রকৃত পক্ষে ত্রিপুরায় সেদিনই রাজতন্ত্রের অবসান হয়। ভারত সরকারের নিযুক্ত দেওয়ানের পারামর্শ অনুযায়ী রাজ্যের শাসন কার্য চালু হয়।

সি.পি.আই দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক পি.সি.যোশী ভারতের স্বাধীনতাকে অভিনন্দন জানান। কিন্তু কেন্দ্রীয় কমিটির অতিবিপ্লবী সদস্যরা ভারতের স্বাধীনতা ও ভারত সরকারের শ্রেণী চরিত্র নিয়ে তীব্র বিতর্ক শুরু করেন। ফলে নতুন নীতি নির্ধারনের জন্য পার্টি সম্মেলন আহ্বানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারীমাসে কলকাতায় সি.পি.আই দলের দ্বিতীয় পার্টি সম্মেলনে পি.সি.যোশীর বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনার পর তাঁকে সম্পাদকের পদ থেকে সরিয়ে অতি বিপ্লবীদের মুখপাত্র বি.টি রনদিভেকে সাধারণ সম্পাদক করা হয় এবং নতুন পলিটব্যুরো গঠন করা হয়। পার্টির কর্মসূচীতে বলা হয় - সাম্রাজ্যবাদ ঘেষা আপোষ মূলক স্বাধীনতা প্রকৃত স্বাধীনতা নয়। সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে কংগ্রেস সরকার কে হটিয়ে শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি, কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে সরকার গঠন করে প্রকৃত স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সমস্ত পার্টি সংগঠনকে নির্দেশ দেওয়া হয় সর্বত্র জঙ্গী আন্দোলন গড়ে তুলে গ্রাম ও শহরের সব সরকারী অফিস দখল করতে হবে। যেখানে যা অস্ত্র সংগ্রহ যায় তা দিয়েই সশস্ত্র বিপ্লব শুরু করতে হবে।

এই রকম পরিস্থিতিতে ছয়মাস বয়সী স্বাধীন ভারতের কংগ্রেস সরকারের প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ দিলেন যেখানে যেখানে সশস্ত্র আক্রমণ শুরু হবে, সেখানেই পার্টিকে বেআইনী ঘোষণা করতে হবে। জঙ্গী আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিতে হবে। সারাদেশে হাজার হাজার কমিউনিষ্ট নেতা ও কর্মীদের গ্রেপ্তার করা হয়।

ত্রিপুরায় জনশিক্ষা সমিতি ও প্রজামন্ডল কমিউনিষ্ট নেতাদের দ্বারা পরিচালিত বলে সাধারণ ধারণা থেকে এই দুই সংগঠনের নেতাদের গ্রেপ্তার করা শুরু হয়। প্রভাত রায়, বংশী ঠাকুর, বীরচন্দ্র দেববর্মা কমিউনিষ্ট সদস্য না হয়েও গ্রেপ্তার হয়ে জেলে যান। জনশিক্ষা সমিতির প্রথম সারির নেতাদের গ্রেপ্তার করার জন্য বিভিন্ন গ্রামে তল্লাসী চালানো হয়। নেতাদের সন্ধান দেবার জন্য সাধারণ গ্রাম বাসীর উপর নানা ধরণের নিপীড়ন চলতে থাকে।

এই সময় জনশিক্ষা সমিতির নেতারা গোপনে মিলিত হয়ে ভারতের প্রধান মন্ত্রী জহরলাল নেহেরুর কাছে এক "স্মারক লিপি" পাঠিয়ে আবেদন জানিয়েছিলেন "আমরা কমিউনিষ্ট নই, পার্বত্য প্রজাদের শিক্ষা ও সমাজ সংস্কার মূলক কাজ করাই আমাদের মূল লক্ষ্য"। কয়েকবার স্মারকলিপি পাঠাবার পরেও কেন্দ্রীয় সরকার বিষয়টিকে বিবেচনা করা বা তদন্ত করার প্রয়োজন বোধ করেনি । স্থানীয় কংগ্রেস নেতারাও সাধারণ মানুষের উপর পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর অত্যাচার ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ, বিবৃতি বা অনুসন্ধান করার প্রয়োজন বোধ করেন নি ।

জনশিক্ষা সমিতির স্মারক লিপি কেন্দ্রীয় নেতারা যদি আবর্জনার ঝুড়িতে নিক্ষেপ না করে, সংরক্ষণ করে থাকেন তাহলে দিল্লীর মহাফেজ খানায় এখন অনায়াসে তা খুঁজে বের করা যাবে।

এসব ঘটনায় ত্রিপুরার সরল প্রাণ উপজাতিদের মধ্যে বদ্ধমূল ধারণা হয়েছে যে কংগ্রেস উপজাতিদের উন্নতি চায়না। ত্রিপুরার ভারত ভুক্তি সম্পর্কে নানা প্রচারের ফলে উপজাতিদের মধ্যে এমন বিশ্বাসও জন্মেছে যে কংগ্রেস সরকার কৌশলে ত্রিপুরার স্বাধীনতা কেড়ে নিয়েছে।

এই মানসিকতা থেকেই আত্মরক্ষার তাগিদে জনশিক্ষা সমিতির পাঁচ জন নেতা গোপনে এক সভায় মিলিত হয়ে পুলিশ ও মিলিটারীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে -**'ত্রিপুরা রাজ্য গণমুক্তি পরিষদ'**- নামে এক সংগঠন গড়ে তুলেন। গ্রামে গ্রামে গাদা বন্দুক সংগ্রহ করে গেরিলা যুদ্ধের কৌশলে প্রতিরোধ সংগ্রাম শুরু হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ফেরত প্রাক্তন সৈনিকদের হাতে রাইফেল ছিল। তারাও জাতীয় মর্যাদা রক্ষার সংগ্রামে যোগ দিতে থাকে। চা-বাগানের সাঁওতাল শ্রমিকদের ডেকে এনে তীর ধনুক চালনা শিক্ষা দেওয়া হয়। এভাবেই কংগ্রেস নেতাদের অবহেলা, নির্লিপ্ততা ও পার্বত্য জনগণের প্রতি অবজ্ঞার মনোভাব একটি অরাজনৈতিক সমাজ সেবামূলক সংগঠনকে সশস্ত্র সংগ্রামের মুখে ঠেলে দিয়েছিল । এই রকম কঠোর পরিস্থিতির মধ্যে পড়েও জনশিক্ষা সমিতির নেতারা সশস্ত্র সংগ্রামের শেষ মুহূর্ত পর্যন্তও কমিউনিষ্ট পার্টির

সদস্য পদ নিতে অস্বীকার করেছিলেন।

সি.পি.আই. নেতারা এই কঠিন মুহূর্তে সশস্ত্র সংগ্রামীদের সর্বতো ভাবে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন। বীরেন দত্ত মুক্তিপবিষদের কর্মসূচী ছাপিয়ে পূর্ব পাকিস্তান থেকে ফেরার পথে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যান। আসাম থেকে প্রাদেশিক সম্পাদক প্রাণেশ বিশ্বাস, মোহন চৌধুরী, রঞ্জন রায়, মাখন দত্ত ও রাখাল রাজকুমারকে সঙ্গে নিয়ে এসে মুক্তিপরিষদকে রাজনৈতিক, সাংগঠনিক ও সামরিক বিষয়ে সাহায্য করতে থাকেন। মোহন চৌধুরী ছিলেন প্রাক্তন হাবিলদার। এছাড়া কলকাতা থেকে আসেন কংসারী হালদার, বিজয় বসু ও নৃপেন চক্রবর্তী এবং একজন বন্দুক মেরামতের কারিগর ।

মুক্তি পরিষদের সংগ্রামের ফলে সাধারণ উপজাতিদের মধ্যে দ্রুত জাতীয়তা বাদী চিন্তা চেতনার বিকাশ ঘটে । মার্কস বাদী শিক্ষার প্রভাবে যুবকদের মধ্যে বিরাট মানসিক পরিবর্তন ঘটে । ফলে ১৯৪৯ সালের শেষ দিকে এক গোপন বৈঠকে মুক্তি পরিষদের সমস্ত সদস্যরাই একযোগে কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য পদ গ্রহণ করেন । রাখাল রাজকুমারকে সম্পাদক করে সি.পি.আই ত্রিপুরা জেলা সাংগঠনিক কমিটি গঠন করা হয়। এর আগে কমিউনিষ্ট পার্টি ছিল আগরতলায় ছোট্ট একটি সেল কমিটি মাত্র। তখনকার সাংগঠনিক রীতি অনুযায়ী কুমিল্লা জেলা কমিটির একটি ব্রাঞ্চ। বীরেন দত্ত এবং দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত গ্রেপ্তার হবার পর আগরতলা সেল কমিটি নিষ্ক্রিয় হয়ে গিয়েছিল।

১৯৪৮ সালের মে মাসে মুক্তি পরিষদ গঠিত হয়। তিনমাসের মধ্যেই ১৫ই আগষ্ট ১৯৪৮ তারিখে স্বাধীনতা দিবসে মুক্তি পরিষদের সাংগঠনিক শক্তি প্রদর্শনের জন্য এক বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করা হয় । অত্যন্ত গোপনে লোক জমায়েত করে আগরতলা শহরে উমাকান্ত মাঠে বিশাল এক স্বল্প স্থায়ী সভায় বক্তব্য রাখেন মুক্তি পরিষদের সাধারণ সম্পাদক অঘোর দেববর্মা। মিছিলের নেতৃত্ব দেন হেমন্ত দেববর্মা ও রবীন্দ্র দেববর্মা। দশরথ দেব ও সুধন্বা দেববর্মা সংগঠনের স্বার্থে প্রকাশ্যে আসার ঝুঁকি নেননি। রাজ্যের পুলিশ যাদের গ্রেপ্তার করার জন্য গ্রামে গ্রামে ঘুরে হয়রান হচ্ছে তারাই চোখের সামনে মিছিল করে স্বল্পস্থায়ী সভা করে নিরাপদে ফিরে গিয়েছিল। হাজার হাজার মানুষ তাদের ঘিরে রেখে মিছিল করেছিল। এই ঐতিহাসিক মিছিল ত্রিপুরার রাজনৈতিব আন্দোলনের ইতিহাসে অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

রাজার অনুগত উপজাতি সর্দাররা দেওয়ানী শাসনে অবহেলিত ছিল । কংগ্রেস নেতারাও সর্দারদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করার চেষ্টা করেন নি । ফলে প্রায় সমস্ত সর্দাররাই মুক্তি পরিষদে যোগ দিয়েছিল। এর ফলে দুই বছরের বেশী সময় বিশাল এলাকায় মুক্তাঞ্চল গঠন করে মুক্তি পরিষদের শাসন কায়েম হয়েছিল। দুর্গম অঞ্চলে

নেতাদের জন্য আত্মগোপনের ঘাঁটি তৈরী করা হয়েছিল।

রাজভক্ত প্রজারা হঠাৎ রাজতন্ত্রের অবসানে শংকিত ও অসহায় বোধ করেছিল। ফলে মুক্তি পরিষদের শক্তি দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছিল। নেতারা বুঝাবার চেষ্টা করেছেন যে রাজ্যে আর কোন রাজা আসবেনা। জনগণের শাসন কায়েম করতে হবে ।

রাজ্যের শাসন পরিচালনা করছে বাঙ্গালী দেওয়ান - বাঙ্গালী পুলিশ - বাঙ্গালী কর্মচারী। মহাজন - ব্যবসায়ীরাও সবাই বাঙ্গালী কাজেই বাঙ্গালীকেই উপজাতিরা শত্রু হিসেবে ভাবতে থাকে। নেতারা বুঝাতে থাকেন আসল শত্রু হল কংগ্রেস সরকার। প্রাক্তন উপজাতি সৈনিকরা অস্ত্র চালনায় দক্ষতা অর্জন করেছিল। গেরিলা যুদ্ধের কৌশলও শিখেছিল। কিন্তু তাদের মধ্যে কোন রাজনৈতিক চেতনা ছিলনা। নিয়মিত ক্লাশ করে তাদের মধ্যে রাজনৈতিক শিক্ষা বিস্তারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

১৯৪৮ সালে ত্রিপুরায় তীব্র খাদ্য সংকট দেখা দিয়েছিল। রাজধানী আগরতলা শহরের নিকটবর্তী গোলাঘাটি অঞ্চলে খাদ্য সংকট প্রায় দুর্ভিক্ষের অবস্থা সৃষ্টি করেছিল। দাদন প্রথায় জুমিয়াদের সব ফসল মহাজনের কুক্ষিগত হয়েছিল। কৃষক ও জুমিয়াদের হাতে নগদ টাকা ছিলনা। সুদসহ বাকীতে ধান চাউল ক্রয় করার জন্য প্রয়োজনে লিখিত চুক্তি ও দলিল করে দিতে রাজী ছিল। কিন্তু মহাজন প্রস্তাবে সম্মতি দিয়ে গোপনে পুলিশের সাহায্য নিয়ে হঠাৎ জনতার উপর গুলি বর্ষণ করে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে চেষ্টা করে। এই ঘটনায় পুলিশের গুলিতে সাত জন কৃষকের মৃত্যু ঘটে ।এর ফলে গণমুক্তি পরিষদের আন্দোলন আরো জঙ্গী রূপ নিয়েছিল।

নেতাদের গ্রেপ্তারে ব্যর্থ হয়ে পুলিশ ও মিলিটারী আক্রমণ ভয়ানক মারমুখী রূপ নেয়। বিপুল সংখ্যক সাধারণ গ্রামবাসী উপজাতিকে গ্রেপ্তার করা হয়। শত শত ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। নেতাদের গ্রেপ্তারে সাহায্য করার জন্য মোটা টাকার পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। কিন্তু পুলিশ কোথাও সাফল্য অর্জন করতে পারেনি।

মুক্তি পরিষদকে ধ্বংস করার জন্য সামরিক আইন জারি করা হয় ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে। বহু গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। নানা ভাবে অত্যাচার নিপীঃড়ন বৃদ্ধি করা হয়। অনেকে গুলিতে মারা যায়। কিন্তু কারো মনোবল ধ্বংস করা যায়নি।

পদ্ম বিলে নারী-সমিতি মিলিটারীর নির্দেশ মত বেগার খাটতে রাজী না হওয়ায় সংঘর্ষ বাধে। মিলিটারীর গুলিতে কুমারী, মধুমতী ও রূপশ্রী নামে তিন যুবতী মারা যায়। নারী হত্যার প্রতিশোধ নিতে গ্রামে গ্রামে সশস্ত্র নারী বাহিনী গেরিলা যুদ্ধের ট্রেনিং নিতে এগিয়ে আসে ।

চাম্পাহাওরে গেরিলা কায়দায় আক্রমণ চালিয়ে মিলিটারী বাহিনীর মধ্যে আতংক সৃষ্টি করা হয়। তারা ক্যাম্প থেকে বাইরে আসতে ভয় পেতে থাকে।

১৯৪৮ থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত গেরিলা বাহিনীর সঙ্গে মিলিটারীর সংঘর্ষ বাড়তে থাকে। সদর দক্ষিণে সুধন্ব্যা দেববর্মা ও অঘোর দেববর্মার নেতৃত্বে গেরিলা বাহিনী গড়ে উঠে। অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে বিভিন্ন ক্যাম্প ও থানা থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করা হয়। 'হামলা করে সরে পড়' এই নীতি অনুসরণ করায় গেরিলা বাহিনীর বিশেষ ক্ষতি হয়নি। চীপ কমিশনার নানজাপ্পা কঠোর ব্যবস্থা নিয়ে মুক্তি পরিষদকে ধ্বংস করবেন বলে ঘোষণা দিয়েও সফল হতে পারেননি।

মুক্তিপরিষদ বিচার ও জমি সংক্রান্ত নিয়ম কানুন চালু করেছিল। মু ক্তাঞ্চলে সমাজসংস্কার মূলক কাজও করেছিল। মহাজনের শোষণ কমিয়ে এনেছিল। দাদনের হার নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল।

১৯৪৯ সালের শেষ দিকে অঘোর দেববর্মা মুক্তি পরিষদকে কমিউনিষ্ট পার্টিতে রূপান্তরিত করার প্রস্তাব দেন। নানা বির্তকের পর নেতারা রাজী না হওয়ায় অঘোর দেববর্মা মুক্তিপরিষদ ছেড়ে চলে যান। হেমন্ত দেববর্মাকে সাধারণ সম্পাদক করা হয়। এই ঘটনায় অঘোর দেববর্মা জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। যদিও এই সিদ্ধান্ত অঘোর দেববর্মার ব্যক্তিগত নয়। তৎকালীন কমিউনিষ্ট পার্টির নির্দেশ অনুযায়ীই অঘোর দেববর্মা এরূপ কাজ করেছিলেন। তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি গোপনে পার্টির সদস্যপদ নিয়েছিলেন। অঘোর দেববর্মার দুজন অনুগামী বিশ্বাসঘাতকতা করে তাকে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেয়। তার পুরস্কার স্বরূপ একজন পুলিশের চাকরী পেয়েছিল।

১৯৫০ সালে সি.পি.আই রুশ পার্টির পরামর্শে নীতি ও কর্মসূচী বদল করে অবাস্তব হটকারী নীতি ও কর্মসূচীর জন্য রনদিভেকে পার্টি থেকে বহিষ্কার করা হয়। রাজ্যেশ্বর রাও নতুন সাধারণ সম্পাদক হন। পুরাতন পলিটব্যুরোর সদস্যদের বরখাস্ত করে নতুন কমিটি গঠন করা হয়।

গণমুক্তি পরিষদ মুক্তাঞ্চলে জমি বন্দোবস্ত দেওয়া, খাস জমি বন্টন করা, কৃষি মজুরি ও ফসলের মূল্য নির্ধারণ করা, সামাজিক ও ফৌজদারী বিচার করা, অভাবের দিনে সাহায্য করার জন্য শস্য গোলা গঠন করা ইত্যাদি কাজে শৃংখলা ও সাফল্যের পরিচয় দিয়েছিল। রাজভক্ত প্রজাদের কাছে দশরথ দেব হয়ে উঠেছিলেন মুকুট হীন রাজা। রাজাদের আদেশ যেভাবে পালিত হত দশরথের নির্দেশ সে ভাবেই কার্যকর হত।

এই সময় 'স্বস্তি সমিতি' নামে ধর্মনগরে একটি কৃষি সমবায়কে ৫০০ দ্রোণ খাস

জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয় । বাস্তবে তাদের দখলিকৃত জমির পরিমাণ কয়েক গুণ বেশী ছিল। স্থানীয় রিয়াং ও চাকমা পরিবারগুলোকে উচ্ছেদ করা শুরু হয়। চাকমারা প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু করে এবং গণমুক্তি পরিষদের নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে । এখানেও কংগ্রেস দল উপজাতিদের বিরুদ্ধে প্রচার শুরু করে।

মুক্তিপরিষদ এভাবে ১৯৫২ সালের সাধারণ নির্বাচনের সময় পর্যন্ত উপজাতি ও অন্যান্য কৃষক স্বার্থ রক্ষার সংগ্রাম চালিয়ে যায় । সি.পি.আই অতিবিপ্লবী কর্মসূচী বাতিল করে সাধারণ নির্বাচনে অংশ গ্রহণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা কারায় বেআইনী অবস্থা থেকে মুক্ত হয়। রাজবন্দীদের মুক্তির দাবী নিয়ে নির্বাচনী প্রচার শুরু হয়। গণমুক্তি পরিষদ প্রকাশ্যে কাজ করার সুযোগ পেলেও নেতাদের গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বহাল থাকে। আত্মগোপন অবস্থায় গ্রেপ্তার এড়িয়ে দশরথ দেবকে নির্বাচনে ব্যালটের লড়াইয়ে যোগ দিতে হয় ।

প্রথম নির্বাচনে কমিউনিষ্ট প্রার্থীদের বি পুল ভোটে জয়লাভের মধ্য দিয়ে ত্রিপুরার উপজাতি জনগণের মধ্যে পার্টির জনপ্রিয়তা এক ঐতিহাসিক দিক চিহ্ন হয়ে দেখা দেয় । এতে প্রমাণ হয় জনগণের প্রতি আন্তরিক দায়িত্ববোধের পরিচয় দিতে পারলে রাজনৈতিক ভুলের জন্য ক্ষতি স্বীকার করেও জনগণ নেতাদের পাশেই থাকে। ত্রিপুরায় নেতাদের ভুলের জন্য সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু হয়নি। কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকারের অবহেলা, উদাসীনতা এবং স্থানীয় নেতাদের অবজ্ঞা ও প্রশাসনের বাস্তব বর্জিত নীতিই এরাজ্যে সশস্ত্র সংঘাতের জন্য দায়ী । এই আন্দোলনই জন্ম দিয়েছে সমাজতন্ত্রের আদর্শে বিশ্বাসী একটি শক্তিশালী পার্টি - সি পি.আই।

## ৬ - রক্ষণশীল প্রতিবিপ্লবী ধারা

ত্রিপুরায় রাজতন্ত্রের অবসানের সন্ধিক্ষনে রক্ষণশীল প্রতিক্রিয়া পন্থীরা প্রথমে মহারাজার উদ্যোগে "ত্রিপুর সংঘ" এবং মহারাজার অকাল মৃত্যুর পর রাজ ভ্রাতা দুর্জয় কিশোরের উদ্যোগে "বীরবিক্রম ত্রিপুর সংঘ" এবং কুঞ্জেশ্বর দেববর্মার উদ্যোগে "সেংক্রাক' অর্থাৎ 'বীর' নামক সংগঠন গড়ে ইতিহাসের গতিকে উল্টোদিকে ঘুরিয়ে দিতে প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু জন জাগরণকে রুখে দেওয়া পৃথিবীর কোন দেশেই সম্ভব হয়নি। ত্রিপুরাতেও তা সফল হয়নি। ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য ক্ষমতাবানরা সব সমাজেই শেষ চেষ্টা করে থাকেন। এটা ইতিহাসেরই শিক্ষা। রাজতন্ত্রের অবসান মানব সমাজের ইতিহাসে এক অবধারিত পদক্ষেপ।গণতন্ত্রের পীঠভূমি বৃটেনে রাজতন্ত্রের ঐতিহ্য রক্ষার জন্য যে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে তা সে দেশের জনগণ এখন আর বহন করতে রাজী নয়। সারা বিশ্বে উপনিবেশ স্থাপন করে ঐক্য ও ঐতিহ্যের প্রতীক

হিসেবে ব্রিটিশ সরকার রাজতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। বিশাল ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের বিপুল আয়ের উৎস এখন আর নেই। তাই এখন রাজতন্ত্র বাতিল করার দাবী উঠেছে। সারা বিশ্বের অল্প কয়েকটি দেশে এখনো রাজা, বাদশারা টিকে আছে। কিন্তু মানব সমাজের ইতিহাস তাদের বিদায় দিতে প্রস্তুত হচ্ছে।

# ত্রিপুরায় রাজনৈতিক দলের উদ্ভব

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে ত্রিপুরায় কোন রাজনৈতিক দল গড়ে উঠেনি। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী দেশীয় রাজ্য গুলোতেও গণতান্ত্রিক অধিকার ভোগ করার সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায়, ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলা ও বিভাগীয় শহরগুলোর রাজকর্মচারীদের পরিবারে শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে একটা উন্মাদনা সৃষ্টি হয়। এর আগে অনুশীলন ও যুগান্তর দলের গুপ্ত সমিতির নেতাদের উদ্যোগে ছাত্রসংঘ, ভ্রাতৃসংঘ, মিলন সংঘ, ইত্যাদি কেন্দ্রগুলোতে শরীর চর্চা ও সাংস্কৃতিক কার্য কলাপের আড়ালে রাজনৈতিক চেতনা বিকাশের সূত্রপাত হয়েছিল। গান্ধীজীর অসহযোগ এবং আইন অমান্য আন্দোলনের প্রভাবও পড়েছিল।

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে নির্বাচিত সরকার চালু হওয়ায় গণতান্ত্রিক চেতনার বিকাশ ঘটে। ফলে ১৯৩৮ সালে জেল ফেরত অনুশীলন ও যুগান্তর দলের নেতারা দুটি দৃষ্টিভঙ্গীতে বিভক্ত হয়ে **'ত্রিপুরা রাজ্য জনমঙ্গল সমিতি'** এবং **'ত্রিপুরা রাজ্য গণপরিষদ'** নামে দুটি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মঞ্চ গড়ে তুলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে রাজার অধীনে দায়িত্বশীল সরকার চাই। প্রজা কল্যাণ মূলক ব্যবস্থা চাই এগুলিই ছিল আন্দোলনের প্রধান দাবী। শহর কেন্দ্রীক এসব আন্দোলনের মঞ্চ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধাক্কায় স্তব্ধ হয়ে যায়। যুদ্ধের সময় সব রকম রাজনৈতিক প্রচার মিছিল সভা নিষিদ্ধ হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ভারতের স্বাধীনতা লাভ অনিবার্য হয়ে উঠায় ত্রিপুরাতেও জাতীয় রাজনৈতিক দলের রাজ্য শাখা গড়ে উঠতে থাকে।

# ত্রিপুরা রাজ্য কংগ্রেস

১৯৪৬ সালের ২৬ জানুয়ারী 'ত্রিপুরা রাজ্য গণপরিষদের' নেতারা আনুষ্ঠানিক ভাবে কংগ্রেস দল গঠন করে কংগ্রেসের নামেই আন্দোলন শুরু করেন। তখন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির অধীনে একটি জেলা কমিটি হিসাবে কাজ শুরু হয়। দেশ ভাগের পরে 'ত্রিপুরা রাজ্য কংগ্রেস কমিটি' গঠন করা হয়।

স্বাধীনতার আগে কোন মহকুমার সঙ্গে রাজধানীর যোগাযোগের রাস্তা ছিল না। গ্রামাঞ্চলে সংগঠন গড়ে তোলা খুবই কঠিন কাজ ছিল। শচীন্দ্রলাল সিংহ, উমেশ লাল

সিংহ এবং সুখময় সেনগুপ্ত ভাল সংগঠক ছিলেন। তড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত এবং শচীন্দ্র লাল সিংহের বক্তৃতা জনমনে দাগ কাটতো। রিয়াংদের মধ্যে শচীন বাবুর কিছু প্রভাব ছিল। অন্যত্র উপজাতিদের অধিকাংশ গণমুক্তি পরিষদের প্রভাবে চলে গিয়েছিল। ১৯৪৭ সালের ১৫ ই আগষ্ট স্বাধীনতা দিবস পালন করা হয় সমস্ত বিভাগীয় অফিসে।

মহারাজার শাসনে চাকমারা উপেক্ষিত ছিল তারাও কংগ্রেসের সঙ্গে ঘনিষ্ট যোগাযোগ স্থাপন করে। ধর্মনগরের হিতসাধনী সভা কংগ্রেসে যোগ দেয়। বিলনীয়া, উদয়পুর ও অমরপুরেও কংগ্রেস শক্তিশালী হয়ে উঠে। তবে রাজার বিরুদ্ধে কথা বলতে অনেকেই রাজী ছিলনা। প্রকৃত পক্ষে বাঙ্গালী ব্যবসায়ী, মহাজন, ঠিকেদার ও কিছু বাঙ্গালী কর্মচারী ছিল কংগ্রেসের মূল শক্তি ।

## ফরোয়ার্ড ব্লক

১৯৪৭ সালে বাঙ্গালী উদ্বাস্তুদের মধ্যে কিছু ফরোয়ার্ড ব্লক সমর্থক আগরতলায় এসে একটি কমিটি গঠন করেন। দ্বিজেন দে, শৈলেশ সেন, গোপীবল্লভ সাহা, হীরেন নন্দী, সতী ভরদ্বাজ, অনিলদাসগুপ্ত, কমলারঞ্জন তলাপাত্র, হৃষিকেশ দত্ত এরাই ছিলেন উল্লেখযোগ্য। শহরের সীমানার মধ্যেই তাদের কাজকর্ম সীমাবদ্ধ ছিল। পরে উদ্বাস্তু আন্দোলনের মাধ্যমে বিভিন্ন বিভাগে শাখা সংগঠন গড়ে উঠে। উদ্বাস্তুদের জন্য শিক্ষার জরুরী প্রয়োজনে আগরতলা ও বিভিন্ন বিভাগে বেসরকারী উদ্যোগে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ার কাজে ফরোয়ার্ড ব্লক নেতারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

## আর. এস. পি

১৯৪৭ সালের শেষ দিকে বীরবিক্রম কালেজের কিছু ছাত্রের উদ্যোগে আর এস পির একটি কমিটি কাজ শুরু করে। ১৯৪৮ সালে বিখ্যাত উকিল যোগেশ চক্রবর্তীর নেতৃত্বে দলটি সক্রিয় হয়ে উঠে। তবে এই দলের কাজ কর্মও শহরকেন্দ্রিক ছিল । ক্রমে ক্রমে কিছু কিছু গ্রামেও প্রভাব পড়েছে ।এই দলের নেতৃত্বে বড় কোন আন্দোলন গড়ে উঠেনি।

## সি.পি.আই ত্রিপুরা কমিটি

ত্রিপুরায় ১৯৩৮ সালে জেল থেকে মুক্ত হয়ে অনুশীলন দলের নেতা বীরেন দত্ত কমিউনিষ্ট সংগঠন গড়তে উদ্যোগ নেন।একই দলের নেতা দেবপ্রসাদ সেনগুপ্তও মুক্তি পাবার পর কমিউনিষ্ট পার্টি করার সিদ্ধান্ত নেন। অনুশীলন দলের বহু নেতাই জেল থেকে কমিউনিষ্ট আদর্শে বিশ্বাসী হয়ে মুক্তির পর বিভিন্ন অঞ্চলে কমিউনিষ্ট পার্টি গঠন

করার কাজে উদ্যোগী হন। বাংলার কমিউনিষ্ট দলে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় কেন্দ্রীয় নেতারা চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। কারণ তাদের মধ্যে রোমান্টিক ভাবাবেগ বেশী পরিমাণে ছিল। ফলে অতি বিপ্লবী ঝোঁকও বেশী ছিল। বাংলার কমিউনিষ্ট আন্দোলনে এর প্রভাব পড়েছিল বার বার।

পার্টি বেআইনী থাকায় গোপন সংগঠন তৈরী করে কাজ চালানো হতো। ত্রিপুরায় বীরেন দত্তের চেষ্টায় দশ-বার জনের একটি সেল গঠন করা সম্ভব হয়েছিল। ত্রিপুরা জেলা কমিটির (কুমিল্লা কমিটির) অধীনে সেলের কাজ শুরু হয়। দেবপ্রসাদ সেনগুপ্তকে সেলের সম্পাদক করা হয়। প্রকাশ্যে কমিউনিষ্ট পার্টির কাজ করা এ রাজ্যেও সম্ভব ছিলনা। **'ত্রিপুরা রাজ্য জনমঙ্গল সমিতি', 'জনশিক্ষা সমিতি', 'ত্রিপুরা রাজ্য প্রজামন্ডল'** ইত্যাদি যুক্ত মঞ্চ তৈরী করে গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলা হয়. । বংশী ঠাকুর, প্রভাত রায়, বীরচন্দ্র দেববর্মা কমিউনিষ্ট পার্টির সংগ্রামের কর্মসূচীও রণকৌশল মেনে নিতে পারেননি । তবুও শেষ দিন পর্যন্তও যুক্তমঞ্চে থেকেই আন্দোলন চালিয়েছিলেন। কমিউনিষ্ট সন্দেহে তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে কয়েকবার। কিন্তু তারা কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য পদ নিতে রাজী হননি। বীরচন্দ্র দেববর্মা ১৯৭৫ সালে রাজ্যসভায় নির্বাচিত হবার আগে পার্টির সদস্য পদ নেননি। বংশীঠাকুর ও প্রভাত রায় কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে গণমুক্তি পরিষদের নেতারা একযোগে কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগ দেবার ফলে ত্রিপুরায় ১৯৪৯ সালের শেষ দিকে শক্তিশালী কমিউনিষ্ট পার্টি গড়ে উঠে। কেন্দ্রীয় নেতারাও একটা ক্ষুদ্র পার্টির বিরাট পরিবর্তনের ঘটনায় সচকিত হয়ে ত্রিপুরার প্রতি বিশেষ নজর দিতে বাধ্য হন। ১৯৫২ সালের প্রথম নির্বাচনে প্রকাশ্যে লালঝান্ডা নিয়ে কমিউনিষ্ট পার্টির নামে সভা, সমিতি ও মিছিল, মিটিং শুরু হয় । নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়লাভের পর আগরতলায় বিশাল বিজয় মিছিল দেখে বিরোধী দলগুলোর মধ্যে বিরাট আলোড়ন দেখা দেয় । ত্রিপুরা ভারতের রাজনৈতিক মানচিত্রে একটি উজ্জ্বল তারকার মত ফুটে উঠে। যেমন হয়েছিল ১৯৫৭ সালের নির্ব্বচনে কেরালার কমিউনিষ্ট সরকার গঠনের পর বিশ্বের মানচিত্রে। ভোটের মাধ্যমে সরকার গঠনের সম্ভাবনা কমিউনিষ্ট আন্দোলনে এক নতুন যুগের সৃষ্টি করে। এবিষয়ে বিতর্ক চলছে অর্ধ শতাব্দীর বেশী সময় ধরে। কমিউনিষ্ট পার্টি বার বার বিভক্ত হয়েছে ঐ একটি প্রশ্নেই । মানব সমাজের সংগ্রামী ইতিহাসই সব প্রশ্নের সমাধানের পথ খুলে দেয়। পৃথিবীর সব দেশের কমিউনিষ্ট আন্দোলনের ইতিহাস হল রক্তাক্ত সংগ্রামের ইতিহাস। আঁকা, বাঁকা পথ ধরে নানা ভুল ভ্রান্তির মধ্যেও মানব সমাজে স্থায়ী শান্তি ও সমৃদ্ধির সংগ্রাম পরিচালনা করে কমিউনিষ্ট পার্টিগুলো। পথ ও পদ্ধতি নিয়ে নানা বিতর্কের মধ্য দিয়ে তৈরী হয় নতুন সংগ্রামের কৌশল।

## পঞ্চম অধ্যায়

# দেশীয় রাজাদের সংগঠন ও প্রজাদের আন্দোলন

বৃটিশ শাসনের শেষ লগ্নে ভারতে ৬৮৪ টি ছোট বড় দেশীয় রাজ্য টিকে ছিল। বৃটিশ সরকার নিজেদের স্বার্থেই দেশীয় রাজ্য গুলোকে বাঁচিয়ে রেখেছিল । ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করার পর শক্তি সঞ্চয় করে ক্রমে ক্রমে বড় বড় রাজ্যগুলো দখল করে নেয়। দিল্লী দখলের পরও সারা ভারতে বহু দেশীয় রাজ্য ইংরেজ সরকারের বশ্যতা স্বীকার করে অস্তিত্ব রক্ষা করার চেষ্টা করেছে । কিন্তু নানা অজুহাতে একটি একটি করে দেশীয় রাজ্য গ্রাস করা শুরু হয়। বার্ষিক রাজস্ব অনাদায়ের দায়ে অথবা নিঃসন্তান রাজার মৃত্যুর পরে উওরাধিকার নির্বাচনের সুযোগ না দিয়ে এবং অনেক ক্ষেত্রে ইংরেজ সরকারের প্রতি আনুগত্যের অভাবের অভিযোগ তুলে বহু দেশীয় রাজ্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।আবার বহু জমিদারকে মোটা অংকের নজরানার বিনিময়ে রাজা উপাধি প্রদান করা হয়। তারাও দেশীয় করদ রাজ্যের মর্যাদা পেয়েছিল।

সারা ভারতে সাম্রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত করতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর প্রায় একশ বছর সময় লেগেছিল। সাম্রাজ্য স্থিতিশীল হবার পর একে একে সব কয়টি দেশীয় রাজ্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হয় ।

ঠিক এই সময় ভারতে সিপাহী বিদ্রোহ ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে বিরাট এক চ্যালেঞ্জ হিসাবে দেখা দেয়। রাজ্য হারা দেশীয় রাজা ও নবাবদের একটি বড় অংশ সিপাহী বিদ্রোহে মদত দিয়ে ইংরেজ বিতাড়নের লক্ষ্যে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করে । কিন্তু বৃটিশ সরকারের অনুগত দেশীয় রাজারা সৈন্য ও অর্থ দিয়ে সিপাহী বিদ্রোহ দমনে সাহায্য করে । নিষ্ঠুর দমননীতি চালিয়ে বিদ্রোহ দমন করা হয় । কিন্তু ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বিরুদ্ধে জনগণের অসন্তোষ বাড়তে থাকে। ফলে বৃটিশ পার্লামেন্ট ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে সরিয়ে সরাসরি বৃটিশ সরকারের অধীনে ভারত সাম্রাজ্যকে নিয়ে যায়। বৃটিশ সরকারের মানচিত্রে ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলো ভারত সাম্রাজ্যেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল । বৃটেনের রাণী ভিক্টোরিয়া ভারতেশ্বরী হয়ে এক ঘোষণায় দেশীয় রাজাদের আশ্বস্ত করে বলেন যে, যতদিন পর্যন্ত দেশীয় রাজারা বৃটিশ সরকারের আনুগত্য স্বীকার করবেন, ততদিন তাদের কোন বিপদ হবে না ।

এই ঘোষণার দুটি লক্ষ্য ছিল। প্রথমতঃ দেশীয় রাজ্যগুলো থেকে বার্ষিক নিয়মিত রাজস্ব নিশ্চিত করা। দ্বিতীয়ত ভারত সাম্রাজ্য রক্ষার ব্যাপারে দেশীয় রাজাদের সক্রিয়

সমর্থন ও সহযোগিতা লাভ করা । ভারতের গভর্নর জেনারেল সমস্ত দেশীয় রাজাদের ডেকে পরস্পরের মধ্যে পরিচয় বিনিময়ের ব্যবস্থা করেন। যুবরাজদের জন্য বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থাও করা হয়।

কর্ণেল মহিম চন্দ্রের 'দেশীয় রাজ্য' - গ্রন্থে বলা হয়েছে, বৃটিশ সরকার দেশীয় রাজ্যের যুবরাজদের জন্য যে বিজাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করেছিল তার দুটি লক্ষ্য ছিল। প্রথমত: বৃটিশের প্রতি স্থায়ী আনুগত্যের মানসিকতা গড়ে তোলা। দ্বিতীয়ত ভারতীয় সংস্কৃতির পরিবর্তে ইউরোপীয় সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত করে তোলা। তার ফলে পোশাক পরিচ্ছদে দেশীয় রাজারা মোগল সংস্কৃতি ত্যাগ করে ইউরোপীয় হয়ে উঠে। কিন্তু ইউরোপীয় সদ্‌গুণগুলির পরিবর্তে মন্দ গুণগুলিই বেশী করেই আয়ত্ত করে উচ্ছৃংখল জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়।এজন্যেই রবীন্দ্রনাথ যুবরাজদের এই বিশেষ শিক্ষার বিরোধী ছিলেন। কবির মতে প্রজাদের অর্থে রাজাদের বিলাসিতা অন্যায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে সব দেশীয় রাজারা ছিলেন বৃটিশ সরকারের বিশেষ শিক্ষায় শিক্ষিত।তারা আশা করেছিলেন বৃটিশের সাহায্যে স্বাধীন দেশীয় রাজ্যের অস্তিত্ব রক্ষা করা সম্ভব হবে। তাই দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের আন্দোলন দমনে তারা কঠোর মনোভাব নিয়েছিলেন।

দায়িত্বশীল সরকারের দাবীতে সব কয়টি দেশীয় রাজ্যে "প্রজামন্ডল" নামে যৌথ আন্দোলন মঞ্চের ডাকে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে উঠে। এসব মঞ্চে কংগ্রেস, সোসিয়ালিষ্ট ও কমিউনিষ্টরা নেতৃত্ব দেন ।

জাতীয় কংগ্রেস কৌশল হিসেবে আপোষ মূলক মনোভাব নিয়ে দেশীয় রাজাদের বৃটিশ প্রভাব মুক্ত করার জন্য দেশীয় রাজ্যে কংগ্রেসের নামে কোন আন্দোলন করা হবেনা বলে সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু অনেকগুলো রাজ্যে কেন্দ্রীয় নেতাদের নির্দেশ অমান্য করেই স্থানীয় কংগ্রেস অনুগামীরা কংগ্রেসদল গঠন করে আন্দোলন শুরু করেন । গান্ধীজী ও সর্দার প্যাটেল ঐসব রাজ্যে গিয়ে নেতাদের বুঝিয়ে আন্দোলন বন্ধ রাখার নির্দেশ দেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় দেশীয় রাজাদের কাছ থেকে বৃটিশ সরকার আশাতীত অর্থ ও সৈন্য সাহায্য পেয়েছিল । ফলে কর্তৃপক্ষের ধারণা হয়েছিল দেশীয় রাজ্যগুলির সমবায়ে একটি ফেডারেল স্টেট তৈরী করে ভারতের স্বাধীনতার পরেও বৃটিশ স্বার্থ রক্ষার একটি ক্ষেত্র প্রস্তুত করা যাবে । এই উদ্দেশ্যে সমস্ত দেশীয় রাজাদের সংগঠন **'চেম্বার অব প্রিন্সেস'** কে সক্রিয় ও মজবুত করার উদ্যোগ নেওয়া হয় । ত্রিপুরার মহারাজা

বীরবিক্রম মাণিক্য উত্তর পূর্বাঞ্চলের সভাপতি নির্বাচিত হন ।

মহারাজা বীরবিক্রম পার্বত্য চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, মণিপুর ও আসামের পার্বত্য অঞ্চলের সর্দারদের সঙ্গে কয়েকবার আলোচনা করেও ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টায় সাফল্য অর্জন করতে পারেননি। ফলে দারুণ হতাশায় মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়েন । কারণ দেশের পরিস্থিতি দ্রুত জটিল রূপ নিচ্ছিল । বিশ্বযুদ্ধে ক্লান্ত ও দুর্বল বৃটিশ সাম্রাজ্য পরিস্থিতির মোকাবেলায় ব্যর্থ হয়ে ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য তৈরী হচ্ছিল । ১৯৪৮ সালের জুন মাসে ভারতের স্বাধীনতা দেবার সিদ্ধান্ত করেছিল বৃটিশ সরকার। কিন্তু হঠাৎ নৌবিদ্রোহের ঘটনায় আতংকিত হয়ে এক বছর আগেই স্বাধীনতা দেবার কথা ঘোষণা করে । বৃটিশ রাজকর্মচারী ও শিল্পপতিরা দ্রুত তাদের যাবতীয় অর্থ সম্পদ নিয়ে দেশে ফিরে যেতে থাকে। দেশীয় রাজাদের শেষ আশা নির্বাপিত হয় ।

সারা দেশে মোট ৬৮৪ টি দেশীয় রাজ্যের মধ্যে মাত্র ৩০ টি রাজ্য ছিল এক একটি বৃটিশ জেলার সমান। ৪৫২ টি রাজ্যের প্রতিটিতে লোকসংখ্যা ছিল দশ লক্ষের ও কম। ২০২ টি রাজ্যের প্রত্যেকটির আয়তন ১০ বর্গমাইলেরও কম। সব মিলিয়ে মোট আয়তন ছিল ভারতের তিন ভাগের একভাগ। অনেক ছোট জমিদার মোটা অংকের নজরানা দিয়ে রাজা উপাধি ও দেশীয় রাজ্যের মর্যাদা পেয়েছিল।

তিন চারটি দেশীয় রাজ্য বাদে বাকী সবগুলি রাজ্যের ভৌগোলিক অবস্থান ভারতের অভ্যন্তরে চতুর্দ্দিকে ভারতের বিভিন্ন জেলার দ্বারা বেষ্টিত । বৃটিশ ভারতে যে কোন অঞ্চলে যাতায়াতে বাধা ছিলনা। কিন্তু স্বাধীন ভারত সরকারের সঙ্গে শত্রুতা করে অস্তিত্ব রক্ষা করা কারো পক্ষেই সম্ভব ছিলনা। এরকম অবস্থায় দেশীয় রাজারা কংগ্রেস সরকারের প্রধান মন্ত্রী জহললাল নেহেরুর কাছে প্রস্তাব দিয়েছিলেন, ভারত রাষ্ট্রের অধীনে স্বাধীন রাজ্যগুলোর অস্তিত্ব রক্ষার ব্যবস্থা করা হোক। দেশীয় রাজারা ভারতীয় সংবিধানের অনুরূপ দায়িত্বশীল সরকার গঠন করে প্রজাকল্যাণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এ বিষয়ে কংগ্রেস দলের মধ্যে নানা মত দেখা দেয়। শত শত বছর ধরে রাজাদের শাসনে দেশীয় রাজ্যের প্রজারা দারিদ্র্য ও অজ্ঞানতার অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই পায়নি। কাজেই রাজাদের শাসন অবসান করার পক্ষেই জোরালো যুক্তি প্রকাশ পায়।

এই পরিস্থিতিতে ১৮ই এপ্রিল ১৯৪৭ তারিখে সারা ভারত দেশীয় রাজ্য প্রজা সম্মেলনীর সভাপতি হিসেবে জহরলাল নেহেরু স্বাধীনতা লাভের চার মাস আগে ঘোষণা দেন, যেসব দেশীয় রাজ্য স্বাধীন ভারতের সাংবিধানিক সভায় যোগ দেবেনা তারা দেশের শত্রুরাষ্ট্র বলে গণ্য হবে এবং তার পরিণতির জন্য তারা দায়ী থাকবে।

এদিকে প্রতিটি দেশীয় রাজ্যে প্রজাদের আন্দোলন তীব্র রূপ নিতে থাকে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্যের রাজপ্রাসাদ ঘেরাও করে হাজার হাজার প্রজা ভারতে যোগদানের জন্য দাবী করতে থাকে। রাজপ্রাসাদে অবরুদ্ধ রাজাদের আবেদনে সাড়া দিয়ে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজাদের সঙ্গে আলোচনা করে প্রস্তাব দেন, ভারতে যোগ দিলে রাজাদের ধন, সম্পদ ও মর্যাদা রক্ষা করার দায়িত্ব ভারত সরকার নেবে। নতুবা বিদ্রোহী প্রজাদের হাতে নিগ্রহের জন্য ভারত সরকার দায়ী থাকবেনা।

কোন কোন রাজ্যে প্রজারা সশস্ত্র আন্দোলন শুরু করেছিল। ফলে কাশ্মীর, নিজামের হায়দরাবাদ এবং জুনাগড় বাদে বাকী সব দেশীয় রাজ্য ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণার দুদিন আগে ১৩ই আগষ্ট ১৯৪৭ তারিখে ভারতে যোগদানের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেয়। জুনাগড়ে প্রজারা বিদ্রোহ ঘোষণা করার পর নবাব সব ধনরত্ন নিয়ে সপরিবারে পাকিস্থানে পালিয়ে যান। নিজামের হায়দ্রাবাদে প্রজারা ঐক্যবদ্ধ সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করে। নিজাম রাজাকার বাহিনী দিয়ে জনগণের উপর আক্রমণ শুরু করে। কংগ্রেস সরকার বড় আকারের দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ার অশংকায় হস্তক্ষেপ করতে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। এই সময় সি.পি.আই ও বামপন্থী কংগ্রেস নেতারা যুক্তভাবে বিশাল জনতাকে সঙ্গে নিয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। তেলেঙ্গানায় রাজাকার বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষ করেই নিজামের প্রশাসনকে অচল করে দেওয়া হয়। নেহেরু নিজামের আবেদন মত একবছর সময় দিতে রাজী হন। কিন্তু নিজামের বাহিনী সুযোগ পেয়ে গ্রামে গ্রামে আক্রমণ শুরু করে। শত শত ঘরবাড়ী পুড়িয়ে দেওয়া হয়। লুটপাট চলতে থাকে। বিশ কোটি টাকা পাকিস্তানে সরিয়ে নেওয়া হয়। কমিউনিষ্ট নেতারা এই পরিস্থিতিব মোকাবেলা করার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামের ডাক দেয়। কংগ্রেস নেতারা বাধ্য হয়ে সামরিক বাহিনী পাঠিয়ে নিজামকে ভারতে যোগ দিতে বাধ্য করেন।

কাশ্মীরের রাজা দীর্ঘ দিন ধরে নানা অজুহাতে ভারতে যোগদানের সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধা প্রকাশ করে। শেখ আবদুল্লা পাকিস্তানে যোগ দেবার বিরোধীতা করেন, কিন্তু কাশ্মীরের জন্য বিশেষ অধিকার দাবী করেন। শেখ আবদুল্লার দাবী মেনে নিলে কাশ্মীরে কোন সমস্যাই দেখা দিতনা। গোটা কাশ্মীর ভারতের সংবিধানের আওতায় চলে আসতো। পাকিস্তানের দ্বারা আক্রান্ত হবার পর মহারাজা হরিসিং ভারতে যোগ দেবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করার পর ভারতীয় বাহিনী কাশ্মীরে প্রবেশ করে।

৬৮৪ টি দেশীয় রাজ্যের মধ্যে ত্রিপুরাও একটি। ত্রিপুরাকে যারা পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত করার ষড়যন্ত্র করেছিলেন তারা ত্রিপুরার প্রজাদের মানসিক অবস্থা বুঝতে পারেননি। এখানেও হাজার হাজার মানুষ ভারত ভুক্তির পক্ষেই সংগ্রামে অবতীর্ন

হয়েছিলেন। প্রজাদের স্বার্থ রক্ষার প্রয়োজনেই ভারতে যোগদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে মহারাজা বীরবিক্রম মাণিক্য প্রজাদের প্রতি কর্তব্য পালন করেছিলেন ।

কাশ্মীরসহ সব কয়টি দেশীয় রাজ্য ভারত রাষ্ট্রের অঙ্গীভূত হবার পর রাজতন্ত্রের অবসান ঘটেছে । প্রতিটি দেশীয় রাজ্য ভাষার ভিত্তিতে পার্শ্ববর্তী রাজ্যের জেলার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। বরোদা, বিকানীর, পাতিয়ালা, কোচিন, ভূপাল, মাইশোর ,বিজাপুব, হায়দ্রাবাদ, কোচবিহারের মত রাজ্যগুলো এক একটি জেলায় পরিণত হয়েছে । ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলো কয়েকটি মিলে জেলা হয়েছে। অথবা পার্শ্ববর্তী জেলায় যুক্ত হয়েছে। ত্রিপুরাকে আসাম রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত করার চেষ্টা হয়েছিল । রাজ্যের গণতান্ত্রিক আন্দোলন এবং সি.পি.আই দলের গৌরবময় সংগ্রামের ফলে তা সম্ভব হয়নি ক্ষুদ্র হলেও ত্রিপুরা পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা লাভ করেছে।

# ত্রিপুরার ভারত ভুক্তি

দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের আগে ১৯৩৮-৩৯ সালে ত্রিপুরায় প্রথম গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সূত্রপাতের সময় প্রধান দাবী ছিল, রাজার অধীনে দায়িত্বশীল সরকার চাই। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচার এবং নৌ বিদ্রোহের ফলে সারাভারত জুড়ে স্বাধীনতা আন্দোলনের চরম জোয়ার সৃষ্টি হবার পর দেশীয় রাজ্যগুলিতেও দাবী উঠে **প্রজার ভোটে সরকার চাই**। দুটি স্লোগানের পার্থক্য হলো রাজার অধীনে দায়িত্বশীয় সরকারের প্রতিনিধিরা সবাই নির্বাচিত নাও হতে পারেন। রাজার প্রস্তাবে মনোনীত সদস্য সংখ্যা প্রায় অর্দ্ধেক ছিল। কিন্তু প্রজার ভোটে সরকার দাবীর মধ্যে সকলেই হবে নির্বাচিত সদস্য। এই দাবীই ক্রমে ভারত ভুক্তির দাবীতে পরিণত হয়।

সমস্ত দেশীয় রাজ্যে প্রজাদের আন্দোলনের উপর নিপীড়ন শুরু হওয়ায় ১৯৪৭ সালের ১৮ই এপ্রিল দেশীয় রাজ্য প্রজাসন্মিলনীর সভাপতি জহরলাল নেহেরু চরম হুশিয়ারী দেন। সর্দার প্যাটেলও সব দেশীয় রাজাদের স্বার্থেই ভারত ভুক্তির প্রস্তাব দেন। এই প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে অধিকাংশ রাজ্যই ভারতরাষ্ট্রে যোগদানের সিদ্ধান্ত নেন । বিনিময়ে রাজপরিবারের সদস্যদের জন্য পেনসান ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দাবী করেন। কংগ্রেস সরকার দেশীয় রাজাদের দাবী মেনে নেন।

এরপর একমাসের মধ্যেই ত্রিপুরার মহারাজা বীরবিক্রমের অকাল মৃত্যু হয়। মৃত্যুর চারদিন আগে ১৯৪৭ সালের ১৩ই মে মহারাজা ত্রিপুরাকে ভারতের সঙ্গে যুক্ত করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। যুবরাজ কিরীট বিক্রম নাবালক অবস্থায় রাজ্যভার গ্রহণ করলেও নাবালক রাজার পক্ষে শাসন কার্য চালাবার জন্য রাজমাতা কাঞ্চনপ্রভাকে

সভাপতি করে একটি রিজেন্সী কাউন্সিল গঠন করার নির্দেশ দেন বৃটিশ সরকার। যুবরাজের অভিষেক হবার আগেই চার মাসের মধ্যেই বৃটিশ সরকার ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ১৫ই আগষ্ট ১৯৪৭ ভারত স্বাধীনতা লাভ করে। এর দুদিন আগে ১৩ই আগষ্ট রাজমাতা মহারাণী কাঞ্চন প্রভাদেবী প্রয়াত মহারাজার ইচ্ছা অনুযায়ী ত্রিপুরার ভারতে যুক্ত হবার সিদ্ধান্ত ভারত সরকারকে জানিয়ে দেন।

কিন্তু রাজ্যের অস্থির অবস্থার জন্য আনুষ্ঠানিক চুক্তি সম্পন্ন হয় দুই বছর পর ৯ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৯ সালে। চুক্তি কার্যকর হয় ১৫ই অক্টোবর ১৯৪৯ তারিখ থেকে। প্রকৃত পক্ষে ১৫ই আগষ্ট ১৯৪৭ থেকেই ত্রিপুরা রাজ্য স্বাধীন ভারত সরকারের নিযুক্ত দেওয়ানের নির্দেশে শাসিত হয়েছে। আনুষ্ঠানিক চুক্তির পর দেওয়ানী শাসনের পরিবর্তে চীপ কমিশনারের শাসন চালু হয়। ত্রিপুরার শেষ দেওয়ান রঞ্জিত কুমার রায় রাজ্যের প্রথম চীপ কমিশনার হন। ত্রিপুরা রাজ্য ভারতের গ-শ্রেণীর মর্যাদা লাভ করে। ত্রিপুরায় রাজতন্ত্রের অবসান ঘটে। ১৯৫০ সালের ২৬ শে জানুয়ারী প্রজাতান্ত্রিক ভারতের অঙ্গরূপে ত্রিপুরায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন সারা রাজ্যে উৎসবের রূপ নেয়।

ত্রিপুরার ভারতভুক্তির প্রস্তুতি পর্বে রাজপরিবারের একটি অংশের সহযোগিতায় মুসলিম লীগ পন্থী গেঁদু মিয়ার নেতৃত্বে ত্রিপুরার পাকিস্তান ভুক্তির দাবীতে এক ষড়যন্ত্র হয়। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দপ্তর জানতে পারে পূর্ব পাকিস্তান থেকে একদল মুসলিম লীগপন্থী সশস্ত্র সেচ্ছাসেবী দল ত্রিপুরা আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। খবর পাওয়া মাত্র কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী সর্দার প্যাটেল আসাম থেকে সেনাদল পাঠাবার নির্দেশ দেন। পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য আগরতলায় ও একদল সশস্ত্র যুবক প্রস্তুতি নেয়। অবস্থা ক্রমশ আয়ত্তে আসে।

ত্রিপুরা পাকিস্তানে যোগ দিলে হিন্দু উদ্বাস্তু আগমন বন্ধ হত এবং যারা এসেছিল তারাও ভারতের অন্য কোন রাজ্যে সরে যেত। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যে প্রবল গতিতে মুসলিমদের পুনর্বাসন দেওয়া হতো। হিন্দু উপজাতিরাও রাজ্য ত্যাগ করতে বাধ্য হত। পাকিস্তান পন্থীদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হওয়ায় পার্বত্য হিন্দু প্রজারা নিশ্চিন্ত হল। পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের অবস্থা লক্ষ্য করলেই পরিস্থিতির সঠিক মূল্যায়ন করা যাবে।

## দেশ বিভাগের পরিণতি

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট দেশ বিভাগের ফলে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হল। ধর্মের নামে দেশ বিভাগের ফলে দেশে শান্তি ও সম্প্রীতি

প্রতিষ্ঠিত হবে বলে যারা আশা করেছিলেন, তাদের ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়েছে।

দেশ বিভাগের পরিণতিতে প্রায় দশ লক্ষ নিরীহ মানুষ প্রাণ হারালো। কয়েব কোটি মানুষ বাস্তু হারালো। স্বাধীনতার পরে ধর্মীয় উন্মাদনা আরও বৃদ্ধি পেল। দুটি নতুন রাষ্ট্রে উদ্বাস্তু সমস্যা তীব্র আকার নিল। স্বাধীনতার বলি নিঃস্ব সর্বহারা মানুষেরা আশ্রয়ের সন্ধানে পাগলের মতো এরাজ্যে বা সে রাজ্যে ঘুরাঘুরি করতে লাগলো। উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের দায়িত্ব জরুরী ভিত্তিতে গ্রহণ করার কর্তব্য নেতাদের মধ্যে দেখা গেল না। অনাহারে ও মহামারীতে বহু উদ্বাস্তু পরিবার ধ্বংস হয়ে গেল। পুনর্বাসনের দাবীতে সর্বত্র তীব্র আন্দোলন শুরু হয়ে গেল। যারা আন্দোলনে গেল তারা সব রকম সাহায্য থেকে বঞ্চিত হতে লাগলো। কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন মানে কংগ্রেস বিরোধীতা বলে গণ্য হলো। এই দৃষ্টি ভঙ্গীর ফলে উদ্বাস্তু আন্দোলন ক্রমেই কংগ্রেস বিরোধী আন্দোলনের রূপ নিল। বিরোধী দল গুলো শক্তিশালী হতে লাগল। ভারতীয় রাজনীতিতে বিরোধী দলগুলো নতুন একটি ধারার জন্ম দিল। ফলে জাতীয় রাজনীতির মূল ধারা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে নতুন নতুন রাজনৈতিক স্রোত সৃষ্টি হল।

ভারত ধর্ম নিরপেক্ষ প্রজাতান্ত্রিক সংবিধান রচনা করল। কিন্তু পাকিস্তান শরিয়তি ইসলামিক রাষ্ট্র গঠনের ঘোষণা দিল। ফলে পাশাপাশি দুই রাষ্ট্রের ভ্রাতৃত্বমূলক সম্পর্ক রইল না। পাকিস্তানে মৌলবাদীরা শক্তিশালী হল, ভারতে মৌলবাদীরা নিষ্ক্রিয় হয়ে রইল।

জাতীয় অর্থনীতি বিপর্যস্ত হল। পশ্চিম বাংলার পাটশিল্পের কাঁচামাল উৎপাদনকারী অঞ্চল পূর্ব বাংলা পৃথক রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ায় পাটশিল্প অচল হয়ে গেল। বোম্বাইয়ের বস্ত্রশিল্পের কাঁচামাল কার্পাস উৎপাদন কেন্দ্র পাকিস্তানে চলে গেল। এমনিভাবে শিল্প কাঠামোতে বিপর্যয় দেখা দিল। দেশের অস্থির অবস্থা দেখে বিদেশী শিল্পপতিরা অধিকাংশ শিল্প গুটিয়ে নিল।

ত্রিপুরায় একদিকে উদ্বাস্তুদের ভীড়, অন্যদিকে জুমিয়াদের সমস্যা তীব্র সংকট রূপে দেখা দিল। সীমান্ত বন্ধ হয়ে যাবার পর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ত্রিপুরায় খাদ্য ও নিত্য প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিষ পত্রের অভাব দেখা দিল। রাজ্যের রাজন্যযুগের প্রশাসন নতুন পরিস্থিতির মোকাবিলায় সক্ষম ছিল না। নতুন প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার মত শিক্ষিত ও দক্ষ কর্মীর বড় অভাব ছিল। ত্রিপুরায় আগত উদ্বাস্তুদের মধ্যে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা খুব বেশী ছিল না। অন্য রাজ্য থেকে দক্ষ কর্মচারীরা ত্রিপুরার মত পশ্চাদপদ রাজ্যে আসতে রাজী ছিল না। বিশেষ ভাতা দিয়েও দক্ষ কর্মচারী পাওয়া যাচ্ছিল না।

রাজ্যের সর্বত্র যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য শ্রমিক পাওয়া যাচ্ছিল না। উদ্বাস্তু ও জুমিয়ারা শ্রমিকের কাজে মোটেই আগ্রহী ছিল না। কাজেই জরুরী ভিত্তিতে

রাস্তাঘাট গড়ে তোলাও সম্ভব ছিল না। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও প্রশাসন কোন ক্ষেত্রেই প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো ছিল না। উদ্বাস্তুদের আশ্রয়ের জন্য শিবির করার মত কোন পরিকাঠামো ছিল না। আগরতলা ও বিভাগীয় শহরে কয়েকটি মাত্র স্কুল ঘর উদ্বাস্তুদের আশ্রয় দেবার পক্ষে খুব সামান্য আয়তনের সংস্থান করতে পেরেছে। রাস্তা ঘাটে অফিসের বারান্দায় মানুষের ঢল নেমেছিল। অফিসঘরের সংখ্যাও ছিল নগণ্য। জনবসতি বলতে হাতে গুনা কিছু পরিবার। পুনর্বাসন দপ্তর গড়ে উঠার পর উদ্বাস্তুদের মধ্য থেকে কর্মী সংগ্রহ করে ছন বাঁশের লম্বা হল ঘর তৈরী করে একশ জনের জায়গায় পাঁচশ জনকে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে। পানীয় জলের ও ব্যবস্থা ছিল না। ফলে অল্প দিনের মধ্যে বহু শিবিরে কলেরা রোগের আক্রমণে হাজার হাজার উদ্বাস্তু মারা গেছে। চিকিৎসার সুযোগও ছিল না। বহু পরিবার নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। নিয়মিত সাহায্য না পেয়ে বহু নিঃস্ব পরিবার অনাহারেও প্রাণ দিয়েছে। দায়িত্ব নিয়ে কাজ করার মত কোন রাজনৈতিকদলের সংগঠন ও ছিলনা। সেবামূলক মনোভাব নিয়ে বহু যুবক, যুবতী, ছাত্র - ছাত্রী এগিয়ে এসেছিল। পুনর্বাসনের কাজে অনিয়ম এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন গড়ে উঠে ছিল। কিন্তু কংগ্রেস দল এই আন্দোলনকে ভিন্ন পথে ঠেলে দিয়েছে। উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানের জন্য কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন দপ্তর খোলা হয়েছে। সেখানেও পাঞ্জাবের উদ্বাস্তুদের জন্য একরকম নীতি এবং বাঙ্গালী উদ্বাস্তুদের জন্য ভিন্ন রকম নীতি তৈরী হয়েছে। ফলে বাঙ্গালী উদ্বাস্তুদের মধ্যে কেন্দ্র বিরোধী ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে।

ত্রিপুরার কংগ্রেস নেতাদের প্রশাসনে উদার দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব ছিল। কেন্দ্র থেকে পুনর্বাসনের জন্য যে সাহায্য আসতো তা প্রয়োজনের তুলনায় কম ছিল। কিন্তু এই বরাদ্দ অর্থ থেকেও খরচ কম করে কিছু অর্থ ফেরত পাঠানোর নিয়মিত ঘটনা থেকে মনে হয়, কংগ্রেস নেতারা ভারতের রাজকোষকে কংগ্রেস দলের রাজকোষ বলে ভাবতে অভ্যস্ত হয়েছিলেন। ফলে খরচ যত কম করা যায় ততই দেশের মঙ্গল বলে বিবেচনা করতেন। এই মানসিকতা জনগণ থেকে কংগ্রেসকে ক্রমশ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে।

অন্যদিকে সি.পি.আই সহ বিরোধী দলগুলো গঠনমূলক পরিকল্পনা গ্রহণের চেয়ে সমালোচনামূলক আন্দোলন গড়ে তুলতে বেশী আগ্রহী হওয়ায় পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে সেবামূলক মনোভাব নিয়ে মানবিক বোধ সম্পন্ন ঐক্যবদ্ধ পুনর্বাসন প্রয়াস গড়ে উঠেনি। সংকীর্ণ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য উদ্বাস্তু আন্দোলনে বিভিন্ন ধারার সৃষ্টি হয়েছিল।

রাজন্য যুগের শেষ লগ্নে মহারাজা বীরবিক্রম রাজ্যের উপজাতি প্রজাদের ভবিষ্যত নিয়ে ভীষণ ভাবনায় পড়েছিলেন। জুমিয়া প্রজাদের সমতল চাষে আগ্রহী করার জন্য

নানাভাবে উৎসাহ দিয়েছেন । কিন্তু সরল প্রাণ উপজাতিরা মহারাজার নির্দেশ ও উপদেশের গুরুত্ব বুঝতে পারেনি। কোন রাজনৈতিক সংগঠনও ছিলনা, যাতে ভবিষ্যত সম্পর্কে তাদের সচেতন করে তোলা যায় । মহারাজা ত্রিপুরী সম্প্রদায়ের বিভিন্ন গোষ্ঠীর জন্য বিশাল অঞ্চল সংরক্ষিত করে ভবিষ্যতে জুমিয়াদের পুনর্বাসনের একটা রক্ষা কবচ সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু মহারাজা কেন সমস্ত উপজাতিদের পুনর্বাসনের কথা ভাবেন নি এর কোন ব্যাখ্যা বা কারণ জানা যায়নি। পরবর্তী সময়ে সংরক্ষিত অঞ্চলের কিছু অংশ উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জন্য সংরক্ষন মুক্ত করা হয়েছিল । এজন্য উপজাতি সমাজ খুবই ক্ষুব্ধ হয়েছে ।

উদ্বাস্তু ও জুমিয়া পুনর্বাসনের দাবীতে শেষ পর্যন্ত সি.পি.আই সারা রাজ্যে এক বলিষ্ঠ আন্দোলন গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। রাজ্যের দুই জন এম.পি পার্লামেন্টে জোরালো যুক্তি ও তথ্য দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে রাজ্যের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে বাধ্য করতে পেরেছিলেন ।এই কৃতিত্বের জন্য সি.পি.আই গৌরব দাবী করতেই পারে।

দেশ বিভাগ আরও নানা জটিল সমস্যার সৃষ্টি করেছে। ফলে প্রশ্ন উঠেছে দেশ বিভাগ কি অনিবার্য ছিল ?

লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন যিনি ভারত বিভাগের মূল নায়ক তিনি নিজের ডায়েরীতে মন্তব্য করেছেন- "ভারত বিভাগ হল মস্ত একটা পাগলামী। একদিন না একদিন ভারতের নেতারা এই সিদ্ধান্তের জন্য গভীর ভাবে অনুতপ্ত হবেন। সেদিন বৃটিশ সরকারকে যাতে দায়ী করা না যায় সরকার সেভাবেই পরিকল্পনা গ্রহণ করবে। মাউন্ট ব্যাটেন আরো লিখেছেন, "দেশ ভাগের প্রস্তাব নিয়ে জিন্নার সঙ্গে দেখা করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি খুব রেগে গিয়েছিলেন। কারণ জিন্না চেয়েছিলেন অখন্ড ভারতে মুসলিমদের জন্য রক্ষাকবচ । দেশ ভাগের প্রস্তাবে গান্ধীজী নীরবতা অবলম্বন করেন। জহরলাল দ্বিধাগ্রস্ত হন, কিন্তু সর্দার প্যাটেল খুব উৎসাহ প্রকাশ করেন। পরে অবশ্য জিন্না মত বদল করেন।"

দীর্ঘদিন যাবত এদেশে গবেষকরা এবং রাজনীতিবিদরা দেশ ভাগের জন্য শুধু বৃটিশ সরকারের ডিভাইড এন্ড রুল পলিসিকেই দায়ী করেছেন।

কিন্তু বৃটিশ সরকার তৎকালীন যাবতীয় গোপন দলিলপত্র চিঠি টেলিগ্রাম ও প্রস্তাব লন্ডনের বৃটিশ মহাফেজখানায় জনগণের জন্য খুলে দেবার পর নিঃসন্দেহে জানা গেল ভারত বিভাগ অনিবার্য ছিল না।

দেশ ভাগের জন্য দায়ী বৃটিশ স্বার্থ রক্ষার নীতি, এবং দেশের তিনটি প্রধান

রাজনৈতিকদল কংগ্রেস-মুসলিম লীগ ও কমিউনিষ্ট নেতাদের নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গী।

মুসলিম লীগ লড়াই করেছে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে, কংগ্রেস লড়াই করেছে বৃটিশের বিরুদ্ধে -কমিউনিষ্টরা লড়াই করেছে সকলের বিরুদ্ধে। অখন্ড ভারতের স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের কথা কেউ ভাবেনি।

স্বাধীনতা আন্দোলনে কংগ্রেসের ভূমিকা মুসলমানদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা বোধ জাগিয়ে তুলেছিল। ১৯২১ সাল পর্যন্ত জিন্না ছিলেন কংগ্রেসের প্রথম সারির নেতা এবং হিন্দু মুসলমান ঐক্যের প্রবক্তা। ইউরোপীয় শিক্ষায় উচ্চ শিক্ষিত ব্যারিষ্টার জিন্না ধর্ম নিরপেক্ষ গণতন্ত্রের গোঁড়া সমর্থক ছিলেন। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস দলের বহু মুসলিম সদস্য নির্বাচনে জয়ী হবার পর মন্ত্রী সভায় স্থান না পেয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে কংগ্রেস ত্যাগ করেন।

হিন্দুরা কোন সময়েই দেশ বিভাগের পক্ষে ছিলনা। দেশের অধিকাংশ মুসলমানও দেশ বিভাগের বিরোধী ছিলেন। তবে স্বাধীন ভারতে মুসলমানদের জন্য একটা রক্ষাকবচের দাবী অনেকেই সমর্থন করেছেন।

কংগ্রেস নেতা আবুল কালাম আজাদ আত্মজীবনী গ্রন্থে বলেছেন, মুসলমানদের জন্য সাংবিধানিক রক্ষা কবচের ব্যবস্থা থাকলে দেশ বিভাগের দাবী উঠতনা। মহাত্মা গান্ধী এরূপ একটা ব্যবস্থা রাখার পক্ষপাতি ছিলেন। কিন্তু কংগ্রেসের অধিকাংশ নেতা এরূপ ব্যবস্থার তীব্র বিরোধীতা করেছেন।

ভারতের অধিকাংশ মুসলমান ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে বিপুলভাবে ভোট দিয়ে কংগ্রেস প্রার্থীদের জয়ী করেছেন। মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ঠ পাঞ্জাবে মুসলিম লীগ মাত্র ২টি আসন পেয়েছিল। তেমনি বাংলায় ২৫০টি আসনের মধ্যে লীগ পেয়েছিল মাত্র ৩৯ টি আসন। বিহার, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে, মুসলিম লীগ একটিও আসন পায়নি। সিন্ধু প্রদেশে মাত্র ১টি আসন পেয়েছিল লীগ। অন্যান্য প্রদেশেও নির্বাচনে মুসলিম লীগের ভরাডুবি হয়েছিল। ফলে হতাশাগ্রস্ত লীগ নেতারা পাকিস্তানের দাবী উত্থাপন করা থেকে সাময়িক ভাবে বিরত ছিলেন।

বাংলায় ফজলুল হক কৃষক প্রজা পার্টি গঠন করে মুসলিম লীগের পালের হাওয়া কেড়ে নিয়েছিলেন। তিনি বার বার চেষ্টা করেছেন কংগ্রেসের সঙ্গে কোয়ালিশন সরকার গড়ে মুসলিম লীগকে ক্ষমতা থেকে দূরে রাখতে। কিন্তু কংগ্রেস কোয়ালিশনে রাজী না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত হকসাহেব লীগের সঙ্গে কোয়ালিশন করতে বাধ্য হন। ক্ষমতায় বসে লীগ নেতারা সাম্প্রদায়িকতার ঝড় তুলে হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা সৃষ্টির পথ প্রশস্ত করেন।

লীগ ক্ষমতায় না থেকে কংগ্রেস ও কৃষক প্রজা পার্টির কোয়ালিশন সরকার থাকলে বাংলায় ভয়াবহ দাঙ্গা সৃষ্টি করা সম্ভব হতনা। ১৯৪৬ সালে লীগ সরকারের মদতে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাকে ভয়াবহ দাঙ্গায় কলকাতার রাস্তা ঘাট রক্তের নদীতে ভেসে যায়। হিন্দুরা মোটেই দাঙ্গার জন্য তৈরী ছিলনা। এর পর নোয়াখালীতে আরও ভয়াবহ দাঙ্গা হয়। কলকাতা ও নোয়াখালির দাঙ্গার প্রতিক্রিয়ায় বিহারে বড় আকারে দাঙ্গা দেখা দেয়।

এসব সত্ত্বেও দেশ বিভাগের পরে বাংলা ও বিহার সহ ভারতের কোন প্রদেশ থেকেই মুসলমানরা বড় আকারে দেশ ত্যাগ করে যায়নি। একমাত্র পাঞ্জাবেই লোক বিনিময় হয়েছিল। ভারতের অধিকাংশ মুসলমান দেশ বিভাগের বিরুদ্ধে ছিল এটাও তার বড় প্রমাণ। রাজনৈতিক দল হিসেবে মুসলিম লীগ অল্প দিনের মধ্যেই পূর্ব বাংলায় মুছে গিয়েছিল।

কংগ্রেস দল গঠিত হয়েছিল জমিদার, শিল্পপতি, বণিক ও আইনজীবীদের উদ্যোগে। মুসলিম লীগ তৈরী হয়েছিল মুসলিম জমিদার, প্রাক্তন নবাব ও মুসলিম শিল্পপতিদের উদ্যোগে। ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত এই দুই দলের কর্ম সূচীতে কৃষক ও শ্রমিক স্বার্থে একটি দাবীও ছিল না। গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেস এবং জিন্নার নেতৃত্বে মুসলিম লীগ নতুন জীবন পেয়েছিল। মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজ আন্দোলনে এগিয়ে এসেছিল। কংগ্রেসের মঞ্চে থেকেই সি.পি.আই কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র ও মহিলাদের সংগঠিত করেছিল। এই সংগঠনগুলিই স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রকৃত সংগ্রামী শক্তি হয়ে উঠেছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ প্রায় দেউলিয়া অবস্থায় পৌঁছেছিল। ভারতীয় সামরিক বাহিনীর লোকেরা সামরিক পোষাক পড়েই আজাদ হিন্দ বাহিনীর সেনা ও অফিসারদের বিচারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সভা ও মিছিলে যোগ দিতে থাকায় বৃটিশ সরকার উদ্বিগ্ন হয়ে, বৃটিশ স্বার্থ রক্ষা করে ভারতের স্বাধীনতা দেবার সিদ্ধান্ত নেয়।

সে সময় বৃটিশের প্রধান স্বার্থ ছিল উপসাগরীয় অঞ্চলের তেলের উপর অধিকার রক্ষা করা। বৃটিশ সরকার আশংকা করেছিল সোভিয়েত বাহিনী উপসাগরীয় তেলক্ষেত্র থেকে বৃটিশ অধিকার উৎখাত করার জন্য উদ্যোগী হবে। এরূপ পরিস্থিতি দেখা দিলে ভারতের সাহায্য ছাড়া বৃটিশ সরকারের শেষ শক্তির উৎস উপসাগরীয় তেলক্ষেত্রের অধিকার রক্ষা করা সম্ভব হবেনা। তাই লর্ড ওয়াভেল কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে বার বার দেখা করে এবিষয়ে স্বাধীন ভারত সরকারের সাহায্য করার নিশ্চিত আশ্বাস দাবী করেন। কংগ্রেস নেতারা কোন আশ্বাস না দেওয়ায় জিন্নার সঙ্গে বৈঠকে বসেন। জিন্না তৎক্ষনাৎ রাজী হয়ে যান। ফলে লর্ড ওয়াবেল বৃটিশ স্বার্থ রক্ষার প্রয়োজনে দেশ বিভাগের প্রস্তাব

পাঠান। কিন্তু বৃটিশ সরকারের অধিকাংশ সামরিক বিশেষজ্ঞের মত ছিল খন্ডিত ভারতের সাহায্যে সোভিয়েত শক্তিকে প্রতিরোধ করা সম্ভব হবেনা। অখন্ড ভারতের সহযোগিতা লাভের একটা উপায় করতে হবে। বৃটিশ শ্রমিকদলের সরকার কেবিনেট মিশন পাঠিয়ে কংগ্রেস ও লীগের একটা অন্তর্বর্তী কোয়ালিশন সরকার গঠনের প্রস্তাব দেয়। ১৪ জনের মন্ত্রীসভায় একজন শিখ ও একজন পার্শি প্রতিনিধি রাখার প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু কংগ্রেস এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় কেবিনেট মিশন ১৯৪৬ সালের জুন মাসের শেষ দিকে ভারত ত্যাগ করে। কেবিনেট মিশনের প্রস্তাবে পাকিস্তানের দাবীকে অযৌক্তিক বলে বর্ণনা করা হয়েছিল। তবে মুসলমানদের জন্য কিছু রক্ষাকবচের সংস্থান রাখা যুক্তিযুক্ত বলে বিবেচিত হয়েছিল। এই প্রস্তাব কার্যকর করার দাবীতেই ১৬ই আগষ্ট ১৯৪৭ তারিখে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দিয়েছিল মুসলিমলীগ। সংগ্রামের নামে ভয়াবহ দাঙ্গা সৃষ্টি করে দেশ বিভাগের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানের দাবী আদায় করে নেয়।

একমাত্র গান্ধীজী ছাড়া কংগ্রেসের সব নেতাই দেশ বিভাগের মাধ্যমে দ্রুত স্বাধীনতা লাভের জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছিলেন। গান্ধীজী কোন দিনই কংগ্রেসের সদস্য পদ নেননি। কংগ্রেসের সদস্য না হয়েও কংগ্রেস দল পরিচালনার সব দায়িত্ব বহন করেছেন। শেষ মুহূর্তে কংগ্রেস নেতারা গান্ধীজীর মতামতের কোন গুরুত্বই দিলেন না। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো গান্ধীজী একটা প্রতিবাদও করলেননা। একটা আন্দোলনের ডাক দিলেই ভারত বিভাগ বন্ধ করে দিতে পারতেন। তিনি কেন এরূপ ভূমিকা নিলেন তার সঠিক উত্তর কারো জানা নেই।

সি.পি.আই দল কেন ভারত বিভাগ মেনে নিয়েছিল তারও কোন সদুত্তর কেউ দিতে পারেন নি। বাস্তব পরিস্থিতির মূল্যায়নে নেতাদের ব্যর্থতাই এর জন্য দায়ী।

## ষষ্ঠ অধ্যায়

# ত্রিপুরার প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য

মানব সমাজের ইতিহাস রচনায় প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে গণ্য হয়। ত্রিপুরায় প্রাচীন কালের জনবসতির সূত্রপাতের কোন নিদর্শন আজও আবিষ্কৃত হয়নি। বিভিন্ন যাযাবর গোষ্ঠীর মানুষেরা কোথাও স্থায়ী বসতি গড়ে তুলেনি। আদিম পশু শিকারী মানব গোষ্ঠীগুলোর পাথরের যন্ত্রপাতি ব্যবহারের কোনও নিদর্শণও পাওয়া যায়নি।

গোমতী-মনু-তীর্থমুখ-উনকোটি ইত্যাদি নামের উৎপত্তি কি ভাবে হয়েছিল তাও জানা নেই। আর্য উপজাতি গোষ্ঠীর কোনও শাখা প্রাচীন কালে এই অঞ্চলে বসতি স্থাপনের উদ্দেশ্যে এসেছিল বলে অনেকে অনুমান করেন। কিন্তু তারও কোন প্রমাণ নেই।

বিংশ শতাব্দীর গবেষকরা ত্রিপুরার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শণ আবিষ্কার, অনুসন্ধান, বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নে সচেষ্ট হয়েছেন। ঊনকোটি, দেবতা মুড়া ও পিলাকের নিদর্শনগুলো মাণিক্য রাজাদের পূর্ববর্তী বিভিন্ন রাজবংশের হিন্দু ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির মিশ্র নিদর্শন রূপে গবেষকরা চিহ্নিত করেছেন। মাণিক্য রাজাদের ঐতিহাসিক যুগের নিদর্শনগুলোর কিছু ধ্বংসাবশেষ ও কিছু মন্দির, প্রাচীন রাজধানী উদয়পুর ও পরবর্তী রাজধানী পুরাতন আগরতলা ও আধুনিক যুগের রাজধানী আগরতলায় চিহ্নিত হয়েছে। অন্যান্য অঞ্চলে রাজাদের সাময়িক অবস্থানের স্মৃতি চিহ্ন গুলোও চিহ্নিত হয়েছে।

এসব নিদর্শন থেকে ত্রিপুরার রাজাদের মধ্যযুগীয় ইতিহাস এবং আধুনিক যুগের ইতিহাস প্রামাণ্য ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মন্দিরের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে শিলালিপি, দীঘি উৎসর্গ ও ব্রাহ্মণদের ভূমিদান পত্র হিসেবে তাম্রলিপি রাজাদের অভিষেক, যুদ্ধজয় ও তীর্থযাত্রা উপলক্ষে প্রচারিত মুদ্রা ত্রিপুরার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের অমূল্য সম্পদ হয়ে উঠেছে।

আমরা এখানে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শনের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব।

## ঊনকোটি

উত্তর ত্রিপুরায় কৈলাসহরের নিকটবর্তী ঊনকোটি পাহাড় ত্রিপুরার প্রাচীন তীর্থভূমি। এখানে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, গৌরী, গনেশ, হনুমান মূর্তি বিভিন্ন আকারে বিভিন্ন শিল্পীর স্বাক্ষর বহন করছে। ঊনকোটি ত্রিপুরার শিবতীর্থরূপে পরিচিত। এখানে দুই ধারার মূর্তি

রয়েছে। ১) পর্বত গাত্রে খোদিত মূর্তি এবং ২) পৃথক পৃথক পাথরের মূর্তি।



ঊনকোটির শিব

পাহাড়ের গায়ে শিব ও পার্বতীর বিশাল মূর্তি খোদিত রয়েছে। ত্রিনয়ন বিশিষ্ট মহাদেবের মূর্তিটি সবচেয়ে বড়। পাশের পাহাড়ে একটু উপরে ধনুর্বান ধারী শিকারী শিবের মূর্তি রয়েছে। শিকারজীবী উপজাতি গোষ্ঠীর অর্থাৎ কিরাত গোষ্ঠীর আদি দেবতা মহাদেব।

পৃথক পৃথক পাথরের মূর্তিগুলোর মধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, উমা, মহেশ্বর, নরসিংহ, গনেশ ও হনুমানের মূর্তি গুলোকে ত্রিপুরার বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক বিজয়কুমার দেববর্মন পালযুগের শিল্পকলার সাক্ষী বলে বর্ণনা করেছেন। এবং তিন মুখবিশিষ্ট মহাদেবের একটি মূর্তিকে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় এর দেবতা রূপে গুপ্তযুগের শিল্প নির্দশন বলে উল্লেখ করেছেন।

পর্বত গাত্রে খোদিত বিশাল শিবের মুখাবয়বটিকে কালভৈরব তথা মহাকালের দেবতা শিবের প্রতীক বলে বর্ণনা করা হয়। মূর্তিটি ৩০ ফুট দীর্ঘ। প্রতিবেশী রাজ্য আসামের ভুবন পাহাড় ও সূর্য পাহাড়ের প্রত্নরীতির সঙ্গে অনেকক্ষেত্রে মিল দেখা যায়।

ত্রিপুরার রাজারা মূলত শৈবধর্মী ছিলেন। মহারাজা রাজধর মাণিক্যের সময় মণিপুরী রাজকন্যা রাণী হয়ে আসার পর থেকে রাজ পরিবারে বৈষ্ণব ধর্মের বিশেষ প্রভাব পড়েছে।

সামগ্রিক বিচারে ঊনকোটির প্রত্নতত্ত্বে প্রাচীন যুগের তান্ত্রিক সাধনার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। গবেষকদের মতে অষ্টম শতাব্দী থেকে ঊনকোটি তীর্থভূমি রূপে গড়ে উঠেছে। তান্ত্রিকরা গভীর অরণ্যে সাধনাস্থল নির্বাচন করত। তখন ঊনকোটি পাহাড় গভীর অরণ্যাঞ্চল ছিল। উপযুক্ত পদক্ষেপ নিলে ঊনকোটি ত্রিপুরায় একটি আকর্ষনীয় পর্যটন কেন্দ্র হয়ে উঠতে পারে।

## দেবতামুড়া

দক্ষিণ ত্রিপুরায় উদয়পুর ও অমরপুরের মাঝামাঝি অঞ্চলে গোমতী নদীর তীরে বড়মুড়া পাহাড়ের অংশটি দেবতা মুড়া নামে পরিচিত হয়েছে। পাহাড়ের গায়ে সারিবদ্ধভাবে খোদিত মহিষাসুরমর্দ্দিনী-কার্তিক-গনেশ- নটরাজ ও শিব মূর্তিগুলো বাংলার পাল যুগীয়

ভাস্কর্যের নিদর্শন বলে প্রত্নতাত্ত্বিক বিজয় কুমার দেববর্মা অভিমত দিয়েছেন। দশভুজা মূর্তিতে ত্রিপুরী রমনীর পোষাক পরিচ্ছদ দেখে মনে হয় ত্রিপুরার কোন শিল্পীর হাত রয়েছে এর নির্মাণ কার্যে। মহিষাসুর মূর্তিটি প্রায় ৪৫ ফুট দীর্ঘ।

## পিলাকের প্রত্নতত্ত্ব

দক্ষিণ ত্রিপুরার বিলনীয়া বিভাগের জোলাইবাড়ী অঞ্চলে অবস্থিত পিলাকের বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রচুর বুদ্ধ মূর্তি ও বিভিন্ন হিন্দু দেব দেবীর মূর্তি পাওয়া গেছে। এখানে বিশাল আকারের অবলোকিতেশ্বর মূর্তিটি নবম শতাব্দীর বলে মনে করা হচ্ছে। ঠাকুরানী টিলায় একটি সূর্য মূর্তি এবং মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ এবং বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। এছাড়াও বলির পাথর, সাগরঢেপা, আশ্রমটিলা ও বাসুদেব বাড়ীতে প্রাচীন প্রত্নতত্ত্বের নিদর্শন পাওয়া গেছে। পোড়া মাটির শীল, মোহর, মাটির মূর্তি ও ফলক আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলির সঙ্গে ময়নামতি অঞ্চলের মূর্তি ও ফলকের মিল রয়েছে। পিলাকে কয়েকটি ব্রোঞ্জ মূর্তি এবং কিছু স্বর্ণমুদ্রাও আবিষ্কৃত হয়েছে।



এসব নিদর্শন থেকে প্রমাণ হয় যে পিলাক একসময় বৌদ্ধ তান্ত্রিক সাধনার কেন্দ্র ছিল। এখানে দুষ্প্রাপ্য বৌদ্ধ শাস্ত্রে উল্লেখিত চুন্দাদেবীর মূর্তিও পাওয়া গেছে। নালন্দায় এরূপ মূর্তি কয়েকটি মাত্র পাওয়া গেছে। পিলাকের মূর্তিটি ভারতে প্রাপ্ত একমাত্র অষ্টাদশ ভুজা চুন্দামূর্তি। দেবী চুন্দা মহামায়া শক্তিরই এক বিশেষ রূপ। হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের সমন্বয়ের প্রতীক।

প্রত্নতত্ত্বের বিচারে পিলাকের চুন্দা মূর্তিটি ত্রিপুরার প্রাচীনতম মূর্তি। সম্ভবত সপ্তম শতাব্দীতে মূর্তিটি তৈরী হয়েছিল। পিলাকের এই সংস্কৃতি সমতটের দুই বৌদ্ধ রাজবংশ দেববংশীয় ও চন্দ্র বংশীয়দের সময়কালের বলে চিহ্নিত হয়েছে। চন্দ্র বংশীয় রাজারা হিন্দু বর্মন বংশীয় রাজাদের দ্বারা উৎখাত হয়েছিল। কাজেই বৌদ্ধ ও হিন্দু সংস্কৃতির মিশ্রণ ঘটেছে। ঐ সময় বাংলায় পালবংশীয় রাজাদের সংস্কৃতির প্রভাব এবং প্রাধান্য ছিল। পিলাকও ত্রিপুরায় একটি গুরুত্বপুর্ণ পর্যটন কেন্দ্র রূপে গড়ে উঠতে পারে।

# উদয়পুরের প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য

উদয়পুরে কয়েকশ বছর ধরে ত্রিপুরার রাজাদের রাজধানী ছিল। উদয়মাণিক্যের আগে রাজধানীর নাম ছিল রাঙ্গামাটি। মোগল আমলে পরিচয় ছিল **সরকার উদয়পুর** নামে।

সুদীর্ঘ কালের রাজধানীতে একটি রাজপ্রাসাদও অক্ষত অবস্থায় নেই। বিভিন্ন সময়ে রাজারা বিভিন্ন স্থানে রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন। কিছু কিছু ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। উদয়পুরে পুর ও তলা যুক্ত অনেক স্থানের নাম পাওয়া যায়। এখানে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে "বারপুর - তেরতলা যে জানে সে উদয়পুরের পোলা" যশপুর - চন্দ্রপুর, লক্ষ্মীপুর, হীরাপুর, রত্নপুর, অমরপুর, ঈশ্বরীতলা সুধারতলা, হংসধ্বজেরতলা ইত্যাদি। কোন রাজবাড়ীর ধ্বংসস্তুপে কোন প্রকার শিলালিপি পাওয়া যায়নি।



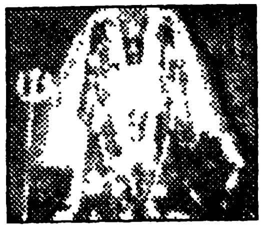
উদয়পুরের ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থানগুলির মধ্যে ভুবনেশ্বরী ও ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির,- মহাদেব বাড়ী, জগন্নাথবাড়ী, -মোগল মসজিদ-গাজীর দরগা,-অমর সাগর,-বিজয়সাগর, - ধনীসাগর, জগন্নাথ দীঘি, মহাদেব দীঘি, মাতাবাড়ীর দীঘি ইত্যাদি উল্লেখ যোগ্য।

ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরের প্রতিষ্ঠার শিলালিপি থেকে জানা যায়, ১৫০১ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজা ধন্য মাণিক্য এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। বিষ্ণুমূর্তি প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে চট্টগ্রামের চন্দ্রনাথ পাহাড় থেকে বৌদ্ধদের দ্বারা অযত্নে পূজিত দেবীকে মন্দিরে এনে প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৯০৩ সাল থেকে এখানে বার্ষিক মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

এই মন্দির ভাস্কর্যে বৌদ্ধ - হিন্দু ও মুসলিম রীতির মিশ্রণ ঘটেছে। ভুবনেশ্বরী মন্দিরটিও মহারাজা ধন্যমাণিক্য নির্মাণ করিয়েছিলেন।

চন্দ্রপুরে উদয়মাণিক্যের প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ রয়েছে। গোমতীর তীরে ছত্র মাণিক্যের রাজপ্রাসদের ভগ্নাবশেষ রয়েছে। অমরপুরে রয়েছে অমর মাণিক্যের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। গোমতীর তীরে মোগল আমলের ছাদহীন মসজিদ দাঁড়িয়ে আছে। কল্যাণ মাণিক্য উদয়পুরে মহাদেব মন্দিরটি নির্মাণ করান। কল্যানপুরের কালিকা দেবীর ও কসবায় সিংহবাহিনী মহিষাসুর মর্দিনী দশভূজাদেবীর মন্দির ও পুরাতন আগরতলায় রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ এবং চৌদ্দ দেবতার মন্দির মহারাজাদের মধ্যযুগীয় ইতিহাসের স্মৃতিচিহ্ন বহন করছে। যে কয়টি মন্দির অক্ষুন্ন অবস্থায় আছে তা পর্যবেক্ষণ করে

প্রত্নতাত্ত্বিকেরা সিদ্ধান্ত করেছেন মন্দিরগুলিতে ব্রহ্মদেশের প্যাগোডা-বাংলার চালা পদ্ধতি এবং মুসলিম স্থাপত্য শিল্পের স্পষ্ট প্রভাব পড়েছে। রাজপ্রাসাদ নির্মাণে ত্রিপুরার নিজস্ব কোন শিল্প বৈশিষ্ট্য ছিল কিনা তা জানার উপায় নেই। তবে আসামের দুইজন রাজদূতের বিবরণ থেকে জানা যায়, রাজ প্রাসাদে ত্রিপুরার বাঁশ-বেত-ছনের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। রাজপরিবারের মন্দিরটি বাঁশ- ছনের তৈরী ছিল। জগন্নাথ দীঘির পাড়ে বাঁশ- ছনের তৈরী জগন্নাথ মন্দির ছিল। এছাড়া কাঠ-বাঁশ ছনের তৈরী ১০ টি গোদামঘর ছিল। ২টি ইটের কোঠায় গোলা বারুদ ছিল। রাজপ্রাসাদে ৪০ জন প্রহরী ছিল। প্রাচীন রাজধানী উদয়পুরের ঐতিহ্য সংরক্ষণের সুষ্ঠু ব্যবস্থা এখনও তৈরী হয়নি।



## আধুনিক যুগের প্রত্নতত্ব

মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের সময় ত্রিপুরায় আধুনিক যুগের সূত্রপাত হলেও প্রকৃত প্রকাশ ঘটেছে, মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্যের সময়। বিংশ শতাব্দীর সূত্রপাতে ১৯০১ সালে উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ সম্পূর্ণ হবার পর আধুনিক রুচির ঐশ্বর্য প্রকাশিত হয়। **উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ - রুদ্রসাগরের নীরমহল - কুঞ্জবন প্রাসাদ** ইউরোপের রোমান - বৃটেন ও ভারতের ভাস্কর্য মিশ্রণের এক অপূর্ব নিদর্শন। ইংরেজ ইঞ্জিনিয়ারদের স্থাপত্য প্রতিভার স্মৃতিচিহ্ন হয়ে আছে এসব প্রাসাদ। মোগলদের উদ্যান রচনার ঐতিহ্যে শোভিত হয়েছে প্রাসাদের প্রান্তর।

## ত্রিপুরার মূদ্রা - শিলালিপি ও তাম্রলিপি

ত্রিপুরার ঐতিহাসিক যুগে রত্নমাণিক্য সর্বপ্রথম মুসলিম সুলতানদের অনুকরনে মুদ্রা প্রচার করেন। এর পূর্ববর্তী কোন রাজার মূদ্রা এযাবত আবিষ্কৃত হয়নি। ইতিহাস রচনায় মূদ্রা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। রাজাদের শাসন কাল এবং বিশেষ বিশেষ ঘটনা মূদ্রার সাহায্যে প্রমাণ করা যায়।

ধন্য মাণিক্যের মুদ্রায় প্রথম ত্রিপুরেন্দ্র শব্দটির ব্যবহার দেখা যায়। বীরচন্দ্র মাণিক্যের পূর্ববর্তী সব মহারাজাই মুদ্রায় শকাব্দ ব্যবহার করেছেন। বীরচন্দ্র মাণিক্য

প্রথম ত্রিপুরাব্দ ব্যবহার করেন। আধুনিক যুগের চারজন রাজার মুদ্রায় ত্রিপুরাব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

আরও একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল বীরচন্দ্র মাণিক্য প্রথম দেববর্মা উপাধি ব্যবহার করেন। কারো কারো মতে ত্রিপুরার রাজারা দেব ও বর্মন বংশীয় রাজাদের রাজ্যের অনেকাংশ বিজয়ের স্মারক হিসাবে দেববর্মা উপাধি প্রচলন করেছিলেন। এর আগে প্রজারা কেউ দেববর্মা উপাধি ব্যবহার করেনি। তিপ্রা বা ত্রিপুরা উপাধি প্রচলিত ছিল। বীরচন্দ্র মাণিক্যের পরবর্তী তিনজন রাজাও দেববর্মা উপাধি ব্যবহার করেছেন।

প্রথমদিকে হাতে পেটা ছাঁচে মুদ্রা তৈরী করা হত। রামগঙ্গা মাণিক্যের সময় থেকে সেমি মেশিনে মুদ্রা তৈরী হত। বীরচন্দ্র মাণিক্যের সময় থেকে বৃটিশের অনুকরণে মেশিনে মুদ্রা তৈরী হতো।

ত্রিপুরায় অধিকাংশ রাজা রৌপ্য মুদ্রা তৈরী করেছেন। অল্প কয়েকজন রাজা অল্প পরিমানে স্বর্ণ মুদ্রা তৈরী করেছেন। একমাত্র রাধাকিশোর মাণিক্যের সময় একটি তাম্রমুদ্রার প্রচলন হয়েছিল। এই মুদ্রাটি রাজেন্দ্র কীর্তিশালায় সংরক্ষিত আছে।

ত্রিপুবার রাজাদের মুদ্রা বাজারে প্রচলিত ছিলনা। অভিষেক, রাজ্যজয় ও তীর্থযাত্রা উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের মধ্যে উপহার হিসেবে বিতড়নের জন্য মুদ্রা তৈরী হত। রাজাদের মুদ্রায় মহারাণীর নামও থাকত।

ত্রিপুরার প্রখ্যাত মুদ্রা বিশারদ জহর আচার্জীর ব্যক্তিগত সংগ্রহ শালা রাজেন্দ্র কীর্তি-শালায় ত্রিপুরার রাজাদের দুষ্প্রাপ্য মুদ্রা সংরক্ষিত আছে।

## তাম্র লিপি

ত্রিপুরায় প্রচলিত তাম্রলিপি উৎসর্গপত্র এবং দানপত্র দুই ধারায় তৈরী হতো। মূর্তি প্রতিষ্ঠা এবং দীঘি উৎসর্গ উপলক্ষে তাম্রলিপি রচিত হতো এবং ব্রাহ্মণদের ভূমিদান সম্পর্কিত তাম্রলিপি প্রদান করা হত। মন্দির পরিচালনার জন্য ভূমিদানের ক্ষেত্রেও তাম্রলিপি দেওয়া হত। এযাবত প্রাপ্ত ত্রিপুরার রাজাদের প্রথম তাম্রলিপিটি প্রথম ধর্মমাণিক্যের আমলে ধর্মসাগর নামে দীঘি উৎসর্গ উপলক্ষে কতিপয় ব্রাহ্মণকে ভূমিদান সম্পর্কিত। এই তাম্রলিপি ইতিহাসের এক জটিল প্রশ্নের উত্তর পেতে সাহায্য করেছে। তাম্র শাসনে তারিখটি অক্ষরে লিখিত থাকায় ভুল ব্যাখ্যা করার সুযোগ নেই। এই তাম্রলিপিতে ধর্ম মাণিক্যের পিতার নাম মহামাণিক্য উল্লেখ রয়েছে। রত্ন মাণিক্যের মুদ্রা

এবং এই তাম্রলিপির তারিখ মিলিয়ে নিশ্চিত হওয়া গেছে যে, ধর্ম মাণিক্য রত্ন মাণিক্যের পিতা ছিলেন। কাজেই ত্রিপুরার রাজাদের মাণিক্য উপাধি মুসলমান সুলতানের দেওয়া এই ধারণাটি ভুল প্রমাণিত হয়েছে। হিন্দু ব্রাহ্মণ পন্ডিতরাই রাজবংশের গৌরব বৃদ্ধির জন্য মহামাণিক্যকে মাণিক্য উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন, এই ধারণা বদ্ধ মূল হয়েছে। মহামাণিক্যের সময় থেকে মাণিক্য রাজাদের ইতিহাস শুরু হয়েছে। দ্বিতীয় তাম্রলিপিটি বিজয় মাণিক্যেব শ্বশুর সেনাপতি দৈত্যনারায়নের স্ত্রী পুণ্যবতীর এক দানপত্র। কল্যাণ মাণিক্যের কতকগুলি উৎসর্গ পত্রও পাওয়া গেছে। এছাড়াও বিভিন্ন রাজাদের দানপত্র পাওয়া গেছে।

## শিলালিপি

ঐতিহাসিক যুগের রাজাদের দ্বারা নির্মিত প্রায় সব কয়টি মন্দির গাত্রে শিলা লিপি উৎকীর্ণ রয়েছে। পাথরে খোদিত বাংলা হরফে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত লিপিগুলো থেকে প্রতিষ্ঠাতার পরিচয় ও সময়কাল জানা যায়। ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির, গোপীনাথ মন্দির, জগন্নাথ মন্দির, মহাদেব মন্দিরের শিলালিপি অক্ষুন্ন রয়েছে। মহারাণীতে বিজয় মাণিক্যের প্রতিষ্ঠিত একটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে একটি বিশাল পাথরে খোদিত লিপি উৎকীর্ণ রয়েছে। কোন রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে শিলালিপি পাওয়া যায়নি।

## শীল মোহর

রাজাদের ব্যবহৃত বিভিন্ন শীল মোহর গুলো প্রত্নতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের আওতায় পড়ে। বহু শীলমোহর পাওয়া গেছে। বিভিন্ন কাজে বিভিন্ন শীল মোহর ব্যবহার করা হতো।

বিংশ শতাব্দীর প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষকরা রাজাদের মুদ্রা-তাম্রলিপি, শীলালিপি ও শীলমোহরগুলোকে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করে ত্রিপুরার ইতিহাসকে একটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার উদ্যোগ নিয়েছেন। এই সময়ে ত্রিপুরার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মাণিক্য রাজাদের পূর্ববর্তী রাজাদের বহু তাম্রলিপি, মুদ্রা ও মূর্তি আবিষ্কৃত হওয়ায় রাজ্যের ইতিহাস আরও স্পষ্ট রূপ নিচ্ছে।

ত্রিপুরার রাজারা তিনরকম শীলমোহর ব্যবহার করতেন। ১) পদ্মমোহর ২) দেবাজ্ঞামোহর ৩) খাস মোহর। মোগল বাদশাদের অনুকরণে এগুলি তৈরী হয়েছিল। এ ছাড়াও অভিষেকের আগে যুবরাজদের ব্যবহারের জন্যে যুবরাজ মোহর প্রচলিত ছিল।

# রাজন্য যুগের ধর্মীয় ঐতিহ্য

ত্রিপুরার রাজবংশ শৈব ধর্মাবলম্বী ছিলেন। রাজমালার বর্ণনা অনুযায়ী মহারাজা ত্রি লোচন শিবের ভক্ত ছিলেন। শিবের অন্য নাম মতাই-কতর-অর্থাৎ দেবতাদের মধ্যে প্রধান। মহারাজা ত্রিলোচন চতুর্দশ দেবতার পূজো প্রচলন করেছিলেন। শিব ও শাক্ত ধর্মের প্রতি অনুরক্ত রাজ পরিবার মহারাজা রাজধর মাণিক্যের সময় থেকে বৈষ্ণব ধর্মের অনুগামী হয়ে যান।

কিন্তু উপজাতীয় ধর্ম বিশ্বাসের প্রতিও গভীর শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায় খার্চিপূজা ও কের পূজার রাজকীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে।

হিন্দু ধর্মের অনুগামী হিসেবে রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে হিন্দু দেব দেবীর মূর্তি ও মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন ত্রিপুরার রাজারা।

ভিন্ন ধর্মের প্রতিও শ্রদ্ধা ও সহনশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। বৌদ্ধ - খৃষ্টান ও মুসলিম প্রজাদের ধর্মাচরনের স্বাধীনতা দিয়েছেন। প্রথম দিকে খৃষ্টানদের সম্পর্কে কিছুটা দ্বিধা দ্বন্দ্ব ছিল। পরে ক্রমশ : তা দূর হয়ে যায়। আগরতলায় বেণুবনবিহার এবং কুমিল্লায় সুজা মসজিদ, মরিয়মনগরের গীর্জা, ত্রিপুরার রাজাদের ধর্মীয় সহনশীলতা ও অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে।

রাজ্যের উপজাতীয় প্রজাদের মধ্যে নানারকম দেবতা, অপদেবতা এবং উপদেবতার পূজা প্রচলিত আছে । দেবতার উদ্দেশ্যে শূকর, মোরগ বলি দেওয়া ডিম উৎসর্গ করা উপজাতীয় রীতি। অনেক দেবতার সঙ্গে হিন্দু দেবতাদের মিল রয়েছে। যেমন লাম্প্রা ও বিখিত্রা হিন্দুদের কার্তিক গনেশের মত। জলের দেবতা তুইমা হিন্দুদের গঙ্গাপূজার মত। মাইলুংমা হিন্দুদের লক্ষ্মী দেবীর মত । এসব দেব দেবীর মূর্তি নেই। বাঁশের তৈরী বিশেষ কারুকার্য দ্বারা দেব দেবীর অবস্থান কল্পনা করা হয়। এছাড়া অনেক অপদেবতা ও উপদেবতার কল্পনা করা হয়। নানা কুসংস্কার থেকে এসব দেবতার জন্ম হয়েছে। এসব অপদেবতার প্রভাব থেকে মুক্তির জন্য যাদুবিদ্যা ও ঝাড়ফুঁক প্রচলিত হয়েছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক শিক্ষাই শুধু এর পরিবর্তন আনতে পারে।

রাজধর্মের প্রভাবে অনেক সম্প্রদায়ে বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব বেড়েছে। এর ফলে বহু কীর্তনীয়া দলের উদ্ভব ঘটেছে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তারা চমৎকার কীর্তন পরিবেশন করে। মণিপুরীরাও বৈষ্ণব ধর্মের অনুরাগী। তাদের প্রভাবে রাজপরিবারে হোলি, ঝুলন ও রাস উপলক্ষে নৃত্য ও সঙ্গীতের অপূর্ব অনুষ্ঠান এক অপরূপ বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে।

মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের তিন মহারাণী ভানুমতি, রাজেশ্বরী, এবং মনোমোহিনী ছিলেন মণিপুরী রাজ কন্যা। মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্যের দুই মহারাণী রত্নমঞ্জুরী এবং তুলসীবতীও ছিলেন মণিপুরী রাজকন্যা। কাজেই রাজপরিবারে মণিপুরী ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাব বিশেষ ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। উপজাতিদের অপদেবতা পূজা ও কুসংস্কার থেকে অনেকটা মুক্ত ছিল রাজকীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি।

## রাজন্য যুগের প্রশাসনিক বিবর্তন ও সংস্কার

রাজমালায় প্রাচীন যুগের রাজাদের প্রশাসন সম্পর্কে কোন উল্লেখ নেই। ফা-উপাধিধারী রাজারা বংশানুক্রমে রাজার অধিকার প্রয়োগ করার জন্য উপজাতি সমাজের রীতি নীতি অনুযায়ী বিচার ও সামাজিক শৃংখলা রক্ষা করেছেন। এটা অনুমান করা যায়। উপজাতি সমাজে সর্দাররা অতি উৎকৃষ্ট গণতান্ত্রিক রীতি নীতি আবিষ্কার করেছিলেন। ফলে সর্দারের প্রভাব ছিল প্রশ্নাতীত।

মধ্যযুগে রত্ন মাণিক্য মুসলিম সুলতানদের অনুকরণে রাজ্যের আর্থিক পরিকাঠামো অনুযায়ী একটা ছোট্ আকারের প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন। মুসলিম অনুকরণে চারটি প্রধান রাজকর্মচারী পদ সৃষ্টি করা হয়। যেমন ঃ-

১) সুবা ( প্রধান সেনাপতি),

২) উজীর (প্রধান মন্ত্রী),

৩) নাজির (পুলিশ প্রধান),

৪) দেওয়ান (রাজস্ব বিভাগের প্রধান)।

### সুবা

অধীনস্থ রাজকর্মচারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পদগুলি ছিল সুবার অধীনে হাজারী, জমাদার, ও দফাদার। আগে হিন্দু রীতিতে সেনাপতি নিয়োগ করা হতো। রাজার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়রা সেনাপতি পদে নিযুক্ত হতেন। বিভিন্ন ষড়যন্ত্রে যুক্ত থেকে রাজাদের হত্যা করার ঘটনা ঘটতে থাকায় পারিবারিক প্রভাব মুক্ত রাজার বিশ্বস্ত অনুগামী যাচাই করে বিভিন্ন সম্প্রদায় থেকে সেনাপতি নিয়োগ করার রীতি প্রচলিত হয়। মহারাজা বীরচন্দ্র

মাণিক্যের সময় সেনা বিভাগে নিযুক্ত কর্মীসংখ্যা ছিল ২৯৪ জন।

## উজির

উজীর পদে রত্নমাণিক্য অভিজ্ঞ বাঙ্গালীকে নিযুক্ত করেন। কৃষ্ণ মাণিক্যের সময় এই রীতি বদল করে স্বজাতীয় জয়দেবকে উজীর পদে নিযুক্ত করেন। পর পর তিন পুরুষ ধরে তারা উজীর পদে কাজ করেন। কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য উজীরপদ বাতিল করে মোক্তার নামে নতুন পদ সৃষ্টি করেন। বীরচন্দ্র মাণিক্যের সময় উজীর ও মোক্তার এর পরিবর্তে প্রধান মন্ত্রীর পদ সৃষ্টি করেন। আধুনিক যুগের চারজন রাজাই প্রধানমন্ত্রী পদ বহাল রাখেন।

## নাজীর

অনেকটা পুলিশের মত রাজার অধীনে একদল বিনন্দিয়া নিযুক্ত হতো। তাদের প্রধানকে বলা হতো নাজীর। বাজার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের মধ্য থেকেই এসব পদে নিয়োগ করা হত। প্রধানত রাজপ্রাসাদ পাহারা দেওয়া এবং রাজার নির্দেশ বিভিন্ন সর্দারদের কাছে পৌঁছে দেওয়া তাদের কাজ ছিল। কোথাও বিশৃংখলা দেখা দিলে তা দমন করার জন্যও তাদের পাঠানো হতো।

## দেওয়ান

রাজস্ব বিভাগের প্রধান হলেন দেওয়ান। সাধারনত বিশ্বস্ত ও অভিজ্ঞ বাঙ্গালীদের দেওয়ান পদে নিযুক্ত করা হত। পার্বত্য রাজ্যের জন্য একজন স্বজাতীয় দেওয়ান ছিলেন। পরে রাজ্য ও জমিদারীর জন্য একজন অভিজ্ঞ বাঙ্গালী দেওয়ান নিযুক্ত করার প্রথা চালু হয়। রাজন্য যুগের শেষ দিন পর্যন্ত দেওয়ান পদটি বলবৎ ছিল। বীরচন্দ্র মাণিক্যের সময় রাজ্যের আয় ছিল চারলক্ষ টাকা এবং জমিদারীর আয় ছিল বার্ষিক ছয় লক্ষ টাকা।

## যুবরাজ

প্রাচীন রীতি অনুযায়ী রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজা হতেন। মহারাজা কল্যাণ মাণিক্যের সময় যুবরাজ প্রথা চালু হয়। রাজার ইচ্ছা অনুযায়ী পুত্র বা ভাইকে যুবরাজ পদে অভিষিক্ত করার রীতি প্রচলিত হয়। এই সময় থেকে রাজকুমারদের ঠাকুর উপাধিতে ভূষিত করা হয়। পরবর্তী কালে রাজপরিবারের আত্মকলহ নিরসনের জন্য বড়ঠাকুর ও কর্তা পদ

সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু এর ফলে পারিবারিক কলহ বৃদ্ধি পায়।

মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের সময় ভারতের সব কয়টি দেশীয় রাজ্যে ইংরেজ সরকার পলিটিক্যাল এজেন্ট নিয়োগ করে প্রশাসনিক ব্যবস্থায় আধুনিক পদ্ধতি গ্রহণের জন্য চাপ সৃষ্টি করে।

প্রাচীনকাল থেকে রাজার ইচ্ছাই ছিল আইন। রাজার দরবারে রাজার বিচার বুদ্ধি অনুযায়ী বিচারই হল শেষ কথা। রাজা ইচ্ছে করলে যে কোন অপরাধীকে শাস্তিও দিতে পারেন অথবা মুক্তিও দিতে পারেন। রাজ্যে আলাদা কোন বিচার ব্যবস্থা ছিলনা। জেলখানাও ছিলনা। শাস্তি দ্রুত কার্যকর করা হত।

## প্রশাসনিক সংস্কার

রাজন্যযুগের স্বেচ্ছাচারিতার ফলে রাজকর্মচারীরা অত্যাচারী হয়ে উঠতো। ফলে প্রজাবিদ্রোহ দেখা দিত। ইংরেজ সরকার আধুনিক বিচার ব্যবস্থা সহ প্রশাসনে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনার জন্য অভিজ্ঞ একজন বৃটিশ রাজকর্মচারীকে মন্ত্রীপদে নিয়োগের জন্য চাপ সৃষ্টি করে।

এই সময় অভিজ্ঞ দেওয়ান ঈশানচন্দ্রগুপ্ত বৃটিশ আইনের অনুকরণে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন প্রণয়ন করেন। এটাই ত্রিপুরায় প্রথম লিখিত আইন। ১৮৭২ সালে সারা ভারতের সঙ্গে ত্রিপুরায়ও লোকগণনা শুরু হয়। ১৮৭১ সালে মিউনিসিপ্যালিটি গঠন করা হয়।

কুকীদের অত্যাচার বন্ধ করার জন্য বৃটিশ সরকার সেনা বাহিনী পাঠিয়ে অবস্থা নিয়ন্ত্রনে আনেন এবং রাজ্যের পূর্ব সীমানা জম্পুই পাহাড়ের লঙ্গাই নদী ধার্য করে সীমানা নির্দিষ্ট করে দেন। এর ফলে রাজ্যের কিছু অংশ হারাতে হয়। কিন্তু প্রজারা কুকী আক্রমণ থেকে মুক্ত হয়।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে প্রথম পলিটিক্যাল এজেন্ট এ. ডব্লিউ .বি. পাওয়ার এর পরামর্শে আগরতলায় বিচার আদালত গঠন করা হয়। রাজ্যে ঠাকুর লোকদের নানা রাজকার্যে নিযুক্ত করার ফলে চাটুকারদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। পলিটিক্যাল এজেন্টের পরামর্শে ১৮৭৩ সালে কুমিল্লার সাব রেজিষ্টার নীলমনি দাসকে সর্ব প্রকার ক্ষমতাযুক্ত দেওয়ান নিযুক্ত করা হয়। তিনি বৃটিশ অনুকরণে স্টাম্প সৃষ্টি করে আবগারী বিভাগ ও রেজিষ্টারী বিভাগের আইন কানুন তৈরী করেন। রাজ্যের আয়বৃদ্ধি পাওয়ায় ঋণ শোধ করা এবং প্রশাসনে শৃংখলা স্থাপণের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

প্রশাসনিক সুবিধার জন্য উদয়পুর বিভাগ সৃষ্টি করা হয়। বর্ষাকালে উদয়পুর অস্বাস্থ্যকর হয়ে উঠে। ঐ সময় বিভাগের কাজ কর্ম সোনামুড়ায় স্থানান্তরের ব্যবস্থা করা হয়। রাজ্যে কৈলাসহর - আগরতলা - উদয়পুর তিনটি প্রশাসনিক বিভাগ চালু হয়। দেওয়ান নীলমনি দাসের পরামর্শে রাজ্যে বৃটিশ দন্ডবিধি প্রচলন করা হয়। উকীলদের জন্য পরীক্ষার ব্যবস্থা প্রচলিত হয়। কিছু কুচক্রীর পরামর্শে মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য অভিজ্ঞ ও রাজ্যের মঙ্গলাকাংক্ষী দেওয়ান নীলমনি দাসকে হঠাৎ কর্মচ্যুত করে বহিষ্কারের আদেশ দেন।

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়া সব দেশীয় রাজাদের একটি পতাকা নির্দিষ্ট করে দেন। রাজাদের মহারাজা উপাধি প্রদান করেন। নতুন করে এই উপাধি দানের তাৎপর্য হল বৃটিশ সরকার দেশীয় রাজাদের অধিকার অক্ষুন্ন রাখবেন তার স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এর আগেই স্বাধীন ত্রিপুরাকে পার্বত্য ত্রিপুরা নামে রূপান্তরিত করা হয়। ১৯২২ সালে মহারাজা বীরেন্দ্র কিশোরের অনুরোধে স্বাধীন ত্রিপুরা নামটি পুনর্বহাল করা হয়।

১৮৭৮ সালে বৃটিশ সরকারের নির্দেশে রাজ্যে দাসদাসী বিক্রীর প্রথা নিষিদ্ধ হয়। এই সময় রাজ্যের পলিটিক্যাল এজেন্ট প্রথার পরিবর্তে ত্রিপুরা জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটকে পলিটিক্যাল এজেন্ট নিযুক্ত করে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট উমাকান্ত দাসকে এসিস্টেন্ট পলিটিক্যাল এজেন্ট নিযুক্ত করে পাঠানো হয়। এই সময় পার্বত্য আদালত বাতিল করে সকলের জন্য একই বিচার ব্যবস্থা চালু হয়।

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে রাজ্যে নানা রকম বিশৃংখলা দেখা দেওয়ায় পাঁচ বছরের জন্য রাজ্যের শাসনভার সরাসরি বৃটিশ সরকারের অধীনে নেওয়া হয়। মহারাজা লিখিতভাবে শাসন ভার বৃটিশ কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেন। উমাকান্ত দাসকে প্রধান মন্ত্রীপদে নিয়োগ করে রাজ্য শাসন পরিচালনা করা হয়। পলিটিক্যাল এজেন্টের পদ তুলে দেওয়া হয়। শর্ত অনুযায়ী পাঁচটি ক্ষেত্রে মহারাজার অনুমোদন নেওয়ার ব্যবস্থা হয়।

অনুমোদন যোগ্য পাঁচটি বিষয় হল ঃ-

১) রাজ পরিবার সংক্রান্ত কোন বিষয়।

২) ২০০ টাকার বেশী বেতনের কোন কর্মচারীর নিয়োগ ও অবসর সংক্রান্ত বিষয়।

৩) ৫০ টাকার উর্দ্ধে বৃত্তিপ্রাপ্ত ঠাকুর লোকদের বৃত্তি বহাল বা বাতিল সংক্রান্ত বিষয়।

৪) মকরবি জমায় কোন তালুক দান সংক্রান্ত বিষয়।

৫) অপরাধীর প্রানদন্ড সংক্রান্ত বিষয়।

তখন রাজ্যে ষড়যন্ত্রকারীদের প্রধান্য ছিল। মহারাজার প্রিয় পাত্ররা অগ্রিম বেতন নিয়ে যেত। অন্যরা সময়মত বেতন পেতনা। সেনা বিভাগেও বিশৃংখলা দেখা দিয়েছিল। এই সময় পার্বত্য ত্রিপুরীদের ক্ষত্রিয় ঘোষণা দিয়ে উপজাতি সমাজে জাতিভেদ প্রথা প্রচলন করা হল।

উমাকান্ত দাস প্রধান মন্ত্রীর দায়িত্ব নিয়ে সব বিশৃংখলা দূর করেন। অকমর্ণ্য কর্মচারীদের বিদায় দিয়ে যোগ্য ব্যক্তিদের নিযুক্ত করেন। রাজ্যের আয় বৃদ্ধির ব্যবস্থা করে এবং অনাদায়ী রাজস্ব আদায় করে কর্মচারীদের নিয়মিত বেতন প্রদান এবং ঋণশোধের ব্যবস্থা করেন। তখন পুলিশ ও সামরিক বিভাগের মোট কর্মী সংখ্যা ছিল ৫৫৮ জন।

রোশনাবাদ এলাকায় মহারাজাদের তালুকদান করার অধিকার নেই। আদালতের এরূপ রায়ের ভিত্তিতে বহু তালুক বাজেয়াপ্ত করা হয়। সেই সময় রাজপরিবারের কোন লোকের বিরুদ্ধে মামলায় সাক্ষী পাওয়া যেতনা এবং বিচারকরাও নিরপেক্ষ রায় দিতে পারতেন না। প্রধানমন্ত্রী উমাকান্ত দাসের হস্তক্ষেপে এই ব্যবস্থার পরিবর্তন হয়।

মাত্র আড়াই বছর প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বে থেকে উমাকান্ত বাবু রাজ্যের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য সচেষ্ট হন। কিন্তু ষড়যন্ত্র কারীরা ইংরেজ কর্তৃপক্ষের কাছে নানা অভিযোগ পেশ করেন। লে.গভর্নর জমিদারীর জন্য একজন ইংরেজ অবসরপ্রাপ্ত আই সি এস অফিসারকে ম্যানেজার পদে নিয়োগ করে রাজ্যে যুবরাজ ও বড় ঠাকুরের উপর শাসনভার পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করেন। উমাকান্তবাবুকে পূর্বপদে ফিরিয়ে নেওয়া হয়। শর্ত হিসেবে বার্ষিক হিসাব নিকাশ নিয়মিত জমা দেবার নির্দেশ দেওয়া হয়। আরেকটি শর্ত ছিল চট্টগ্রামের কমিশনার যখনই কুমিল্লায় আসবেন তখন মহারাজা স্বয়ং অথবা প্রতিনিধি পাঠিয়ে কমিশনারের কাছে রাজ্য পরিচালনার রিপোর্ট দিবেন এবং পরামর্শমত কাজ করবেন।

বৃটিশ সরকারের পরামর্শ অনুযায়ী রাজস্ব, বিচার - পুলিশ - শিক্ষা ও চিকিৎসা বিভাগের দায়িত্ব যুবরাজকে দেওয়া হয় এবং সামরিক ও পলিটিক্যাল বিভাগ বড় ঠাকুরকে দেওয়া হল।

দক্ষ ও অভিজ্ঞ বহু কর্মচারীর চাকরী গেল। রাজপরিবারের লোকজন নানা বিভাগে নিযুক্ত হল। প্রজাদের উপর শুল্ক বৃদ্ধি করা হল। এসব দেখে আসামের বৃটিশ কমিশনার প্রস্তাব দিয়েছিলেন রাজ্যে প্রজাদের স্বার্থে একজন বৃটিশ রাজকর্মচারী নিযুক্ত করা উচিত।

মহারাজা রাধা কিশোর মাণিক্য বিচার বিভাগে বংশগত নিয়োগপ্রথা বিলোপ করেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা ও দক্ষতার ভিত্তিতে নিয়োগ প্রথা প্রচলন করেন।

মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য ১৮৭৫ সালে ১টি মাত্র পোষ্ট অফিস এবং একটি মাত্র দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। ১৮৯০ সালে একটি মাত্র হাইস্কুল স্থাপন করেন।

রাধাকিশোর মাণিক্য প্রশাসনিক কাজের সুবিধার জন্য নতুন দুটি বিভাগ বিলনীয়া ও খোয়াই স্থাপন করেন। কৃষি ও শিল্পের জন্য পৃথক দপ্তর গঠন করেন। রাজ্যের বাজেট তৈরীতে ব্যক্তিগত ও রাজ্যগত বিভাগ সৃষ্টি করেন। রাজ্যে দশটি পোষ্ট অফিস ও দুটি টেলিগ্রাম অফিস স্থাপন করেন।

পিতার অকাল মৃত্যুতে বীরেন্দ্র কিশোর শাসনভার গ্রহণ করে অমাত্যসভার সংস্কার করেন। দক্ষ প্রশাসক ও রাজকুমারদের নিয়ে এই পরিষদ গঠন করা হয়। ১৯১৮ সালে শাসন পরিষদ গঠন করা হয়। দক্ষ প্রশাসক নিয়োগের জন্য বৃটিশ অনুকরণে 'স্টেট সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার' ব্যবস্থা করা হয়। সর্বোচ্চ আপিল আদালত হিসেবে 'প্রিভি কাউন্সিল' গঠন করা হয়।

মাত্র ৪০ বছর বয়সে বীরেন্দ্র কিশোরের মৃত্যুর পর ১৫ বছরের নাবালক পুত্র বীরবিক্রম কিশোর রাজা হন। ১৯২৮ সালে বীর বিক্রম মাণিক্যের অভিষেক সম্পন্ন হবার পর তিনি ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেন। আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীতে রাজ্যের উন্নতি বিধানের জন্য উদ্যোগী হন।

গ্রামীণ জীবনে পরিবর্তন আনার জন্য গ্রামমন্ডলী গঠন করেন। গ্রামীণ বিশ্ব বিদ্যালয় ও আধুনিক কলেজ স্থাপনের উদ্দেশ্যে বিদ্যাপত্তন নামে পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

১৯৪১ সালে শাসন তান্ত্রিক সংস্কারের ঘোষণা দেন। এতে বলা হয় যে প্রিভি কাউন্সিল মন্ত্রনাসভা হিসেবে শাসন ও বিচার সংক্রান্ত বিষয়ে রাজাকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও উপদেশ দিবে। খাস আদালতের উন্নতিসাধন করা হবে। প্রধানমন্ত্রীসহ পাঁচজন মন্ত্রী নিয়ে মন্ত্রী পরিষদ গঠন করা হবে। আইন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য একটি ব্যবস্থাপক সভা গঠন করা হবে।

গ্রামবাসীদের দ্বারা গঠিত গ্রামমন্ডলীকে স্বায়ত্বশাসনের অধিকার দেওয়া হবে। কর আদায় ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মামলা বিচারের ক্ষমতা দেওয়া হবে। একজন মন্ত্রীর অধীনে বাজেট নিয়ন্ত্রিত হবে। রাজ পরিবারের বাজেট রাজ্যের মোট আয়ের দশ ভাগের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হবে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ত্রিপুরাসহ সমগ্র পৃথিবীর চেহারা পাল্টে দিয়েছে। যে বৃটিশ

**সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যায়না বলে গর্ব করা হত সেই বিশাল সাম্রাজ্য শাসন ও রক্ষা করার শক্তি নির্বাপিত হল। সমস্ত পরাধীন জাতি স্বাধীনতা অর্জন করল। পৃথিবীতে এল প্রজাতন্ত্রের যুগ। রাজন্য যুগের অবসান হল ইতিহাসের অনিবার্য পরিনতি । ত্রিপুরাও তার ব্যতিক্রম নয়। ক্ষুদ্র ত্রিপুরায় রাজাদের স্বাধীনতা রূপান্তরিত হল প্রজাদের স্বাধীনতায়। ত্রিপুরা মিলিত হল প্রজাতান্ত্রিক ভারতের বিশাল জাতীয় গণতান্ত্রিক স্রোতের মুল ধারায়।**

# রাজন্যযুগে সাহিত্য চর্চা

ত্রিপুরায় প্রাচীন যুগের কোন সাহিত্য নিদর্শন এখন পর্যন্ত আবিস্কৃত হয়নি। উপজাতীয়দের কোন লিখিত ভাষা ছিলনা। তাই লিখিত সাহিত্য সৃষ্টি হওয়া সম্ভব ছিলনা। তবে উপজাতি জীবনের নানা দিক সমৃদ্ধ আকারে রূপ পেয়েছে তাদের মৌখিক সাহিত্য রূপ কথা, উপকথা ও সঙ্গীতে।

মহারাজা ত্রিপুর ও ত্রিলোচনের সময় থেকে ব্রাহ্মণ পন্ডিতদের সমাদর লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যেরও কোন নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়নি। সে-যুগে সারা ভারতে সংস্কৃত চর্চা হতো।

মধ্যযুগে মহারাজা ধর্ম মাণিক্যের নির্দেশে রাজমালা রচিত হয়। পরবর্তী সময়ে মহারাজা অমর মাণিক্য, গোবিন্দ মাণিক্য, কৃষ্ণ মাণিক্য, কাশীচন্দ্র মাণিক্য ও কৃষ্ণ কিশোর মাণিক্যের রাজত্ব কালে সমকালীন কার্যাবলীর সংযোজন ও পরিবর্ধন সহ রাজমালার ছয়টি খন্ড প্রকাশিত হয়। বীরচন্দ্র মাণিক্যের সময় কৈলাসচন্দ্র সিংহ রাজমালার সামগ্রিক ইতিহাস একটি খন্ডে প্রকাশ করেন। পরবর্তী সময়ে কালীপ্রসন্ন সেন দুর্গামনি উজীরের রাজমালার ভিত্তিতে চার খন্ডের রাজমালা প্রকাশ করেন। এগুলি প্রকৃত পক্ষে সাহিত্য নয়। রাজবংশের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে সাহিত্য গুন যুক্ত হয়েছে। এসব গ্রন্থে রাজ্যের প্রজাদের সম্পর্কে কিছুই জানা যায়নি। এমনকি রাজবংশের ১৭৮ জন রাজার মধ্যে ১৩০ জন রাজার নাম ছাড়া আর কিছুই উল্লেখ করা হয়নি। তবুও রাজমালার ঐতিহাসিক গুরুত্ব যেমন আছে তেমনি সাহিত্যিক মূল্যও কম নয়।

এছাড়াও কৃষ্ণমালা, গাজীনামা, চম্পক বিজয় ত্রিপুরা বুরুঞ্জি মধ্যযুগের সাহিত্য নিদর্শন হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ।

আধুনিক যুগের মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য নিজেই ছিলেন কবি ও সঙ্গীতজ্ঞ। রাজকুমার ও রাজকুমারীদের মধ্যেও ছিল সাহিত্য প্রতিভা। অন্দরমহলে রাণীদের মধ্যেও

ছিল সাহিত্য চর্চার পরিবেশ। রাজপরিবার ভিত্তিক যে সকল কাব্যগ্রন্থ রচিত হয়েছে তা সাহিত্যের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য ত্রিপুরায় প্রথম ছাপাখানা স্থাপন করেন। এখান থেকেই প্রকাশিত হয় মহারাজার ছয়টি কাব্য গ্রন্থ- **আকাশ কুসুম**,- **সোহাগ**, -**প্রেম মরীচিকা**,- **হোরী**,- **ঝুলন ও উচ্ছাস**। মহারাজকুমারী অনঙ্গ মোহিনী দেবীর কয়েকটি কাব্য গ্রন্থ **কণিকা**,- **লোকগাথা ও প্রীতি**। এখান থেকেই ছাপা হয়।

১৮৭৬ সালে যুবরাজ রাধা কিশোরের উদ্যোগে রাজকুমার সভায় গঠিত বিশেষ প্রবন্ধগুলো বাছাই করে নববর্ষ উপলক্ষে **'বার্ষিক'** নামে পুস্তিকাকারে প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়। রাজকুমারদের গৃহশিক্ষক রাধারমণ ঘোষের পরামর্শে ও অনুপ্রেরণায় এরূপ উদ্যোগ সৃষ্টি হয়েছিল।

১৮৮২ সালে **"ত্রিপুরাবার্তাবহ"** নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১৮৮৩ সালে **"ত্রিপুরা হিতৈষী"** নামে আরেকটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১৮৯০ সালে **"ত্রিপুরা প্রকাশ"** নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। এসব পত্রিকা প্রকাশের মূলে ছিল মহারাজার উদ্যোগ ।

১৯০৩ সালে মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্যের সময় **'ধূমকেতু'** নামে দুটি সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশিত হয় । ধুমকেতুর সম্পাদক ছিলেন মহারাজ কুমার মহেন্দ্র দেববর্মণ। পত্রিকাটিতে রাজকর্মচারীদের কার্যকলাপ সম্পর্কে ব্যাঙ্গাত্মক সমালোচনা করা হতো।

**"বঙ্গভাষা"** সাহিত্য পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন সুরেন্দ্র মোহন দেববর্মণ। উৎসাহদাতা ছিলেন উজীর গোপীকৃষ্ণ ঠাকুর। বঙ্গভাষা পত্রিকায় বিশিষ্ট লেখকদের মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হতো।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় **'অরুণ'** নামে একটি সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ছিলেন পন্ডিত চন্দ্রোদয় ভট্টাচার্য। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের উপর বহু মূল্যবান প্রবন্ধ ও ব্যাঙ্গাত্মক কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল এই সাহিত্য পত্রিকায়। ১৯১১ সালে -**" ত্রিপুরা গাইড "**- নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। মূল্যবান প্রবন্ধ ও তথ্যনিষ্ঠ সমালোচনায় সমৃদ্ধ ছিল পত্রিকাটি। সে সময়ের বহু অজানা খবর জানা যায় এই পত্রিকা থেকে।

১৯২৪ সালে কিশোর সাহিত্য সমাজের মুখপত্র হিসেবে প্রকাশিত হয় **'রবি'** নামে ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকাটি। সম্পাদক ছিলেন মহারাজকুমার নরেন্দ্র কিশোর

দেববর্মণ। কিশোর সাহিত্য সমাজের প্রতিষ্ঠা সভায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত থেকে স্বরচিত 'দেশীয় রাজ্য' নামক প্রবন্ধটি পাঠ করেছিলেন। পরে বিভিন্ন লেখা দিয়ে পত্রিকাটির শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়েছিলেন।

"রবি" পত্রিকাটি ত্রিপুরায় প্রথম একটি সংগঠনের মুখপত্র হিসেবে প্রকাশিত হয়। প্রখ্যাত শিল্পী ধীরেন্দ্র কৃষ্ণ দেববর্মন পত্রিকাটির প্রচ্ছদ অংকন করেছিলেন। জুমচাষীর টংঘর ছিল প্রচ্ছদের মূল আকর্ষণ।

"রবি" পত্রিকা ছয় বছর টিকে ছিল। এই সময়ের মধ্যেই ইতিহাস, অর্থনীতি গল্প - প্রবন্ধ - লোক সাহিত্য - সমালোচনা ও কবিতায় সমৃদ্ধ হয়ে এক উজ্জ্বল ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। মহিলা কবি অনঙ্গমোহিনী দেবীর বহু কবিতা 'রবি' পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। রাজকুমারী গোলাপদেবী এবং নিরুপমা দেবী প্রচলিত রূপকথা ও উপকথা লিখতেন। নবদ্বীপ চন্দ্র দেববর্মনের লেখা -"**বাংলা ভাষার চারিযুগ**"- একটি মূল্যবান লেখার নিদর্শন। দীনেশচন্দ্র সেনের রূপকথার সমালোচনার মাধ্যমে কাহিনী রচনা 'রবি' পত্রিকার সম্পদ হয়ে উঠেছিল। এছাড়াও বিশিষ্ট লেখকদের মধ্যে ছিলেন দ্বিজেন্দ্র চন্দ্র দত্ত, ব্রজেন্দ্র কিশোর দেববর্মণ, কালীপ্রসন্ন সেন এবং ভূপেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্তী।

১৯২৬ সালে "**চুন্টা প্রকাশ**" নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ছিলেন চুন্টা গ্রামের বাসিন্দা। মহারাজা বীরবিক্রম এই পত্রিকার উৎসাহী গ্রাহক ছিলেন। "**রাজ্যাভিষেক সংখ্যা**" দরবার সংখ্যা এবং "**চাকলা সংখ্যা**" নামে কয়েকটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল ।

১৯৩৪ সালে "**পূর্বালী**" নামে একটি সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হয় । সম্পাদক ছিলেন অজিতবন্ধু দেববর্মন। প্রতিমাসের ১৫ তারিখ পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়ে 'রবি' পত্রিকার শূন্যস্থান পূরণ করেছিল। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের লেখায় সমৃদ্ধ হয়ে এক বছর কাল চলার পর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।

ঐসময় "**ত্রিপুরা**" নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হতো। প্রচার দপ্তরের সত্যরঞ্জন বসু ছিলেন পত্রিকাটির উৎসাহদাতা। যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন অমরেন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং শংকর চট্টোপাধ্যায় । এই পত্রিকায় রাজদরবারের খবরা খবর প্রকাশিত হতো ।

১৯৪২ সালে বোধজং বাহাদুরের সম্পাদনায় "**ত্রিপুরা বান্ধব**" নামে মাসিক সাহিত্য পত্রিকাটি প্রকাশিত হয় । অনিলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, সুবোধ নন্দী এবং দুর্গাদাস গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদক মন্ডলীতে ছিলেন। পত্রিকায় উদ্যোক্তাদের রুচি ও দক্ষতার পরিচয়

পেয়ে পাঠকগণ খুশী হয়েছিলেন।

বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই প্রকৃতপক্ষে রাজন্যযুগের সাহিত্য চর্চা রাজপরিবারের গন্ডী অতিক্রম করে জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। সাহিত্য পত্র ও পত্রিকাগুলো দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। কিন্তু সে যুগের চিন্তা ও মননশীলতার সাক্ষী হয়ে আছে এগুলো।

সে যুগের সব পত্র-পত্রিকা ও সাহিত্য সম্ভার অনেক আগেই দুষ্প্রাপ্য হয়ে গেছে। কিন্তু আগরতলায় রমাপ্রসাদ গবেষণাগারের প্রাণপুরুষ সকলের শ্রদ্ধেয় রমাপ্রসাদ দত্ত এখনো যক্ষের ধনের মতো সংরক্ষিত করে রেখেছেন সে যুগের অমূল্য সাহিত্য সম্পদগুলো। কিছু কিছু প্রবন্ধে তিনি রাজন্যযুগের সাহিত্য চর্চার আভাষ মাত্র দিয়েছেন। আর অকৃপণভাবে দান করে চলেছেন সচেতন গবেষক ও পাঠকদেব কাছে তাঁর সংরক্ষিত জ্ঞান ভান্ডারের নানা তথ্য । বর্তমান লেখকও তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ।

পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকী সাহিত্যপত্র ছাড়া রাজপরিবারের আনুকূল্যে ও প্রেরণায় বহু গ্রন্থ সংস্কৃত থেকে বাংলায় অনুবাদ করা হয়েছিল। রামায়ন, মহাভারত, ভাগবত, কৃষ্ণকর্ণামৃত প্রভৃতি গ্রন্থের উৎকৃষ্ট অনুবাদ হয়েছিল রাজাদের আদেশে । তাছাড়া বেশ কয়েকটি বৈষ্ণব কবিতার সংকলন প্রকাশিত হয়েছিল। মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য থেকে বীর বিক্রম মাণিক্য পর্যন্ত চারজন রাজা রবীন্দ্রনাথের দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। এই সময় রবীন্দ্র সাহিত্য চর্চা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল। কবি ত্রিপুরার ইতিহাসকে উজ্জ্বল করে তুলেছিলেন **"রাজর্ষি"**, **"বিসর্জন"** ও **"মুকুট "** নামে তিনটি গ্রন্থে। এছাড়াও লিখেছেন অনেক প্রবন্ধ। রবীন্দ্রনাথের নাটক 'বিসর্জন' ও 'রক্ত করবী' বহুবার ত্রিপুরার রাজপরিবারের উৎসাহে ও উদ্যোগে অভিনীত হয়েছে।

কুমার সূরেন্দ্র দেব বর্মনের প্রবন্ধ পুস্তক **'আভাষ'** ১৯০২ সালে প্রকাশিত হয়। **মহকুমা শাসক জয়কুমার বর্ধন "অদৃষ্ট চক্র"** নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। পরে **"একেই কি বলে মানুষ"** নামে একটি নাটক রচনা করেন।

১৯০৯ সালে কবি রজনী কান্ত দে **"ত্রিপুরার রাজকীর্তি"** নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই সময় উমাকান্তের শিক্ষক দীনেশ চৌধুরী **"অভিষেক"** ও **"আবির "** নামে দুখানা কবিতার বই প্রকাশ করেন।

১৯১২ সালে নীলকন্ঠ সেনের বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের **"উদয়পুর ভ্রমণ"** নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয় । ১৯১৭ সালে মহারাজ কুমার মহেন্দ্র দেববর্মণের **"পতিব্রতা"** নাটক প্রকাশিত হয় । ১৯২১ সালে প্যারী মোহন দেববর্মার **"উনকোটি তীর্থ"** নামে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় । ১৯২২ সালে কর্ণেল মহিম ঠাকুরের **"দেশীয় রাজ্য"**

গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। ১৯২৫ সালে অবিনাশ ব্যানার্জির "ত্রিপুরা গৌরব" নামে নাটকটি প্রকাশিত হয়। এই সময়ের প্রকাশিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে উমাকান্ত স্কুলের প্রধান শিক্ষক শীতলচন্দ্র চক্রবর্তীর "ঐতিহাসিক কৌতুক রহস্য", "আদি আর্য ভূমি" এবং "ত্রিপুরার প্রাচীন ইতিহাস" উল্লেখযোগ্য। মহারাজকুমার সমরেন্দ্র দেববর্মণের "ভারতীয় স্মৃতিকথা ও চিত্র", "ত্রিপুরার স্মৃতি" ও "আগ্রার চিঠি" এই তিনখানি গ্রন্থ ও বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল।

রাজন্যযুগের সাহিত্য চর্চায় বাংলা ভাষাই গুরুত্ব পেয়েছিল। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে রাধামোহন ঠাকুর "ককবরক-মা", "ত্রিপুরী ভাষাবিধান" ও "ত্রৈপুর কথামালা" এই তিনখানা গ্রন্থ রচনা করে ত্রিপুরী ভাষার লিখিত রূপ দেবার সূত্রপাত করেন। একই সময়ে সোনামুড়া বিভাগের প্রখ্যাত উকিল দৌলত আহম্মদ "কক বরমা" নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। কিন্তু রাজন্য যুগে নানা অস্থির অবস্থা সৃষ্টি হওয়ায় বিষয়টি চাপা পড়ে যায়। জনশিক্ষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ককবরক ভাষার লিখিত রূপের দাবী জোরদার হয়।

## রাজন্যযুগে নাট্য চর্চা

প্রাচীন যুগ থেকেই ত্রিপুরার রাজ পরিবারে ধর্মীয় নানা অনুষ্ঠান উপলক্ষে কীর্তন ও নৃত্যানুষ্ঠান প্রচলিত ছিল। কিন্তু যাত্রা, পালাগান ও কবিগান ইত্যাদির প্রচলন শুরু হয়, আধুনিক যুগে মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের সময় থেকে। মহারাজা বীরচন্দ্র ছিলেন সঙ্গীত রসিক। ভারতের শ্রেষ্ঠ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিল্পী ও পাণ্ডিতেরা রাজদরবারের আমন্ত্রণে রাজ্যে এসে সঙ্গীতের আসরে যোগ দিতেন। মহারাজা নিজেও ছিলেন উঁচু দরের সঙ্গীতজ্ঞ। মধুরকণ্ঠে সঙ্গীত পরিবেশন করতেন। ওস্তাদ যদুভট্ট, কাশেম আলি খাঁ, মদন মিত্র, নিশার হোসেন, কেশব মিত্র, পঞ্চানন মিত্র, ভোলানাথ বসু প্রভৃতি ভারত বিখ্যাত গুণীরা বীরচন্দ্র মাণিক্যের সভায় স্থান পেয়েছিলেন। এজন্য বীরচন্দ্র মাণিক্যকে বলা হত ত্রিপুরার বিক্রমাদিত্য। বাংলা, মনিপুরী ও ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সুরের ঝর্ণায় ত্রিপুরার রাজদরবারে সৃষ্টি হয়েছে সঙ্গীতের নতুন এক ধারা। মহারাজার উদ্যোগে ব্যয়বহুল মঞ্চ ব্যবহার করে বাংলার পাঁচমিশালী গান, কথকতা, কবির লড়াই ও কৃষ্ণলীলার অভিনয় হতো। এই সময় ত্রিপুরায় পাশ্চাত্যের প্রভাব ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

প্রকৃত পক্ষে বিংশ শতাব্দীর শুরুতে মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্যের সময়. মহারাজার আনুকূল্যে যাত্রাপালা অনুষ্ঠিত হতে থাকে। প্রাসাদ কেন্দ্রিক পরিবেশেই অভিজাত দর্শকদের সামনে পরিবেশিত হতো বাংলা ও মণিপুরী সংস্কৃতির মিশ্রণে কৃষ্ণলীলা। মণিপুরীদের রাসলীলাও ত্রিপুরায় নতুন রূপ পেয়েছে।

মহারাজা রাধা কিশোরের সময় ঢাকা ও বরিশালের যাত্রাদলের আদর্শে স্থানীয় দুটি যাত্রাদল গঠন করা হয় । দুটিই ছিল অপেশাদারী দল । একটি **কাঁসারী পট্টি যাত্রাদল** এবং অপরটি **আচার্য পাড়ার যাত্রাদল** নামে পরিচিত হয়েছিল । গ্রামাঞ্চলেও তাদের অভিনয় বিশেষ সমাদর লাভ করেছিল । তাদের অনুসরণে দুটি আদিবাসী যাত্রাদল তৈরী হয়েছিল। তারাও বাংলা নাটক পরিবেশন করে যথেষ্ট প্রশংসা অর্জন করেছিল ।

এই সময় মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্যের পৃষ্ঠপোষকতায় **"উজ্জয়ন্ত নাট্য সমাজ"** গঠিত হয়। পাশ্চাত্য রীতিতে রঙ্গ মঞ্চের ব্যবহার শুরু হয় । রাজবাড়ীতে কলকাতার স্টার থিয়েটার নিমন্ত্রিত হয়ে এসে অভিনয় করতো । স্থানীয় অভিনেতারা তাদের আদর্শ অনুসরণ করতো। মহারাজ কুমার মহেন্দ্র দেববর্মণ স্টার থিয়েটারের অনুকরণে স্বরচিত **"পতিব্রতা"** নাটকটি মঞ্চস্থ করেছিলেন।

মহারাজা বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্যের সময় উজ্জয়ন্ত নাট্য সমাজ রবীন্দ্রনাথের **"রাজা ও রাণী"** এবং **"বিসর্জন"** নাটক দুটি মঞ্চস্থ করেছিল । নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের প্রভাবে **" ত্রিপুর গৌরব"** নামে একটি দেশাত্মবোধক নাটক রচনা করে মঞ্চস্থ করা হয় । গিরিশচন্দ্র এবং অমৃতলালের নাটকও মঞ্চস্থ করা হয় । এই সংস্থার নাটক চলতো তিন দিন ধরে । প্রথম দিন বিশিষ্ট অভিজাত দর্শকদের জন্য, দ্বিতীয় দিন শুধু মহিলা দর্শকদের জন্য এবং তৃতীয় দিনের অভিনয় হতো সাধারণ নাগরিকদের জন্য । মহারাজা বীরেন্দ্র কিশোরের সময় নাটকে পাশ্চাত্য রীতির পূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল ।

বীরেন্দ্র কিশোর নিজেও **"পুষ্পবন্ত নাট্য সমাজ"** নামে একটি নাট্য সংস্থা গঠন করেন। মহারাজা নিজেই ছিলেন এই সংস্থার পরিচালক এবং সংগীতকার । বেশ কিছু উঁচু মানের নাটক মঞ্চস্থ করেছিল এই সংস্থা ।

এই সময় শহরের বাঙ্গালী, মণিপুরী ও ঠাকুর সমাজের অভিনেতারা নাট্য চর্চায় মেতে উঠেন। নানা ধরণের নাটক মঞ্চস্থ হতে থাকে। মহারাণী প্রভাবতীদেবীও একটি নাট্য সংস্থা গঠন করেন ।

১৯১৭ সালে লেবুকর্তা (ব্রজ বিহারী দেববর্মণ) সুরেন্দ্র কর্তা ও নরসিংহ কর্তার ঘরোয়া নাটকের দল **"রণবীর কর্তার থিয়েটার"** নামে একটি নাট্যসংস্থা গঠিত হয় । নাটকে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ও যন্ত্রসঙ্গীতের নানা প্রকার প্রয়োগের পরীক্ষা নিরীক্ষা করে এই সংস্থা সকলের প্রশংসা অর্জন করেছিল। ধর্ম মূলক গীতিনাট্য মঞ্চস্থ করতেই তাঁরা বেশী উৎসাহী ছিলেন। প্রায় একদশক কাল রণবীর কর্তার বাসভবনে এই সংস্থার নাট্যচর্চা চলেছিল । তাদেরই অনুপ্রেরণায় নাট্য চর্চা রাজপ্রাসাদের গন্ডী অতিক্রম করে সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল।

১৯২৩ সালে **"উমাকান্ত একাডেমী ছাত্র নাট্য সংস্থা"** ,**"বিলনীয়া ছাত্র সংস্থা"** এবং **"শ্রীপাটের তরুণ সংঘনাট্য সংস্থা"** গঠিত হয় । উমাকান্ত একাডেমী ও বিলনীয়া বি.কে আই স্কুলের প্রধান শিক্ষকগণের প্রচেষ্টায় ছাত্র ও কিশোরদের মধ্যে নাট্য চর্চার জোয়ার সৃষ্টি হয় ।

১৯২৫ সালে উমাকান্তের শিক্ষক দীনেশ চৌধুরীর রচিত **"ভীষ্ম"** নাটকটি স্কুলের হলে অভিনীত হয় । পরবর্তী কালে ভূপেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্তী, সতীশ চন্দ্র চক্রবর্তী, ইন্দুবিকাশ চৌধুরী ও অনিল দাসগুপ্ত প্রধান শিক্ষকগণের চেষ্টায় উমাকান্ত একাডেমীর ছাত্রদের নাট্য চর্চা অব্যাহত থাকে ।

বিলনীয়া বি. কে আই স্কুলের ছাত্রদের নাট্যচর্চাও অব্যাহত ছিল প্রধান শিক্ষক অক্ষয়কুমার ঘোষের উৎসাহ এবং অনুপ্রেরণায়।

এই বিদ্যালয়ের ছাত্র বিপিন বিহারী দত্ত, বিপিন বিহারী চক্রবর্তী, মহেন্দ্র পাল এবং যোগেশ দত্তের উদ্যোগে গড়ে উঠেছিল **"যোগমায়া নাট্য সমাজ"**। সে কালের নাট্যসংস্থা হিসেবে যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছিল এই নাট্য সংস্থা।

১৯২৬ সালে আগরতলায় **"ত্রিপুরা স্টুডেন্টস এসোসিয়েশন"** গঠিত হয়। তাদের নাট্যশাখা পুরানো প্রভাব কাটিয়ে নতুন নাট্যধারা সৃষ্টি করে। শিশির ভাদুড়ী গিরিশ ঘোষ এবং অহীন্দ্র চৌধুরীর প্রভাব পড়েছিল এই নাট্য গোষ্ঠীর উপর।

১৯৩৪ সাল পর্যন্ত এই নাট্য সংস্থার সৃষ্টিশীল ধারা অব্যাহত ছিল। এই সময় **"রণবীর কর্তার থিয়েটার"** গ্রুপটির প্রায় অবলুপ্তি ঘটেছিল।

**"ত্রিপুরা স্টুডেন্টস এসোসিয়েশনের"** অভিনেতারাই অল্প খরচে আকর্ষনীয় মঞ্চসজ্জার ব্যবস্থা করে মহকুমা স্তরে নাট্য চর্চা ছড়িয়ে দেন।

১৯২৮ সালে মহারাজা বীর বিক্রমের উদ্যোগে **"ত্রিপুর নাট্য সম্মেলনী"** নামে একটি নাট্য সংস্থা গড়ে উঠে। বাংলা ও মণিপুরী সংলাপ দিয়ে কয়েকটি গীতিনাট্য রচনা ও মঞ্চস্থ করে মহারাজা বীরবিক্রম মাণিক্য নাট্য প্রতিভার পরিচয় দেন।

১৯৩৪ সালে মহারাজা বীর বিক্রম মাণিক্যের রচিত ও পরিচালিত গীতিনাট্য **"শ্রী রাধাকৃষ্ণ লীলা বিলাস"** কলকাতার ত্রিপুরা হাউসে মঞ্চস্থ হয়েছিল। আমন্ত্রিত বিশিষ্ট অতিথিরা উচ্ছাসিত প্রশংসা করেছিলেন। নৃত্যগীতপ্রধান মণিপুরী রীতির ধর্মমূলক গীতিনাট্যগুলো খুব জনপ্রিয় হয়েছিল । মহারাজার অর্থানুকুল্যে মঞ্চসজ্জা, রূপসজ্জা ও আলোক সজ্জায় অভিনবত্ব সৃষ্টি করেছিলেন দক্ষ শিল্পী ও কারিগরেরা। নাটকের অর্কেস্ট্রা

পার্টি ছিল উন্নত মানের। খ্যাতিমান শিল্পী অনিল কৃষ্ণ ঠাকুরের নেতৃত্বে বঙ্কিম বিহারী দেববর্মণ, হেমন্ত কিশোর দেববর্মণ এবং বিপিন বিহারী দেববর্মণ সঙ্গীত বিভাগটিকে খুবই সমৃদ্ধ করে তুলেছিলেন। সাতবছর অবিরাম নাট্য চর্চার পর এই নাট্য সংস্থাটির অবলুপ্তি ঘটে।

১৯৩৬ সালে রাজমন্ত্রী রাণা বোধজং বাহাদুরের পৃষ্ঠপোষকতায় **"মাতৃমন্দির"** নামে একটি নাট্যসংস্থার আবির্ভাব ঘটে। নবীন ও প্রবীন অভিনেতা ও শিল্পীদের সমন্বয়ে এই সংস্থা পরবর্তী কালে **"ত্রিপুর শিল্পায়তন"** নামে নাট্য সংস্থায় রূপান্তরিত হয়। প্রখ্যাত অভিনেতা ও পরিচালক ত্রিপুরেশ মজুমদারের নেতৃত্বে এই সংস্থা বহু প্রগতিশীল নাটক মঞ্চস্থ করেছিল।

১৯৩৮ থেকে ১৯৪৪ সালের মধ্যে কিশোরদের মধ্যেও নাট্য চর্চা ছড়িয়ে পড়ে। বিশ্বযুদ্ধের প্রভাবে বেশ কয়েক বছর নাট্য চর্চায় ভাঁটা পড়েছিল।

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর হাজার হাজার উদ্বাস্তু আগমনের ফলে নতুন পরিস্থিতি দেখা দেয়। বহু নাট্য শিল্পী, সঙ্গীত শিল্পী ও অভিনেতার আগমনে ত্রিপুরায় নাট্যচর্চায় নবযুগের সূত্রপাত হয়। রাজন্যযুগের অবসানের পর নব নাট্য আন্দোলনের ধারা শক্তিশালী হয়ে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।

নাট্যজগতে আধুনিক নানা ধারা যুক্ত হয়ে বহুমুখী পরীক্ষা নিরীক্ষার যুগ শুরু হয়। এতদিন যাবত নারীর ভূমিকায় পুরুষেরাই অভিনয় করতেন। এই সময় বহু শিক্ষিতা মহিলা নারীর ভূমিকায় অভিনয় করতে এগিয়ে আসেন।

রাজন্য যুগের শেষ মুহূর্ত পর্যন্তও নাটক করার মত কোন স্থায়ী মঞ্চ রাজ্যের কোথাও ছিলনা। স্কুলে, মন্দির প্রাঙ্গনে বা কারও বাড়ীর বাগানে অস্থায়ী মঞ্চ তৈরী করে নাটক মঞ্চস্থ করা হতো।

## রাজন্য যুগের জনগণনা

ত্রিপুরায় প্রাচীন ও মধ্যযুগে জনগণনার কোন ব্যবস্থা ছিলনা। প্রজাদেরও স্থায়ী বসতি ছিলনা। জুমিয়া প্রজারা কয়েকবছর পর পরই অস্থায়ী বসতি বদল করত। জুম চাষের জন্য নতুন এলাকা নির্বাচন করার পর নতুন এলাকায় বসতি স্থানান্তরিত হতো। রাজ্যের সীমানাও নির্দিষ্ট ছিলনা। গারো পাহাড়, শিলং পাহাড়, লুসাই পাহাড়, কাছাড় পাহাড়, পার্বত্য ত্রিপুরা ও পার্বত্য চট্টগ্রাম হয়ে আরাকান পর্যন্ত জুম চাষীদের অবাধ যাতায়াতের সুযোগ ছিল। কাজেই স্থায়ী প্রজার হিসাব নেওয়া সম্ভব ছিলনা। মহারাজার

অধীনস্থ অঞ্চলের প্রতিটি সম্প্রদায়ের সর্দাররা যার যার এলাকার ঘর চুক্তি কর আদায় করে বছরে একবার রাজার দরবারে মিলিত হয়ে জমা দিতে বাধ্য ছিল । বছরে একবারই শুধু প্রজাদের খবরা খবর সর্দারদের মারফতে রাজদরবারে পেশ করা হতো ।

রাজ্যের রাজস্ব বৃদ্ধির প্রয়োজনেই প্রজাদের সম্পর্কে বিস্তারিত খবর জানার জন্য বৃটিশ সরকার উদ্যোগী হয়। ভারতের সমস্ত দেশীয় রাজ্যে ১৮৭১ সালে পলিটিক্যাল এজেন্ট নিয়োগ করে দেশীয় রাজাদের প্রশাসনিক কাজ কর্মে হস্তক্ষেপ শুরু হয়। ঠিক একবছর পর ১৮৭২ সালে ভারত সাম্রাজ্যের সর্বত্র লোকগণনার কাজ শুরু করার জন্য বৃটিশ সরকার নির্দেশ পাঠায়। তদনুযায়ী ত্রিপুরায়ও ১৮৭২ সালে প্রথম লোকগণনার কাজ শুরু হয়।

প্রাচীন ইতিহাস থেকে জানা যায় সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত দুই হাজার তিনশ বছর আগে সাম্রাজ্যের সর্বত্র লোকগণনার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু ভারতের ইতিহাস কোন একটি রাজবংশের অধীনে দীর্ঘদিন থাকেনি। অসংখ্য বিদেশী আক্রমণে বারবার ধ্বংস লুণ্ঠন ও বিপর্যয়ের পর নতুন শাসন ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে । আবার ভেঙ্গেছে আবার গড়েছে । ইতিহাসের এই দোলাচলে ভারতের সমাজ জীবনে বিচিত্র ধারার মিলন ঘটেছে। প্রায় দুই হাজার বছর আগে ভারতের লোক সংখ্যা ছিল মাত্র এক কোটি । বর্তমানে ভারত-পাকিস্থান-বাংলাদেশ মিলে লোকসংখ্যা দাঁড়িয়েছে একশ বিশ কোটি । ১৮৭২ সালে ত্রিপুরায় কোন রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব ছিলনা । জনগণনার নির্দেশ জারি হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রজাদের মধ্যে একটা আতংক দেখা দিয়েছিল। রাজ্যের সর্বত্র ছিল দুর্গম জঙ্গলাকীর্ণ অবস্থা। এমনকি রাজধানী আগরতলার চারপাশেও ছিল দুর্গম জঙ্গল। গ্রামাঞ্চলে সব মানুষই ছিল নিরক্ষর। এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামের দূরত্ব ছিল অনেকটাই দুর্গম পথ। কাজেই জনগণনার কাজ প্রধানত সর্দারদের সাহায্যেই সম্পন্ন করতে হয়েছে । রাজ্যের প্রশাসনে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষিত ও দক্ষ কর্মীও ছিল না। জনগণনা সম্পর্কে কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা কারোরই ছিলনা। ফলে জনসংখ্যার একটা ধারণা পাওয়া গেলেও জনগণের পেশা, বয়স, আর্থিক অবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ সংগৃহীত হয়নি । জনগণকে বিষয়টা বোঝাতে অনেকটা বেগ পেতে হয়েছিল ।

১৮৭২ সালের জনগণনায় ত্রিপুরার লোকসংখ্যা ছিল ৩৫,২৬২ জন । এর মধ্যে বাঙ্গালী হিন্দু, বাঙ্গালী মুসলমান ও মণিপুরীর সংখ্যা ছিল ১৪৫০০ জন, ত্রিপুরী১০,০০০ জন, জমাতিয়া ২২০০ জন, নোয়াতিয়া ১৫০০ জন, রিয়াং ৩৩০০ জন, হালাম ১০০০ জন, কুকী ২০০০ জন, অন্যান্য ৭৬২ জন ।

ইংরেজ কর্তৃপক্ষের বার্ষিক রিপোর্টে সমগ্র ত্রিপুরাকেই গভীর জঙ্গল বলে উল্লেখ

করা হয়েছে। প্রথম জনগণনায় ঘরচুক্তি পরিবার সংখ্যা ছিল ২৬৩৪ ঘর চুক্তি কর দিতে হয়না এরূপ পরিবার ছিল ৯২৫। এই সময় জামিদারী এলাকার বাঙ্গালী প্রজাদের ত্রিপুরা রাজ্যে স্থায়ী বসতি স্থাপনের জন্য নানা রকম সুযোগ সুবিধা সহ উৎসাহ দেওয়া হয়। কিন্তু রাজধানী আগরতলা সহ রাজ্যের সর্বত্র ভয়ানক ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, যক্ষা, বসন্ত ও কলেরা রোগের নিয়মিত আক্রমণ এবং চিকিৎসার সুযোগ সুবিধা না থাকায় বাঙ্গালীরা স্থায়ী বসতি স্থাপনে উৎসাহ বোধ করেনি। গরীব মুসলমান কৃষকেরা জমির লোভে দলে দলে এসেছে। কিন্তু স্থায়ী ভাবে বসতি গড়েনি। এদেরকে বলা হত জিরাতিয়া প্রজা। কৃষিকাজের সময় খামার করে বাস করতো, ফসল নিয়ে সমতল অঞ্চলে নিজ নিজ বাড়ীতে চলে যেত। আবার চাষের মরসুমে ফিরে আসতো।

১৮৮১ সালের জনগণনায় লোক সংখ্যা ছিল ৯৫৬৩৭ প্রতি দশ বছরে নিয়মিত জনগণনার কাজ চালু হওয়ার পর জনসংখ্যার নিম্নরূপ বিবরণ পাওয়া যায়।

| বছর | লোকসংখ্যা |
|---|---|
| ১৮৭২ খ্রী: | ৩৫২৬২ |
| ১৮৮১ খ্রী: | ৯৫৬৩৭ |
| ১৮৯১ খ্রী: | ১৩৭৪৪২ |
| ১৯০১ খ্রী: | ১৭৩,৩২৫ |
| ১৯১১ খ্রী: | ২২৯,৬১৩ |
| ১৯২১ খ্রী: | ৩০৪,৪৩৭ |
| ১৯৩১ খ্রী: | ৩৮২,৪৫০ |
| ১৯৪১ খ্রী: | ৫১৩,০১০ |

- রাজন্য যুগের শেষ গণনা।

১৯০১ সালের জন গণনাকে বৃটিশ সরকার বিশুদ্ধ নিয়ম অনুযায়ী তৈরী বলে স্বীকৃতি দিয়েছিল। পূর্ববর্তী গণনার বিশুদ্ধতা সম্পর্কে বিভিন্ন মহলে নানা রকম সমালোচনা ছিল।

১৯০১ সালে রাজ্যের রাজধানীকেই শুধু নগর বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। বাকী ছয়টি বিভাগ ধর্মনগর, কৈলাসহর, খোয়াই, সদর, উদয়পুর ও বিলনীয়া সহ সারা রাজ্যে মোট ১৪৬৩টি গ্রাম ছিল। মোট ১৭৩,৩২৫ জন লোকের মধ্যে উপজাতি হিন্দুর সংখ্যা

ছিল ১০৪,১২০ জন, উপজাতি খৃষ্টান সংখ্যা ছিল ১৩৭ জন। বাঙ্গালী হিন্দুর সংখ্যা ছিল ১৫০৭২ জন। বাঙ্গালী মুসলমান সংখ্যা ছিল ৪৪৬১৭ জন। এসময় বারঘর ঠাকুরদের আলাদা তালিকা তৈরী হয়। বলা হয় মহারাজা ত্রিলোচনের ১২ জন পুত্র ছিল। তাদের বংশধররা বারঘর ঠাকুর নাম পরিচিত হয়েছে। তাদের সংখ্যা ছিল ১২৫৬ জন। পঞ্চ ত্রিপুরা সম্পর্কে বলা হয়েছে পুরান ত্রিপুরা, দেশী ত্রিপুরা, জমাতিয়া, নোয়াতিয়া ও রিয়াং এই পাঁচটি সম্প্রদায় পঞ্চ ত্রিপুরী নামে পরিচিত। কিন্তু তাদের মধ্যে বিবাহ এবং আহারাদি সামাজিক সম্পর্ক নেই। পুরান ত্রিপুরীরা ক্রমশ সভ্য হচ্ছে এবং সামাজিক আচার ব্যবহারে ঠাকুর লোকদের অনুকরণ করছে। বিবাহ সূত্রে যে সব বাঙ্গালীরা ত্রিপুরী সমাজে প্রবেশ করেছে তারাই দেশী ত্রিপুরী নামে পরিচিত হয়েছে।

১৯০১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে বলা হয়েছে কুকী পুরুষেরা উলঙ্গ থাকে। নারীরা অর্দ্ধহস্ত চওড়া পাছড়ায় লজ্জা নিবারণ করে, বাকী অঙ্গ অনাবৃত থাকে। কুকীদের যে অংশ প্রথম ত্রিপুরার মহারাজার বশ্যতা স্বীকার করেছিল তারাই হালাম নামে পরিচিত হয়েছে। ত্রিপুরীদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে থাকায় তাদের ভাষা ও আচার আচরন বদলে গেছে। হালামদের একটি দফা মরছুম নামে পরিচিত। মরছুম শব্দের অর্থ হল সত্যবাদী। আরেকটি দফা অর্থাৎ শাখা হল কলই। মহারাজার হরিদ্রার বোঝা বহন করত বলে কলই (অর্থাৎ হরিদ্রা) নামে পরিচিত হয়েছে। আরেকটি দ ফা হল রাংখল। রাং শব্দের অর্থ হল রৌপ্য মুদ্রা। রৌপ্যমুদ্রা পরিধান করে বলে রাংখল নামে পরিচিত হয়েছে। আরেক দফা রাজবাড়ীর সংবাদ বাহকের কাজ করত বলে রূপিণী নামে পরিচিত হয়েছে। এরূপে বিভিন্ন কর্ম ভিত্তিক দফা সৃষ্টি হয়েছে।

চাকমা এবং মগ সম্প্রদায় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী এবং আচার ব্যবহারে প্রায় এক রকম। তাদের মধ্যে বাল্য বিবাহ প্রথা নেই। জুম চাষ এবং হলকর্ষন দুরকম কাজেই এরা অভ্যস্ত হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে তারা গত একশ বছরের মধ্যে ত্রিপুরায় প্রবেশ করেছে।

১৯০১ সালে রাজ্যে সর্বমোট রাজকর্মচারীর সংখ্যা ছিল ৬৯৯ জন। চাষী প্রজা ৩০,১০২ জন, জুমিয়া প্রজা ৪৬০২৭ জন এবং কৃষি মজুরের সংখ্যা মাত্র ৪১১ জন। গৃহস্থালী কাজে ঝি চাকবের সংখ্যা ৭০৩ জন, হোটেল ব্যবসায়ী ৬ ছয়জন। ছোট ছোট ফেরিওয়ালা ব্যবসায়ী ৫৮০ জন। সারা রাজ্যের পার্বত্য অঞ্চলে শিক্ষিতের সংখ্যা ছিল ২৫৮ জন।

উপজাতি প্রজাদের মধ্যে পঞ্চ ত্রিপুরা ৭৫,৭৮১ জন, কুকী ৭৫৪৭ জন, হালাম ২২১৫ জন, চাকমা ৪৫১০ জন, মগ ১৪৯১ জন, লুসাই ১৩৫ জন, এবং মণিপুরীদের

সংখ্যা ছিল ১২,৮৫১ জন ।

১৯৩১ সালের জনগণনায় রাজ্যের জনসংখ্যা ছিল ৩৮২৪৫০ জন। এই সময় প্রকৃত প্রজা ও জিরাতিয়া প্রজা পৃথক করা হয় । প্রকৃত প্রজার সংখ্যা ছিল ২৭৪৬১০ জন এবং জিরাতিয়া প্রজার সংখ্যা ছিল ১১৪,৪৮৩ জন। এদের অধিকাংশই ছিল মুসলমান।

১৯৩১ সালে পঞ্চ ত্রিপুরা অর্থাৎ পুরান ত্রিপুরা, দেশী ত্রিপুরা, জমাতিয়া, নোয়াতিয়া ও রিয়াং সম্প্রদায়কে রাজবংশীয় ক্ষত্রিয় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এদের মোট সংখ্যা ছিল ১৬১,০০৫ জন। এছাড়া চাকমা, মগ, হালাম, কুকীদের সংখ্যা ছিল ২৯৫৮৬ জন ।

১৯৪১ সালের রাজন্য যুগের শেষ জনগণনায় রাজ্যের লোক সংখ্যা ছিল ৫১৩০১০ জন । তার মধ্যে উপজাতি সংখ্যা ছিল ২৫৬,৯৯১ জন। এই সময় ঢাকার রায়পুর দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত বহু বাঙ্গালী হিন্দু ত্রিপুরায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। তাদের অধিকাংশই ত্রিপুরায় স্থায়ী বসতি গড়ে তোলে। মহারাজা বীরবিক্রম মাণিক্য উদারভাবে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেন ।

## রাজন্য যুগের পুরসভা

রাজন্য যুগের ত্রিপুরায় নগর সভ্যতা একমাত্র রাজধানীতেই সীমাবদ্ধ ছিল। প্রকৃত নগর জীবন রাজধানীতেও বিকশিত হয়নি। ১৮৭১ সালে বৃটিশ পলিটিক্যাল এজেন্ট নিযুক্ত হয়ে ডব্লিও. বি.পাওয়ার সাহেব আগরতলায় এসে অফিস খুলেন। তখন রাজধানীতে ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর ,কলেরা ও বসন্ত রোগের নিয়মিত আক্রমণ হতো। পাওয়ার সাহেব প্রথমেই রাজধানীতে একটি পুরসভা গঠন করে নগরের স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা করতে মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যকে পরামর্শ দিলেন।

১৮৭২ সালে পলিটিক্যাল এজেন্ট পাওয়ার সাহেবকে সভাপতি করে একটি পুরসভা গঠন করা হয়। নগরের তিন বর্গমাইল এলাকা পুরসভার অন্তর্ভুক্ত করা হয় । মহারাজার তহবিল থেকে মঞ্জুরীকৃত অর্থ দিয়ে রাস্তা ড্রেন ও নগর সংরক্ষণের কাজ শুরু হয় ।

পলিটিক্যাল এজেন্টের রিপোর্ট থেকে জানা যায় প্রকৃত পক্ষে ১৮৭৪ সালে পুরসভা সঠিকভাবে কাজ শুরু করেছে। পুরআইন বলে কর আদায় শুরু হয়। প্রথম বছর নাগরিকদের কাছ থেকে কর বাবত পাওয়া যায় মাত্র ৩২৪ (তিনশ চব্বিশ) টাকা এবং

মোট খরচ হয় ৯৫২ টাকা ৪ আনা। নগরের নাগরিক বলতে মহারাজার আত্মীয়স্বজন ঠাকুর পরিবারগুলো এবং মহারাজার কিছু কর্মচারী ও কিছু সংখ্যক দোকানদার।

১৮৮৬ সালে পুরসভার পরিচালক হিসেবে মহারাজকুমার সমরেন্দ্র দেববর্মণকে চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হয়।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্য পলিটিক্যাল বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত কার্যকারক বঙ্গচন্দ্র ভট্টাচার্যকে পুরসভার চেয়ারম্যান নিযুক্ত করেন।

১৯০৬ সালে আবার পুলিশ সুপার পূর্ণচন্দ্র রায় বাহাদুরকে পুরসভার দায়িত্ব দেওয়া হয়।

১৯০৯ সালে পুরএলাকার প্রধান সমস্যা হিসেবে স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থাকে প্রধান্য দেওয়া হয়। ফলে স্বাস্থ্য অধিকর্তা মণিময় মজুমদারকে পুরসভার সভাপতি নিযুক্ত করা হয়। নগর এলাকায় পানীয় জলের একমাত্র উৎস হিসেবে কয়েকটি দীঘি ও পুকুর সংরক্ষিত করা হয়।

১৯১২ খৃষ্টাব্দে মহারাজা বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্যের সময় পুরআইন প্রয়োগের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়। বিশিষ্ট সাতজন উচ্চ পদস্থ রাজকর্মচারীকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়। ডাক্তার মণিময় মজুমদারকে চেয়ারম্যান এবং ডাক্তার অধর চন্দ্র ভট্টাচার্যকে ভাইস চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হয়।

১৯২০ সালে পুরসভা পরিচালনার জন্য ৯ জন কমিশনার নিযুক্ত করা হয়। ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি আইন তৈরী করা হয়।

সে সময় ১৪২৮ জন ব্যক্তির আয়ের ভিত্তিতে ৫১১টি বাড়ীর উপর ল্যাট্রিন কর ধার্য করা হয়। এর থেকে পুরসভার আয় হয় ৬০৩৯ টাকা। পানীয়জল সংরক্ষণের জন্য মহারাজার অনুদান দিল ৫২০০ টাকা।

১৯২৩ সালে মহারাজার অনুদান বৃদ্ধি পেয়ে ৯০০০ নয় হাজার টাকা হয়। পুরসভার মোট খরচ হয় ১৬,১৯৫ টাকা। এবছর ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বর ব্যাপকভাবে দেখা দিয়েছিল। এই সময় পর্যন্ত ডাক্তার মণিময় মজুমদার পুরসভার চেয়ারম্যান ছিলেন।

১৯২৬ সালে পুরসভার চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন ব্রজেন্দ্র কুমার চট্টোপাধ্যায়। তিনি স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য কয়েকটি নির্দেশ জারি করেন। তারমধ্যে প্রধান দুটি বিষয় ছিল ঃ-

১) প্রত্যেক বাড়ির আগাছা কেটে পরিষ্কার রাখতে হবে ।

২) বাড়ীর যে সব গাছ আলো বাতাস প্রবেশের পক্ষে বাধা সৃষ্টি করে সেগুলি

কেটে ফেলতে হবে।

১৯৩৪ সালে পুরসভার অধীনে লোকসংখ্যা ছিল দশ হাজার ।এই সময় দেওয়ান সোমেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মাকে চেয়ারম্যান এবং হরিদাস ভট্টাচার্যকে ভাইস চেয়ারম্যান করা হয়। এই সময় ৯ জনের পুর কমিটি বাজার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা হাতে নেয়। এবছর ২৫ জন কলেরারোগে আক্রান্ত হয় এবং ৯ জন মারা যায় ।এছাড়া বসন্ত রোগে মারা যায় ৩ জন। প্রবল বন্যায় আগরতলা শহর ৩৬ ঘন্টা জলমগ্ন ছিল। বন্যা কবলিত নাগরিকদেব আশ্রয় শিবিরে স্থান দেওযা হয়। খাদ্য পানীয় জল এবং ঔষধ বিতরণ করা হয়। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের ঘরমেরামতের জন্য সাহায্য দেওয়া হয় ।

সরকারী দলিল থেকে জানা যায় যে ১৯১৪ সালে পুরসভা এলাকায় নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্রের দাম নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় । মধ্যযুগে রাজধানী উদয়পুরে সমসের গাজী এরূপ ব্যবস্থা করেছিলেন ।

## ১৯১৪ সালে জিনিষ পত্রের দাম ছিল নিম্নরূপ

| | | |
|---|---|---|
| আতপ ও সিদ্ধ চাউল | এক টাকায় | সাতসের |
| দুধ | এক টাকায় | দশসের |
| ঘী | এক টাকা পাঁচ আনায় | একসের |
| চিনি | পাঁচ আনায় | একসের |
| লবণ | চার পয়সায় | একসের |
| সরিষার তেল | নয় আনায় | একসের |
| কেরোসিন তেল | ছয় পয়সায় | একবোতল |
| ময়দা | পনের পয়সায় | একসের |
| সুজি- বাতাসা | পাঁচ আনায় | একসের |
| গুড় | বার পয়সায় | একসের |
| মুগ, মশুরী, বুট ও মটর ডাল | দশ পয়সায় | একসের |
| আলু, পেয়াঁজ ,ধনিয়া | তিন আনায় | একসের |
| শুকনা লংকা | সাত আনায় | একসের |

- ইত্যাদি

১৯৩৪ সালে পুর এলাকায় গাড়ী চালাবার জন্য ট্যাকস আদায়ের ব্যবস্থা হয়। ১৯৩৫ সালে গরু মহিষের গাড়ীর উপর ট্যাকস ধার্য করা হয়। চার (৪) টাকা বার্ষিক ট্যাক্স দিলে লাইসেন্স দেওয়া হতো। ১৯৩৭ সালে পুর এলাকায় জন্ম মৃত্যুর হিসাব রাখার ব্যবস্থা চালু হয়। এই সময় পুরসভাকে ছয়টি ওয়ার্ডে ভাগ করা হয়। ছয় জন নির্বাচিত কমিশনার এবং ছয়জন রাজমন্ত্রীর দ্বারা মনোনীত কমিশনার মোট ১২ জন কমিশনারের পুরসভা কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি থেকে চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচন করা হয়।

১৯৪৫ সালে দৈনিক বাজারের নাম মহারাজার আদেশে 'মহারাজগঞ্জ' রাখা হয়।

১৯৪৯ সালে রাজন্য যুগের সর্বশেষ চেয়ার ম্যান নিযুক্ত হন রমেন্দ্র কিশোর দেববর্মণ (ননী কর্তা)। এই সময় পুরসভার আয় হয়েছিল ৭৪৬১০ টাকা এবং খরচ হয়েছিল ৪৮২৯২ টাকা।

## সপ্তম অধ্যায়

# প্রজাতান্ত্রিক ভারতের মূলস্রোত ত্রিপুরা

১৯৪৯ সালের ১৫ ই অক্টোবর আনুষ্ঠানিক ভাবে ত্রিপুরা ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং সাংবিধানিক পদ্ধতিতে ত্রিপুরায় রাজতন্ত্রের অবসান হয়।

১৯৫০ সালের ২৬ শে জানুয়ারী সারা ভারতের সঙ্গে ত্রিপুরায়ও ঘরে ঘরে জাতীয় উৎসবের আকারে প্রথম প্রজাতান্ত্রিক দিবসটি পালিত হয় ।

১৯৪১ থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত একের পর এক ঢেউ এর মত দাঙ্গাপীড়িত বাঙ্গালী হিন্দু উদ্বাস্তুরা ত্রিপুরায় আশ্রয় নিতে থাকে। পরিস্থিতি ক্রমেই জটিল রূপ ধারণ করে।

বৃটিশ ভারতের সঙ্গে ত্রিপুরা রাজ্যের অবাধ যোগাযোগ ও যাতায়াতের যে সুযোগ ছিল তা হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়। ভারতের সঙ্গে যোগাযোগের অন্য কোন রাস্তাও তখন ছিলনা। আকাশপথই হল ভারতের মূল ভূখন্ডের সঙ্গে যাতায়াতের ও যোগাযোগের এক মাত্র উৎস। সব রকম জিনিষ পত্র প্রায় দুষ্প্রাপ্য অথবা দুর্মূল্য হয়ে গেল।

অন্যদিকে নিঃস্ব উদ্বাস্তু পরিবার গুলোর অসহায় জীবন এক ভয়াবহ সংকট রূপে দেখা ছিল।

দেশ বিভাগের ফলে চাকলা রোশনাবাদের জমিদারী ত্রিপুরা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় রাজ্যের অর্থনীতি সম্পূর্ণরূপে কেন্দ্রীয় ভারত সরকারের উপর নির্ভরশীল হয়ে গেল।

প্রজাতান্ত্রিক ভারতের অঙ্গরূপে রাজ্যের সীমান্তরক্ষা করা, আইন শৃংখলা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, নাগরিকদের আর্থিক দায় দায়িত্ব বহন করা ইত্যাদি দায়িত্বভার সংবিধানের নির্দেশ অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারকে নিতে হয়েছে।

রাজ্যে নাগরিক জীবনের উন্নয়নের কোন পরিকাঠামো ছিল না। শিক্ষা, স্বাস্থ্য যোগাযোগ, প্রশাসন সব কিছুই নতুন করে গড়ে তোলার প্রশ্ন জরুরী হয়ে উঠেছিল।

সমাজ পরিবর্তনের এই যুগ সন্ধিক্ষণে জাতীয় রাজনৈতিক দলের দায়িত্ব পালনের জন্য দুটি প্রধান দল ত্রিপুরায় গড়ে উঠেছিল । প্রথমটি হল জাতীয় কংগ্রেস দ্বিতীয়টি হল সি.পি.আই। দুটি দলেরই গণভিত্তি শক্তিশালী ছিল ।

কংগ্রেস দলের হাতে ভারতের শাসন ক্ষমতা হস্তান্তরিত হওয়ায় কংগ্রেস দল

শাসকদল হিসেবে সারা রাজ্যে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে। প্রশাসনের উপরও দলের প্রভাব সহজেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

অন্যান্য ছোট ছোট দলগুলো উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের দাবীতে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। ফলে রাজ্যে রাজতন্ত্রের পরিবর্তে সরকারী ক্ষমতা সম্পন্ন শাসক কংগ্রেস দল এবং সরকারী নীতির সমালোচক বিরোধী দলগুলোর মধ্যে সংঘাতের এক জাতীয় প্রবাহ সৃষ্টি হয়েছিল। ভারতীয় প্রজাতন্ত্রে বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক নীতি ও আদর্শের সংঘাতই হল মূলস্রোত। জনগণের দ্বারা, জনগণের জন্য, জনকল্যাণমুখী জনমত গঠন এবং জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠাই হল সবরকম রাজনীতির মূল লক্ষ্য। ভারতের অঙ্গরাজ্য ত্রিপুরায় গণতান্ত্রিক দাবীতে আন্দোলনের নেতৃত্ব দেবার দায়িত্ব এসে পড়েছিল সি.পি.আই দলের উপর। সৌভাগ্য বশতঃ এই দলে যোগ্য নেতৃত্বের অভাব ছিল না।

## কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বিংশ শতাব্দীর ত্রিপুরা' গ্রন্থটি (১ম ও ২য় খন্ড) রচনায় নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলো থেকে বহু তথ্য ও উপাদান গ্রহণ করে উপকৃত হয়েছি। এসব গ্রন্থ পাঠের ফলে একটি নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীও অর্জন করেছি। সে জন্য সহায়ক গ্রন্থগুলোর লেখকদের কাছে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি। যাদের কাছ থেকে গ্রন্থের প্রয়োজনীয় ছবিগুলো সংগৃহীত হয়েছে তাদের প্রতিও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

## গ্রন্থ-পঞ্জী

১) বিশ্ব ইতিহাস প্রসঙ্গ - পন্ডিত জহরলাল নেহেরু

২) পৃথিবীর ইতিহাস - দেবী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায ও রমাকৃষ্ণ মৈত্র ৩) মানব সমাজ - মিখাইল নেস্তুর্খ

৪) সাংস্কৃতিক ইতিহাস প্রসঙ্গ - ড: দীনেশ চন্দ্র সরকাব

৫) প্রাগৈতিহাসিক ভারত - ড: অতুল সুর

৬) হিন্দু সভ্যতার নৃতাত্ত্বিক ভাষ্য - ড: অতুল সুর

৭) বাজ মালা - কৈলাস চন্দ্র সিংহ

৮) বাজমালা - ১ম-২য়-৩য় খন্ড - কালীপ্রসন্ন সেন

৯) ত্রিপুরাব রাজমালা - পুবঞ্জন প্রসাদ চক্রবর্তী

১০) কৃষ্ণমালা - রামগঙ্গা বিশারদ

১১) গাজী নামা - মনোহর সেখ

১২) ত্রিপুবাব ইতিকথা - কৃষ্ণপদ দত্ত

১৩) ত্রিপুবার রূপকথা - শক্তিপদ চক্রবর্তী

১৪) জুম থেকে জমি - সত্য দাস.চক্রবর্তী

১৫)ত্রিপুর কথা মালা - বাধামোহন ঠাকুব

১৬) দেশীয বাজ্য - কর্ণেল মহিম চন্দ্র দেববর্মণ

১৭) জুম ও জমি - সচ্চিদানন্দ ধর

১৮) ত্রিপুরাব স্মৃতি - সমবেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা

১৯) বাজগী ত্রিপুরার সরকাবী বাংলা - শিক্ষা অধিকাব ত্রিপুবা

২০) বাজগী ত্রিপুরার সংবাদ পত্র - বমাপ্রসাদ দত্ত

২১) ববীন্দ্র সাহিত্যে ত্রিপুবা - বিকচ চৌধুরী

২২) মাণিক্য শাসনাধীন ত্রিপুবাব ইতিহাস - নলিনী বঞ্জন বায চৌধুবী

২৩) ত্রিপুবাব ইতিহাস - ড. জগদীশ গণচৌধুবী

২৪) সমাজ ও সভ্যতাব ক্রমবিকাশ - রেবতী বর্মণ

২৫) ত্রিপুব দেশেব কথা - ত্রিপুব সেন

২৬) উদযপুব বিবরণ - ব্রজেন্দ্র চন্দ্র দত্ত

২৭) ইতিহাসের আলোকে কিশোর রাজমালা - ড. জ্যোতিয দত্ত

২৮) তথ্য পঞ্জী নির্দেশিকা - ত্রিপুবা দর্পণ

২৯) ভারতীয় সমাজ - এস.বি.দুবে

৩০) ত্রিপুরাব আদিবাসী জীবন ও সংস্কৃতি - সুবেন দেববর্মণ

৩১) ত্রিপুবায উপজাতি সমাজ সংস্কৃতি - পশুপতি মাহাতো

৩২) ত্রিপুরার সমাজ সংস্কৃতি ও সন্ত্রাসবাদ - সরোজ চন্দ ও সত্যব্রত চক্রবর্তী

৩৩) ত্রিপুরাব রবীন্দ্র সংস্কৃতি - রমাপ্রসাদ দত্ত

৩৪) ঐতিহ্য ও ইতিহাসের পটে ত্রিপুবা ১ম খন্ড- রমাপ্রসাদ দত্ত

৩৫) ইতিহাস ও ঐতিহ্যের পটে ত্রিপুরা ২য খন্ড - রমাপ্রসাদ দত্ত

৩৬) রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা - ত্রিপুরা আঞ্চলিক শতবার্ষিকী সমিতি

৩৭) ককবরক ও বাংলা ভাষার সম্পর্ক - দীপক কুমার চক্রবর্তী

৩৮) বাংলা ও ককবরক একটি তুলনামূলক আলোচনা - প্রভাস চন্দ্র ধর

৩৯) ককবরক লিপি বিতর্ক - কুমুদ কুন্ডু চৌধুরী

৪০) ককবরকের উৎস সন্ধানে - শান্তিময় চক্রবর্তী

৪১) ত্রিপুরা ত্রিশ থেকে আশি - জীবন চক্রবর্তী

৪২) ত্রিপুরার মিশ্র সংস্কৃতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ - ধবলকৃষ্ণ দেববর্মা

৪৩) প্রসঙ্গ ধর্ম ও জাত পাত - বিমল গুপ্ত

৪৪) ধর্ম প্রসঙ্গে - কার্লমার্কস ও এঙ্গেলস

৪৫) প্রাচীন ত্রিপুরী লোকসংগীত সংকলন - গবেষণা অধিকার

৪৬) স্বাধীনতা সংগ্রামে সশস্ত্র বিপ্লবীদের ভূমিকা - সুধাংশু দাসগুপ্ত

৪৭) আইন-ই-আকবরী - পাঁচ কড়ি বন্দোপাধ্যায়

৪৮) চীনের রূপ রেখা - ছি ওয়েন

৪৯) ভারত বিভাগ ও ইতিহাসের স্বপ্ন ভঙ্গ - সুকুমার সেন

৫০) উজ্জয়ন্ত - শতবর্ষ স্মরণিকা কমিটি

৫১) ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত - জিতেন্দ্র চন্দ্র পাল

৫২) তথ্যের আলোকে রাজ আমলে ত্রিপুরা ( ১ম খন্ড ) - রাখাল মজুমদার

৫৩) ভারতের ধর্মীয় মৌলবাদ ও উপমহাদেশের সমস্যা - শ্যামল চৌধুরী

৫৪) সাম্রাজ্যবাদীদের আগ্রাসন ও আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ - শ্যামল চৌধুরী

৫৫) তথ্যের আলোকে রিয়াং শরণার্থী - নিরঞ্জন চাকমা

৫৬) রূপিণী সমাজের রূপ রেখা -- উপেন্দ্র রূপিণী

৫৭) ককবরক ভাষা ও সাহিত্য -- কুমুদ কুন্ডু চৌধুরী

৫৮) প্রসঙ্গক্রমে - শ্যামাচরণ ত্রিপুরা

৫৯) চরণচন্তাই এর ঝুলি ১ম খন্ড - দি ত্রিপুরা লিঙ্গুইস্টিক সোসাইটি

৬০) ত্রিপুরার ককবরক ভাষার লিখিত রূপে উত্তরণ - সুহাস চট্টোপাধ্যায়

৬১) চাকমা ভাষা ও সংস্কৃতি প্রসঙ্গ - নিরঞ্জন চাকমা

৬২) ত্রিপুরার মন্দির - কার্তিক লাহিড়ী

৬৩) পিলাক কথা - দীপক ভট্টাচার্য

৬৪) স্মৃতির আলোয় - দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত

৬৫) ত্রিপুরার গণ আন্দোলন ও কমিউনিষ্ট পার্টির ইতিকথা - দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত

৬৬) আমার স্মৃতিতে ত্রিপুরার কমিউনিষ্ট আন্দোলন ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পটভূমি - বীরেন দত্ত

৬৭) মুক্তি পরিষদের ইতিকথা - দশরথ দেব

৬৮) পটভূমিকা আন্দোলন ও জনশিক্ষা সমিতি - কুমুদ কুন্ডু চৌধুরী ও শুভব্রত দেব

৬৯) ত্রিপুরার উপজাতি জনজীবনে রাজনৈতিক ক্রমবিবর্তন - অঘোর দেববর্মা

৭০) ত্রিপুরায় কমিউনিষ্ট পার্টি ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রাথমিক স্তর - অঘোর দেববর্মা

৭১) ত্রিপুরায় স্বাধীনতা সংগ্রামের স্মৃতি - তড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত

৭২) বিদ্রোহ বিবর্তণ ও ত্রিপুরা - জগৎ জ্যোতি রায়

৭৩) এই শহর আগরতলা - দেবাশীষ লোধ

৭৪) স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি - ই.এম .এস নাম্বুদ্রিপাদ

৭৫) ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির ইতিহাস - ড: রনেন সেন

৭৬) জনশিক্ষা সমিতির ইতিকথা - অঘোর দেববর্মা

৭৭) সেন্সাস রিপোর্ট - অসিত চন্দ্র চৌধুরী

৭৮) Tribes of N.E. India - Edited by Dr. Sudhangsu Saha.

৭৯) The Origin of the Family - Private Property & State. - By. F. Engels.

৮০) The British Rule in India. - By Karl Marx

৮১) Civilisation and the Historical process.

- By progress publishers Moscow.

৮২) Traditional Social Institutions of the Tripura Community.

- By Debapriya Deb Barman.

৮৩) History of Tripura. - By E.F.Sandys.

৮৪) Tripura District Gazetteers. - By K.D.Menon, State Editor.

৮৫) History of Trupura. -By Dr. Jatish Ch. Datta.

৮৬) The Military History of Tripura. - By Debabrata Goswami.

৮৭) Post war uprising in India. -By Gautam Chattopadhyay.

৮৮) Indian States people in the struggle for democracyand National unification.

- By Chandra gupta Choudhury.

৮৯) The Chakmas of Tripura. - By Pannalal Majumdar.

৯০) The Kaipengs - Directorate of Research Govt. of Tripura.

৯১) The Gommunist Movement in Tripura. - By Pradip Basu.

৯২) Economic Progress in Tripura. - By Biman Dhar.

৯৩) The Tipras of Tripura. - By Jagadish Gonchoudhury.

৯৪) The Glimses of Tripura. - By Sarooj Choudhury & Bikach Choudhury.

৯৫) Political though of Anciet Greece. - By V.S Nersesyants.

৯৬) Philosophy and the Ecological Problems of Civilisation.

- By progress Publishers.

৯৭) The Customary Laws & practices of The Reangs of Tripura.

- By Bibhas Kanti Kilikdar.

৯৮) Tripura Administration - The Era of Modernisation.

- By Banikantha Bhattacharjee.

৯৯) Tea plantation and the tribes of Tripura.

- By Dr. P.K. Bhattacharjee & Sri Ram Gopal Singh.

১০০) India In the Changing Global Scenario. -By P.V. Narasimha Rao.

১০১) তথ্যের আলোকে ত্রিপুরার গ্রাম -- রবীন্দ্র কিশোর দেববর্মা ।

এসব তালিকা ভুক্ত গ্রন্থগুলো ছাড়াও ত্রিপুরায় প্রকাশিত পত্রপত্রিকা থেকে সংগৃহীত তথ্যের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ।